পূর্বভারতীয়
বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য

অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলিকাতা

Purva Bharatiya Vaishnava Andolan O Sahitya

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

প্রকাশক : সুনন্দ ভট্টাচার্য, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
(ফ্লাট-১১) কলিকাতা-৭০০০০৬।

মুদ্রক : শক্তিপদ আড়ু, নিউ মা-কালী প্রিণ্টার্স, ১২/১ রামচাঁদ ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

পূর্বভাষণ

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইল—খ্রীঃ ১৫ এবং ১৬ শতকে পূর্বভারতে (আসাম, গৌড়-বঙ্গ ও উড়িষ্যা) বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ও তৎসম্পর্কিত সাহিত্য-বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা। গ্রন্থটির তিনটি বিভাগে (আসাম খণ্ড, গৌড়-বঙ্গ খণ্ড, উড়িষ্যা খণ্ড) এই সম্পর্কে যে-বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, 'বিষয়-নির্দেশ' হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। খণ্ডত্রয়ে আলোচিত মুখ্য বিষয়াবলীর পারস্পরিক সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক ইত্যাদি, 'উত্তরভাষণ'-এ প্রদর্শিত হইয়াছে।

মধ্যযুগীয় ভারতের লক্ষণীয় বিষয় হইল—ধর্মচেতনা। ইহার মাধ্যমেই তৎকালীন সাধু-সন্ত, কবি-দার্শনিকদিগের চিন্তাধারা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতে বহুকাল হইতেই হিন্দু (বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈবাদি), বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রবাহিত। সকল ধর্মেরই ভিত্তিমূলে এক-একটি তত্ত্বদর্শন বিদ্যমান। বৈষ্ণবধর্মের উৎস-সন্ধানে বেদান্তসূত্রে পৌঁছিতে হয়। বৈষ্ণবধর্ম হইল, 'ভাগবত' (=ভগবান-সম্পর্কিত) ধর্ম বা 'ভক্তি'-ধর্ম এবং এই ধর্মের উপাস্য হইলেন, কৃষ্ণ-বিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেবাদি বিভিন্ন নামধেয় দেবতা। এই দেবতা কখন স্বতন্ত্র, কখনও-বা মিলিত ভাবে কৃষ্ণের একত্বে উপনীত হইয়াছেন। দার্শনিক বিচারে এই দেবতা কখন সাকার, কখনও-বা নিরাকার, কখন সগুণ, কখনও-বা নির্গুণ। পুনশ্চ, সাধন-মার্গও ত্রিধা বিভক্ত—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি। ভক্তিও পুনরায় কোথাও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত, কোথাও-বা তাহা জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এমন-কি কখনও-কখনও হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মপ্রতীতির এবং বৈষ্ণবতার সহিত তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। উত্তর, মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের ধর্মধারণাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ বৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। ১৫-১৬ শতকে পূর্বভারতের সহিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সুনিশ্চিত সংযোগ ছিল, যাহার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিস্রোত পূর্বভারতীয় ভক্তিস্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল।

মত ও পথের ভিন্নতা হেতু ভারতে প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারিটি—(ক) শ্রী (আচার্য: রামানুজ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), (খ) রুদ্র (আচার্য: বিষ্ণুস্বামী; বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ), (গ) মাধ্ব (আচার্য: মধ্ব; দ্বৈতবাদ), (ঘ) সন (আচার্য: নিম্বার্ক; দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার, ব্রহ্মার এই চারি মানসপুত্রের নামানুসারে 'সন' সম্প্রদায় চারিটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত; নিম্বার্ক এই

চতুঃ 'সন' সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য)। 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব (ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সম্পর্ক) বিষয়ে রামানুজাচার্যের সহিত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতবিরোধ, অপিচ, বেদান্তসূত্রের ভাষ্য-বিষয়েও চতুর্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য বর্তমান। তথাপি, সর্ব সম্প্রদায়েরই মূল ধারণা একটি—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।' ভাগবতের এই শ্লোকাংশের মধ্যেই নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম (শঙ্করাচার্য), অন্তর্যামী পরমাত্মা (সাংখ্য-যোগ) এবং ষড়ৈশ্বর্যময় সগুণ ভগবান —পরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ রূপ প্রকটিত হইয়াছে।

খ্রীঃ ১৫-১৬শতকে পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের পুরোধা হইলেন, আসামে শঙ্করদেব গৌড়-বঙ্গে চৈতন্যদেব এবং উড়িষ্যার জগন্নাথাদি 'পঞ্চসখা'। শাক্তপীঠস্থলী আসামে ভাগবৎ-ভিত্তিক বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণার কৃতিত্ব শঙ্করদেবের, ব্রজমণ্ডলের বিশুদ্ধ রাগাত্মিক ভক্তিকে সর্বভাবতীয় প্রেম-ভক্তিতে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস চৈতন্যদেবের জীবনের গৌণ সাধনা এবং উড়িষ্যার জগন্নাথ-কৃষ্ণের ধারণাকে কালক্রমে সচল-জগন্নাথে পরিণত করিবার অধ্যবসায়ের মূলে রহিয়াছেন পঞ্চসখাবৃন্দ। এই ধর্মান্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালে রচিত ধর্মতত্ত্বদর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থনিচয় এবং অনুবাদ, পদাবলী, জীবনচরিতাদি বিষয়ক সাহিত্যকর্মের মধ্যে। শঙ্করদেব এবং তৎশিষ্য মাধবদেব বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থ, পদাবলী ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' চৈতন্যদেব ছিলেন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র—তিনি স্বপ্রবর্তিত বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি রচনার ভার দিয়াছিলেন রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে। উড়িষ্যার পঞ্চসখাও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন। উত্তরকালে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম (অধুনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে খ্যাত) এবং তৎসংক্রান্ত তত্ত্বদর্শন পূর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের মৌল ভিত্তিস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ন্যায় এইরূপ সর্বাতিশায়ী দর্শন আসাম, উড়িষ্যা কিংবা অন্যত্র কোথাও রচিত হয় নাই। এই ধর্ম-ভাবনা হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে ভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম, বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য এবং চৈতন্যদেবাদি মহাপুরুষবর্গের জীবনচরিতাবলী।

বর্তমান গ্রন্থের কালসীমা হইল মূলতঃ ১৫।১৬ শতক। পূর্ণাঙ্গতা-বিধানের হেতু গ্রন্থ-বর্ণিত আলোচনার সূচনা ও পরিণতি পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী শতকগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অভিনব কোন তথ্য কিংবা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার অবকাশ অতি সঙ্কীর্ণ, কারণ, ইতিপূর্বে এতদ্‌সম্পর্কে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি রচিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদেরই আলোকে আলোচ্য তিন প্রদেশের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের স্বরূপ ও সম্পর্ক নির্ধারণই প্রস্তুত পুস্তকের উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে।

বিষয়-নির্দেশ

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

—চৈতন্যচন্দ্রোদয় (৬।৩২)

আসাম খণ্ড

আসাম—কুচবিহার—ত্রিপুরা—মণিপুর

উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব—ভারতের তিনখণ্ডেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত। কিন্তু এই তিনখণ্ডের বৈষ্ণবধর্ম নামে এক হইলেও, চরিত্রে স্বতন্ত্র। বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু: পূর্বাঞ্চলীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ ও তৎসম্পর্কিত সাহিত্য। কালসীমা: দুইশত বৎসর (১৫ ও ১৬ শতক), স্থান: আসাম, কুচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুর। আসাম ও কুচবিহার ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত বিধায় 'আসাম' শিরোনামেই উভয় প্রদেশের আলোচনা করা হইল।

আসাম
(আসাম - কুচবিহার)

॥ ১ ॥ নাম-(প্রাগ্‌জ্যোতিষ ঃ কামরূপ ঃ অসম ঃ আসাম)

'আসাম' নামটি আধুনিক। ত্রয়োদশ শতকে অহোম্ অথবা তাই বা শান্ উপজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধিকার করিলে এই ভূখণ্ডের নাম হয় 'অসম' বা 'অছম্' (ডঃ বাণীকান্ত কাকতির মতে) বা 'হ-কম' (বোডো ভাষায়। নিম্নভূমি অর্থে)। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্বেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলটি একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। আসামের সহিত উত্তর ভারতের প্রাচীন সংযোগের কথা পাওয়া যায়—রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন তাম্রলিপি, কালিকাপুরাণ, যোগিণীতন্ত্র ইত্যাদিতে। অবশ্য, তখন এই ভূভাগ 'প্রাগ্-জ্যোতিষ' এবং 'কামরূপ' নামে পরিচিত ছিল। আর্যসভ্যতা কিভাবে ও কোন্ সময়ে এই স্থানে প্রথম প্রসার লাভ করিয়াছিল, সে সম্পর্কে অবশ্য নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।

রামায়ণে বিদেহরাজ জনকের পালিত পুত্র নরকের প্রাগ্-জ্যোতিষে রাজত্ব স্থাপনের কথা আছে।

মহাভারতে প্রাগ্-জ্যোতিষ ও কামরূপ এই দুইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাগ্-জ্যোতিষের অধিপতি 'ম্লেচ্ছ' ভগদত্ত। অর্জুনের মণিপুরগমন প্রসঙ্গেও প্রাগ্-জ্যোতিষের নাম বর্তমান।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপি (খ্রীঃ ৪ শতক) ও হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ভাস্কর-বর্মার নিধানপুরের তাম্রলিপিতে (খ্রীঃ ৬ শতক) কামরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে কামরূপের কথা পাওয়া যায় কালিকাপুরাণে (খ্রীঃ ১০ শতক), যোগিনীতন্ত্রে (খ্রীঃ ১৬ শতক) ও কুব্জিকাতন্ত্রে (৭ম পটল)।

যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণে বলা হইয়াছে—'নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্। করতোয়াং সমারভ্য যাবং দিক্করবাসিনীম্॥ উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়া তু পশ্চিমে। তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষুনদী পূর্বস্যাং গিরিকন্যকে॥ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লক্ষাবঃ সঙ্গমাবধি। কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥' অর্থাৎ, (উত্তর-দক্ষিণে) নেপালের কাঞ্চন পর্বত হইতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পর্যন্ত এবং (পূর্ব-পশ্চিমে) দিক্করবাসিনী হইতে করতোয়া পর্যন্ত কামরূপের বিস্তার। উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে দিক্ষুনদী,

দক্ষিণে লঙ্কা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম—ইহাই গিরিকন্যা কামরূপের চতুঃসীমা। সুতরাং, প্রাচীন কামরূপের মধ্যে আধুনিক আসাম, কুচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তরবঙ্গীয় স্থানগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল (E. A. Gait—History of Assam)। তিনদিকে পর্বতবেষ্টিত আসামের সহিত প্রতিবেশী দেশগুলির (ব্রহ্ম, তিব্বত, ভূটান ও চীন) স্থলপথে (অর্থাৎ গিরিবর্ত্ম দিয়া) যেমন সংযোগ বর্তমান, তেমনি জলপথেও (অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র দিয়া) আসামের সহিত নানাদেশের (বিশেষতঃ বঙ্গদেশের) যোগাযোগ বরাবর ছিল। এই সংযোগের ফলস্বরূপ নানা দেশের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিলিত হইয়াছে।

॥ ২ ॥ জাতি ও ভাষা

বাংলা ও আসামে ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর চারিটি উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায়: (ক) বোড়ো (কুচবিহার, ত্রিপুরা, কাছাড) (খ) অহোম্ (গ) খাসী ও (ঘ) কুকী-চীন।

আসামের প্রাচীন অধিবাসীরা (নিষাদ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, অসুর প্রভৃতি) আর্যেতর। আর্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্বে এই দেশের আদিম অধিবাসীরা ইন্দো-চীনীয় (মোন্‌খ্‌মের গোষ্ঠীর) ভাষাভাষী ছিল। পরবর্তীকালে ভোটবর্মী ভাষাভাষীগণ এই উপত্যকা আক্রমণ করে। এই ভোটবর্মীদের মধ্যে প্রধান হইল কোচ, কাছাড়ী, ললুঙ্, ত্রিপুরা, চুঠিয়া, বোড়ো প্রভৃতি উপজাতীয়গণ। খ্রীঃ ১৩ শতকে ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর অপর একটি শাখা অহোম্ অথবা তাই বা শান্ উপজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধিকার করে।

পরিগৃহীত মতানুযায়ী খ্রীঃ ৭ শতকে পূর্বমাগধী অপভ্রংশ হইতে অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ-এর বিবরণীতে দেখা যায়, খ্রীঃ ৭ শতকে ভারতীয় আর্যভাষা আসামে প্রচলিত ছিল। অবশ্য মধ্যভারতে প্রচলিত আর্যভাষার সহিত উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত এই ভাষার কিছু পার্থক্যও ছিল। অসমীয়া ভাষায় অষ্ট্রিক (নিষাদ), মোন্‌খ্‌মের (খাসীদের ভাষা) তিব্বতী-চীন (বোড়ো বা কাছাড়ীদের ভাষা) এবং তাই বা শান্ বা অহোম্ উপজাতির ভাষার উপাদান বর্তমান।

'The Indo-Mongoloid inheritance therefore belongs in a special manner to the people of Assam as to the people of Nepal, irrespective of the Aryan · language they may speak.

In the development of the Aryan Assamese language (as much as of *Khas-Kura* or *Gorkhali*, and to some extent of Bengali, particularly in its eastern dialects), the influence of the *Bodo* and *Naga* as well as the late Ahom languages is noticed. The Austric *Khasi* speech of the Indo-Mongoloid *Khasis* and *Syntengs* (Jaintias) has similarly influenced the contiguous Aryan.'[১]

॥ ৩ ॥ রাজনৈতিক ইতিহাস

শঙ্কর-পূর্ব কামরূপের রাজনৈতিক ইতিহাস তথ্যজটিল ও গবেষণাযোগ্য। খ্রীঃ ৭ শতকের মধ্যভাগ হইতে ১১ শতক অবধি যে-তিনটি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিয়াছিল, তাহারা হইল—ক) হর্ষবর্ধন ও হিউ-এন-সাঙের সমসাময়িক ভাস্করবর্মার বংশ, (খ) প্রলম্ভ বংশ এবং (গ) কামরূপের পালবংশ।[২] এই সকল বংশের নৃপতিগণ প্রকৃত পক্ষে ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর হইলেও ইহারা সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইয়া সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩ শতক হইতেই প্রাচীন কামরূপ (বঙ্গদেশের ন্যায়) তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে। উত্তর গৌহাটির 'কানাই বরষী' শিলালিপিতে (১২০৫ খ্রীঃ) এই তুর্কী আক্রমণের উল্লেখ আছে এবং ইহা সম্ভবতঃ মহম্মদ-বিন্ বখত-ইয়ার্ খিলজীর আক্রমণ। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন ইবাজ ও ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্তিয়াজ উদ্দীন উজবক তুঘ্রিল খান্ ও পরে মুহম্মদ শাহ্ কামরূপ আক্রমণ করে। কামরূপ এই তুর্কী আক্রমণগুলি প্রতিহত করিলেও উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে ইহার আভ্যন্তরীণ সংহতি ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে। উপরন্তু, কামরূপের এই দুর্দিনে (১৩ শতক) উত্তর-পূর্ব দিক হইতে শান্ আক্রমণেরও সূত্রপাত হয়। অহোম্‌গণ (শান্ গোষ্ঠীর অন্যতম উপজাতি) ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বাংশ জয় করে।

'The history of Assam from 1250 to 1700 A. D. was to some extent the history of a struggle between the original Indo-Mongoloid inhabitants of the country (mostly Tibeto-Burman Bodo) and the newly arrived (Sino-Siamese) Ahoms who belonged to a distant branch of the same Sino-Tibetan stock. The Ahoms belonged to the Tai or Shan Section of the

Siamese-Chinese branch of the Sino-Tibetans. They arrived in Assam by way of North Burma through the course of the Noa Dihing river, at the beginning of the 13th century. Probably they were preceded by allied tribes—as they were followed by others, equally their kinsmen, e. g., the Khamtis.' [৩]

ভোটবর্মী গোষ্ঠীর কাছাড়ীগণও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে। এইরূপে প্রাচীন কামরূপ একটি ছোট রাজ্যে (পশ্চিমে করতোয়া ও বর্তমানে রংপুর, কুচবিহার, গোয়াল পাড়া এবং কামরূপ) পরিণত হয় এবং ইহার নামও কামরূপের পরিবর্তে হয় কামতা। এই কামতা রাজ্যেরই রাজধানী ছিল কামতাপুর (বর্তমান কুচবিহার হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত)।

কামতার উল্লেখযোগ্য নৃপতি হইলেন দুর্লভ নারায়ণ [৪] (রাজ্যকাল ১৩ শতকের শেষার্ধ)। এই বিদ্যোৎসাহী রাজার রাজসভায় তিনজন সুবিখ্যাত কবির নাম পাওয়া যায়—ক) হেম সরস্বতী (১৩ শতকের শেষার্ধ) ['প্রহ্লাদ চরিত্র'[৫] (বামন-পুরাণ অনুসরণে রচিত প্রহ্লাদ চরিত্র), 'হরগৌরী সংবাদ' (পুরাণ ও লোক-প্রচলিত কাহিনী অনুসরণে লিখিত) ইত্যাদি]। খ) হরিবর বিপ্র (১৪ শতক) [জৈমিনী মহাভারতের অনুবাদ, বভ্রুবাহনের যুদ্ধ, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি]। (গ) কবিরত্ন সরস্বতী (১৪ শতক) [জয়দ্রথ বধ (মহাভারতের অনুসরণে রচিত)]। ইঁহাদের সমসাময়িক কালের অপর একজন কবি হইলেন, রুদ্রকন্দলী। ইনি মহাভারতের অনুসরণে 'সাত্যকি প্রবেশ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৬]

সমসাময়িক কালে, কামতা রাজসভার ন্যায় কাছাড় রাজসভাও (বর্তমান নওগাঁ জেলা) বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিল। কাছাড়রাজ মহামাণিক্যের (১৪ শতক) সভাকবি ছিলেন সুবিখ্যাত মাধবকন্দলী বা কবিরাজকন্দলী। ইনি সমগ্র (মতান্তরে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত, উত্তরকাণ্ড—শঙ্করদেব-রচিত) রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। মাধবকন্দলীর 'দেবজিৎ' কাব্যে দেবতাবর্গের মধ্যে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা হইয়াছে। ইনি ছিলেন বৈষ্ণবপূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-জাগরণের প্রধান পুরুষ শঙ্করদেব কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

খ্রীঃ ১৫ শতকে অপর তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়—দুর্গাবর (গীতিরামায়ণ), পীতাম্বর (উষাপরিণয়) ও মানকর (বিহুলালখিন্দর)।[৭]

খ্রীঃ ১৬ শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দুই বৃহৎ রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘটে—অহোম্ ও কোচ রাজবংশ। অহোম্‌রা তাহাদের রাজ্যবিস্তারে পূর্বাঞ্চলে চুঠিয়াদের নিকট এবং ধানসিঁড়ি-উপত্যকার কাছাড়ীদের নিকট প্রবল বাধা পায়। অহোম্‌রাজ স্থহংমুং, ওরফে, ডিহিঙ্‌গিয়া রাজ, ওরফে, স্বর্গনারায়ণ (রাজ্যকাল ১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রীঃ) চুঠিয়া, কাছাড়ী, নাগা প্রভৃতি উপজাতি-অধিকৃত ভূখণ্ডগুলিকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইনি ডিমাপুর হইতে কাছাড়ীদের ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ ভূইঞাদের পরাস্ত করিয়াছিলেন।

ডিহিঙ্‌গিয়ারাজের সমসাময়িক কোচবংশীয় নৃপতি (বিশু / বিশা) বিশ্বসিংহ (রাজ্যকাল ১৪৯৬-১৫৩৩ খ্রীঃ)। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রাচীন কামতাপুর ধ্বংস হইবার পর বিশ্বসিংহ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে তাঁহার নূতন রাজধানী কুচবিহার স্থাপন করেন।[৮] বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ (রাজ্যকাল ১৫৪০-৮৭ খ্রীঃ) সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ, ওরফে, চিলারায় বারাণসী ও উত্তর-ভারতের নানা শিক্ষাকেন্দ্র হইতে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া কোচরাজ্যে বসতি করাইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই বিদ্যোৎসাহী ও হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্যে শঙ্করদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং শুক্লধ্বজ শঙ্করদেবের ভাগিনেয়ী কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কোচরাজ্যে নববৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শঙ্করদেবকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। ডিহিঙ্‌গিয়ারাজ স্বর্গনারায়ণ কোচরাজা বিশ্বসিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনও করিয়াছিলেন। ইনিই প্রথম হিন্দুনাম (স্বর্গনারায়ণ) ও হিন্দুজীবন-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই রাজত্বকালে শঙ্করদেবের জন্ম হয়।

॥ ৪ ॥ শঙ্কর-পূর্ব যুগে আসামে ধর্মীয় পরিমণ্ডল

ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর যে-চারিটি শাখা (বোড়ো, অহোম্, খাসী ও কুকী-চীন) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বোড়ো ও অহোম্ এই দুই উপজাতিই প্রধান। এই বহিরাগত আর্যেতর মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্ম, দেবতা, আচার-বিচার, রীতি-নীতি ইত্যাদি কিরূপ ছিল, তাহা আজ নির্দিষ্ট করিয়া জানা যায় না। কারণ, বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই উত্তর-ভারতীয় হিন্দু দেবদেবী, পুরাণ-কাহিনী, হিন্দু রীতি-নীতি ইত্যাদির সহিত এই বোড়ো ও অহোম্ গোষ্ঠীর আদিম পুরাণ-কথা, দেবদেবী, রীতি-নীতি ইত্যাদি মিলিয়া-মিশিয়া এক নূতন অসমীয়া হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনকি, রাজনৈতিক বিষয়েও বোড়ো এবং

অহোম্ এই দুই স্বাধীন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ক্রমশঃ এক অখণ্ড অসমীয়া ভাষাভাষী গোষ্ঠী বা জাতিতে পরিণত হইতেছিল।

> 'Out of this struggle between the Tibeto-Buman Bodo and the Sino-Siamese or Thai-Ahom, the Ahoms emerged victorious. But by the time of this final triumph, the Ahom and the Bodo had both lost their nerve as independent peoples—they had both lost their language, or were fairly advanced on the way to lose it, and had merged into a single Aryan Assamese-Speaking people in Assam.'[৯]

আসাম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলস্থিত বোডো গোষ্ঠীর চুঠিয়া উপজাতির আদিম দেবদেবীর সহিত হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা : চুঠিয়াগণের প্রধান দেবী হইলেন কেসা-খাইতি (কেচা খাইতি) *Kesa Khaiti*। এই দেবী কাঁচা-মাংসভোজী, ইহার সহিত হিন্দুতন্ত্রের কালীর সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বোড়োদেব *Bathan Siv-rai* এবং মেছেদের *Bali Khungri* যথাক্রমে হিন্দু দেবতা শিব ও কালী। অনুরূপভাবে অহোম্ গোষ্ঠীর দেবদেবীরাও হিন্দু দেবদেবীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। কাশীনাথ তামুলি-ফুকনের 'অসমবুরঞ্জি' হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—লেঙ্-দান *Leng-dan*=ইন্দ্র (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অহোম্ নৃপতিগণ নিজেদের ইন্দ্রবংশীয় বলিয়া মনে করেন। তুলনীয় : চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় হিন্দুনৃপতিগণ) ; জ-চিঙ্-ফ *Ja-Ching-pha*=সরস্বতী ; লাঙ্-চাই-নেট্ *Lung-chai-net*=বায়ু ; খন্-খম্ফা-ফা *Khan-Khampha-pha*=শক্তিদেবতা ; খুন্-তুন্ *Khun-tun*=সূর্যদেবতা ; খুন্-বান্ *Khun-ban*=চন্দ্রদেবতা ; লাউ-খে *Lau-Khe*=বিশ্বকর্মা প্রভৃতি। আর্য ও আর্যেতর দেবদেবীদের এই সমন্বয়সাধন অন্যত্রও (ত্রিপুরা, মণিপুর) ঘটিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোচ ও অহোম্ নৃপতিগণের পূর্ণ-গৌরবের কাল। কোচ-রাজ বিশ্বসিংহ (রাজ্যকাল ১৪৯৬-১৫৩৩ খ্রীঃ) কামাখ্যা-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি হিন্দুধর্মের নৈষ্ঠিক সমর্থক ও শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বসিংহের পুত্র নারায়ণ[১০] (রাজ্যকাল ১৫৪০-৮৪ খ্রীঃ) কামাখ্যার মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। ইনি শৈব হইলেও নববৈষ্ণববাদেরও (শঙ্করদেব-প্রবর্তিত) পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ শঙ্করদেবের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

'Nara-Narayana and Sukla-dhvja, like the Ahom rulers patronising Brahmans and Hinduism, did a great deal to raise the cultural level of their people. Hinduism was the dominant religion, but the aboriginal beliefs and rites were allowed full scope, although these were becoming transformed under the ægis of Hinduism.'[১১]

শঙ্করদেবের পূর্বে আসামে নানাধর্ম প্রচলিত ছিল— ক) শৈব ধর্ম ; (খ) শাক্ত ধর্ম (গ) তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম ; (ঘ) বজ্রযানী বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম ; (ঙ) নাথধর্ম। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সব কয়টি ধর্মের মূলে রহিয়াছে তন্ত্র।

কোচ রাজারা শৈব ছিলেন। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের সময়ে প্রচলিত দুইটি মুদ্রায় ('শিবচরণকমল-মধুকর' / 'হরগৌরী-চরণকমল-মধুকর') শৈবধর্মের-প্রমাণ থাকিলেও তন্মধ্যে একটি মুদ্রায় অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বিস্ময়ের উদ্রেক করে [দ্রষ্টব্য : পাদটীকা নং ১০ (ক ও (খ)]। কোচ রাজ্যের শৈব ধর্মের শিব আর্য ও আর্যেতর উপাদানে গঠিত। অহোম্ রাজা স্বর্গনারায়ণের মুদ্রায় 'হরিহরচরণপরায়ণস্য' দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার সময় হরি ও হর উভয় দেবতারই পূজার প্রচলন ছিল। শঙ্করদেবের সময় প্রচলিত অন্যতম প্রধান ধর্ম ছিল শৈব। এই শিব (লিঙ্গ-মূর্তি) বামাচারী ভৈরব [শাস্ত্র: কালিকাপুরাণ (১০ শতক) ও যোগিনীতন্ত্র (১৬ শতক)]।

আসামের শৈব ও শাক্ত উভয় ধর্ম-ই বামাচারী। খ্রীঃ দ্বাদশ শতকে কামরূপে শাক্তধর্মের প্রাধান্য ছিল। এই ধর্মেরও উৎস কালিকাপুরাণ। যোগিনীতন্ত্রে দশমহাবিদ্যারূপ স্বীকৃত হইলেও ইহাতে কালিকাপুরাণের বামাচার (বলিদান, শবরোৎসব ইত্যাদি) এবং শক্তিদেবতার শিবদূতী, দিক্করবাসিনী প্রভৃত রূপ বর্জিত হইয়াছে। আসামে শক্তিদেবতার কোন মূর্তি নাই, ইহা শিলাখণ্ড মাত্র।

আসামের শঙ্করদেব-পূর্ব বৈষ্ণবধর্মও তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম। দেবতা—বাসুদেব [চতুর্ব্যূহ : বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও ত্রিবিক্রম, (অনিরুদ্ধ ?)]; ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ নহে। এই তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্মের উৎস কালিকাপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ। পূজার নৈবেদ্য সামিষ। উত্তর লখিমপুরের দুইটি তাম্রপত্রে (রাজা সত্যনারায়ণ, ১৩৯২ খ্রীঃ এবং তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, ১৪০১ খ্রীঃ) ভূমিদান-প্রসঙ্গে বাসুদেব, ঈশান ও অম্বা এই দেবতাগুলির নাম পাওয়া যায়। হাজোর হয় গ্রীবমাধব (প্রস্তরমূর্তি) তান্ত্রিক বৈষ্ণব-ধর্মের দেবতা। আসামের নানা স্থানে অবশ্য নানা রূপ ও নানা কালের বিষ্ণুমূর্তি

'' ।বিষ্কৃত হইয়াছে (Ephigraphia Indica Vol. XVIII)। কালিকাপুরাণে বাসুদেবের উল্লেখ আছে। যোগিনীতন্ত্রে বাসুদেব না থাকিলেও 'বিষ্ণুপীঠ'-এর কথা আছে। উত্তর ভারতের কৃষ্ণ, রাম ও ভক্তিবাদ, ১৩।১৪ শতকের কামতা ও কাছাড় রাজসভার কবিদের (হেমচন্দ্র, হরিহর বিপ্র, মাধবকন্দলী) তথা জনগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ষোড়শ শতকে আসামে তান্ত্রিক বজ্রযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ১০।১১ শতকে অবশ্য নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের অবস্থিতি প্রমাণ সিদ্ধ। বজ্রযানী বৌদ্ধগ্রন্থ 'সাধন-মালা'-তে কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি ও ওড়িয়ান্ (?)—এই চারি পীঠের উল্লেখ আছে। শঙ্করদেবের কীর্তনঘোষা ও মাধবদেবের নামঘোষাতে বামাচারী বৌদ্ধতান্ত্রিকদের কথা পাওয়া যায়।

নাথযোগীদের ধর্ম শৈব ও বজ্রযানী বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের এক মিশ্রিত রূপ। মাধব-কন্দলীর অসমীয়া রামায়ণে (১৪ শতক) নাথযোগীদের উল্লেখ আছে।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম, মনসা (=মারই *Marai*) ও শীতলা (=আই *Ai*) প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজারও প্রচলন ছিল। কথাগুরুচরিতে (পৃঃ ৪১) দেখা যায়, অনন্ত কন্দলী বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হইবার পূর্বে ধর্মপূজা করিতেন ; শঙ্করদেবের জনৈক ভক্ত (বাস কলাই) বসন্তরোগাক্রান্ত পুত্রের নিরাময়ার্থে শীতলা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কবি মানকর (১৫ শতক) 'বিহুলা-লখিন্দর' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতনামা লেখকদের রচিত অনেকগুলি 'মন্ত্রপুঁথি'-রও উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা, 'সাপর ধরণী মন্ত্র', 'ভূতর মন্ত্র,' 'সর্বঢাক মন্ত্র' ইত্যাদি। এই পুঁথিগুলি পঞ্চদশ শতকের পূর্বেও রচিত হইতে পারে।[১২]

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের নববৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নানা ধর্ম প্রচলিত থাকিলেও শৈব ও শাক্ত ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল এবং শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষগণও শাক্তধর্মাবলম্বী ছিলেন। শঙ্কর-শিষ্য মাধবদেব এবং অপর বৈষ্ণব সন্ত ভট্টদেবও নববৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে শাক্তধর্মাবলম্বী ছিলেন। গৌহাটির কামাখ্যামন্দির, সদিয়ার তাম্রেশ্বরীর মন্দির, ডুবির পরিহরেশ্বরের মন্দির এবং দেবগাঁওয়ের মহাদেবের মন্দির—এইগুলি ছিল শক্তিদেবতা-পূজা ও শাক্তধর্ম-প্রচারের কেন্দ্র এবং সমগ্র আসামের ধর্মীয় পরিমণ্ডল এই সকল কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। আর্য ও আর্যেতর উপাদানের মিশ্রণের ফলে আসামে মিশ্র তন্ত্রধর্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ তন্ত্রধর্মে নানা ব্যভিচার, অভিচারাদি প্রবেশ করিয়া ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিল। মুক্তির সহজ পন্থা হিসাবে নরবলি, নানা অভিচার

ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইত। ধর্মের নামে নৈতিক অবনতি, সামাজিক দুর্নীতি প্রভৃতি নানা দোষ অসমীয়া সমাজকে কলুষিত করিয়াছিল। ইহারই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শঙ্কর-দেবের বৈষ্ণবধর্ম-আন্দোলন। তিনিই অসমীয়া জনগণের ধর্ম-ধারণায় পরিবর্তন আনিযাছিলেন।

'In Assam, Saktism or Worship of the Mother-Goddess, the mantle of which fell on a gieat many pre-Aryan cults practised by the Kiratas, the Mongoloid people of Assam (the Tibeto-Burman-speaking Bodos and Nagas, the Austric-speaking Khasis, and the later Ahoms of Thai or Siamese-Chinese origin), appears to have been the dominant religion before the advent of Sankara-deva. It had bloody sacrifices as an essential part of its ritual, hecatombs of goats, sheep, buffaloes and pigeons and ducks, and occasional human sacrifices being the rule. The Great Mother was more dreaded than loved, and priest-craft and magic and Tantric practices distracted the people's faith. Sankara-deva, who belonged to the kalita or a high non-Brahman caste (like the kayasthas in other parts of North India), virtually changed the religious outlook of the Assam people.'[১৩]

॥ ৫ ॥ শঙ্করদেব

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের পথিকৃৎ শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রীঃ)। নওগাঁ জেলার আলিপুখরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কুসুমবর, মাতা সত্যসন্ধ্যা। শঙ্করদেব জাতিতে কায়স্থ (কলিতা)[১৪] ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মজিজ্ঞাসার অঙ্কুর লক্ষিত হইয়াছিল। প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি তৎকালীন দেশ-প্রচলিত তান্ত্রিক যোগসাধনায় মনোনিবেশ করেন—'যোগশাস্ত্র-মত, ধরি যোগ যত, আচরন্ত দিনে রাতি।'[১৫] কিন্তু এই পথে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মজিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর পাইলেন না। সেইজন্য যোগাভ্যাস পরিত্যাগ পূর্বক তিনি ভাগবত-চর্চা আরম্ভ করিলেন—'ভাগবত তত্ত্ব, জানিয়া পাছত, এড়িলা যোগ অভ্যাস'।[১৬] উত্তরকালে এই পথই তাঁহাকে পরম লক্ষ্যে ('হৃদয়র পরম ঈশ্বর মোর গুরু। প্রভু

ভগবন্ত ভগতর কল্পতরু ॥'[১৭]) পৌছিয়া দিয়াছিল। শঙ্করদেবের জীবনের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তাহার তীর্থ-পরিভ্রমণ।[১৮] মোট তুইবার তিনি তীর্থ -পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম তীর্থ-পরিভ্রমণে (১৪৮২ খ্রীঃ) তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া তাঁহার নিজস্ব ধর্মমত ও পথ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রস্তুত কবিযা লইয়াছিলেন। তীর্থযাত্রা সমাপন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও তাঁহার ধর্মমত 'এক শরণ নাম ধর্ম' প্রচার করেন। কিন্তু এই ধর্মপ্রচারও তাঁহার পক্ষে নির্বিঘ্ন ছিল না। নানাদিক দিয়া তাঁহাকে নানা বিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। শঙ্করদেব প্রচারিত নব-বৈষ্ণবধর্মে বিগ্রহপূজা, প্রধানতঃ শক্তি আদি নানাদেবতা পূজাব সমর্থন ছিল না। তিনি বলি প্রথা, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মাদি ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন ('নাহি ভকতিত জাতি আচাব বিচার'; 'সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি করি') এবং ধর্মাচরণে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কৃত ভাগবত-পুরাণকে অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া তোলা এবং নিজে 'কলিতা' হইয়া ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দান, জাতিনির্বিশেষে একত্র প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদি নানা কারণে তিনি তদানীন্তন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সমাজের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন।[১৯] শাক্তপীঠভূমি আসামের আচাবনিষ্ঠ ধর্মান্ধতার যুগে শঙ্করদেবকে রক্ষণশীল উচ্চবর্ণীয় সম্প্রদায় মূর্তিমান বিদ্রোহ বলিয়া মনে করিলেন এবং যেন-তেন-প্রকাবেণ এই 'কালাপাহাড়ের' গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। অহোম রাজার (সুহুং মুং) নিকট তাঁহাব বিরুদ্ধে নালিশ হইল। একদিকে ভোটবর্মীদের অত্যাচার, অপরদিকে কোচরাজা বিশ্বসিংহের ভূইঞা-দমননীতির শিকার এবং অহোম রাজরোষ—এই বিঘ্নগুলি এড়াইতে শঙ্করদেব দেশত্যাগ করিলেন। বিরূপভাগ্য তাঁহাকে নানাস্থানে (গাংমৌ, বেলগুড়ি, কাপলা, চিনপরা, গণককুছি, কুমারকুছি ইত্যাদি) তাড়াইয়া ফিরিতে লাগিল। সম্পদ গেল, প্রিয়জন নিহত হইল তবুও তাঁহার অন্তরের দীপশিখাটি অনির্বাণ রহিল। সেই দীপালোকে তুর্ভাগ্যের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া তাঁহার অগ্রগতি। এই তুর্দিনেও-যে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাহা নহে। পাঠবাউসীতে শঙ্কর-দেবের ধর্মপ্রচারের প্রধান সঙ্গী ছিলেন—মাধবদেব, দামোদরদেব ও হরিদেব। হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী প্রভৃতি সকল জাতির লোকই তাঁহায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর ও পূর্ব ভারত এইভাবে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। শেষ জীবনে শঙ্করদেব কোচরাজ নরনারায়ণের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছিলেন। নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ শঙ্করদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং শঙ্কর-পরিবারের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম আসামে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বটে, তবে ইহা পরিপুষ্ট হয় কুচবিহারের রাজানুকূল্যে। ক্রমশঃ শঙ্করদেব-প্রবর্তিত ধর্মমত আসামের জনগণও গ্রহণ করে। এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠা-কল্পে শঙ্করদেব নানাগ্রন্থ (মোটামুটি ২৭টি) রচনা করেন। শঙ্কর-রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হইল [রচনাকাল ও স্থান যথাক্রমে ১৫১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত (ক-ঝ), বরদোয়া; ১৫১৬-৪৩ খ্রীঃ (ঞ-ঠ), অহোম্ রাজ্য; ১৫৪৩-৬৮ খ্রীঃ (ড-র), কোচরাজ্য।]:

(ক) **হরিচন্দ্র উপাখ্যান** [সূত্র—মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই গ্রন্থে উত্তরকালে শঙ্করদেব-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের 'চারিবস্তু'-র (নাম, দেব, গুরু, ভক্ত) প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়।] (খ) **ভক্তি-প্রদীপ** [সূত্র—গরুড় পুরাণ। ইহা শঙ্করদেবের রচনা কি-না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। গ্রন্থটির বক্তব্য হইল—'একো নারায়ণো দেবো দেবানামীশ্বরেশ্বরঃ'।] (গ) **কীর্তনঘোষা** (উরেষাবর্ণন খণ্ড)—[সূত্র—ব্রহ্মপুরাণ।] (ঘ) **রুক্মিণীহরণ কাব্য** [সূত্র—হরিবংশ ও ভাগবত (১০ স্কন্ধ)] (ঙ) **বড়গীত** (চ) **অজামিলোপাখ্যান** [সূত্র—ভাগবত ৫ ও ৬ স্কন্ধ] (ছ) **অমৃতমন্থন** [সূত্র—ভাগবত ৮ স্কন্ধ] (জ) **কীর্তনঘোষা** [সূত্র—ভাগবত ৩।৬।৭।৮ স্কন্ধ। বিষয়—প্রহ্লাদ চরিত্র, হরমোহন, বলিছলন, গজেন্দ্রোপাখ্যান, ধ্যানবর্ণনা।] (ঝ) **গুণমালা** [সূত্র—ভাগবত ১০।১১ স্কন্ধ।] (ঞ) **কীর্তনঘোষা** [সূত্র—ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয়তন্ত্র, বিষ্ণুধর্মোত্তর সূত-সংহিতা। বিষয়—পাষণ্ডমর্দন, নামাপরাধ।] (ট) **পত্নীপ্রসাদ নাঠ** [সূত্র—ভাগবত ১০ স্কন্ধ। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ হইলেন—'সর্বযজ্ঞমূর্তি বেদর উদ্ভব ভূমি'।] (ঠ) **কীর্তনঘোষা** [সূত্র—ভাগবত। বিষয়—কৃষ্ণের শৈশবলীলা, রাসক্রীড়া, কংসবধ, গোপী-উদ্ধব সংবাদ, কুঁজীর বাঞ্ছাপূরণ, অক্রুর বাঞ্ছাপূরণ।] (ড) **ভাগবতের গল্পগুচ্ছ** [সূত্র—ভাগবত ১০।১১।১২ স্কন্ধ] (ঢ) **বলিছলন** [সূত্র—ভাগবত ৮ স্কন্ধ ও বামনপুরাণ] (ণ) **অনাদিপাতন** [সূত্র—ভাগবত ৩ স্কন্ধ ও বামনপুরাণ।] (ত) **কীর্তনঘোষা** [সূত্র—ভাগবত ১।৩।১১।১২ স্কন্ধ। বিষয়—জরাসন্ধ যুদ্ধ, কালযবন বধ, মুচকুন্দস্তুতি, স্যমন্তক-হরণ, নারদের কৃষ্ণদর্শন, বিপ্রপুত্র আনয়ন, দৈবকীর পুত্র আনয়ন, বেদস্তুতি, লীলামালা, রুক্মিণীর প্রেমকলহ, ভৃগু-পরীক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠপ্রয়াণ, চতুর্বিংশতি অবতার-বর্ণন ও ভাগবতের তাৎপর্য-বর্ণন।] (থ) **ভাগবতের অনুবাদ** [সূত্র—ভাগবত ১।২।১০ (আদি); ১১।১২ স্কন্ধ।] (দ) **কুরুক্ষেত্র** [সূত্র—ভাগবত ১০

স্কন্ধ (উত্তরার্ধ)।] (ধ) **নিমিনবসিদ্ধ সংবাদ** [সূত্র—ভাগবত ১১ স্কন্ধ।] (ন) **রামায়ণ** (উত্তরকাণ্ড) (প) **ভাতিমা** [বিষয়—দেবভাতিমা, রাজাভাতিমা, ও পরে গুরুভাতিমা (মাধবদেবের)।] (ফ) **ভক্তিরত্নাকর** [সূত্র—ভাগবত, গীতা ও অন্যান্য পুরাণ।] নাটক— (ব) **কালীদমন** [এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম হইল 'গোপালক কালিদমন'-'বনাগ্নিপান লীলা যাত্রা' সূত্র—ভাগবত ১০ স্কন্ধ।] (ভ) **কোলগোপাল** [সূত্র—বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ২০ ও ভাগবত ১০ স্কন্ধ। এই গ্রন্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব দেখা যায়।] (ম) **রুক্মিণীহরণ** (য) **পারিজাতহরণ** [এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম হইল 'নরকবধ পারিজাত হরণ লীলা যাত্রা' সূত্র—বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবত] (র) **রামবিজয়** [সূত্র—রামায়ণ (বালকাণ্ড)]

॥ ৬ ॥ শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্বদর্শন ও বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ

শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাইতে পারে তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ (ভক্তিরত্নাকর, অনাদিপাতন, কীর্তনঘোষ প্রভৃতি) হইতে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ভক্তিরত্নাকরই[20] প্রধান।

॥ চারিবস্তু ॥ অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্মের মূল বস্তু (Principles of Doctrine চারিটি—দেব, নাম, ভক্ত ও গুরু ('গুরু দেব নাম ভক্ত চারিটি শরণ ঃ শঙ্করদেবে পুনরপি দেখাইলন্ত। গুরু দেব নাম ভক্ত চিনাই দিলন্ত ॥)। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে প্রথম তিন বস্তু (দেব, নাম ও ভক্ত) শঙ্করদেব তাঁহার ধর্মপ্রচারকালে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, চতুর্থ বস্তুটি (গুরু) তৎশিষ্য মাধবদেব কর্তৃক সংযুক্ত হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস ভক্তিরত্নাকরের প্রথম অধ্যায়ের 'বিষয়বস্তু'-র (জ্ঞানভক্তিপ্রদ গুরু সেবামাহাত্ম্য) সহিত মেলে না। গুরু বলিতে শঙ্করদেব ও মাধবদেব উভয়ের ধারণা এক নহে।

দেব ঃ শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের নাম—'একশরণনাম ধর্ম।' ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম অধ্যায়ে ('ভজনীয় পরমদেবতামাহাত্ম্য') নারায়ণ-কৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। পরমদেবতা 'উপাসকানাং মঙ্গলায়' নারায়ণ-কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত তিনি সৎ, অনন্ত, বিশ্বৈকমূর্তি। কেবল ভক্তির দ্বারাই (জ্ঞানের দ্বারা নহে ভগবানের মহিমা জানা যায়—'জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নঃ'। তিনি 'সর্বকারণকারণম্' শরণ্য—'শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমার্থত্বাৎ তদেকশরণানামযত্নপ্রসিদ্ধো মোক্ষ ইতি'। এই জগৎকারণ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, পরমগুরু, ভজনীয় পরম দেবতা, পরমগতি (১।৫ অধ্যায়)। একশরণনাম ধর্মের ব্যাখ্যায় শঙ্করদেব বলিয়াছেন—'এক দেউ

এক সেউ, একবিনে নাহি কেউ'। 'সর্বশাস্ত্রসারমুদ্ধৃত্য ভগবতাদাশতম্—একং শাস্ত্রং দৈবকীপুত্রগীতম্। একো দেব দৈবকীপুত্র এব ॥ কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা। মন্ত্রোঽপ্যেক তস্য দেবস্য নাম ॥' অর্থাৎ, শাস্ত্র এক—ভাগবত ; দেবতা এক—শ্রীকৃষ্ণ ; কর্ম এক—কৃষ্ণ-সেবা ; মন্ত্র এক—কৃষ্ণনাম। শঙ্করদেব তাঁহার ভাগবত পুরাণের অনুবাদে (২ স্কন্ধ) বলিয়াছেন—'অন্য দেবীদের, ন করিবা সেব, না খাইবা প্রসাদ তার। মূর্তিক না চাইবা, গৃহ ন পশিবা, ভক্তি হইবে ব্যভিচার ॥'[২১] অপিচ, একচিত্তে তুমি মোকো মাত্র কর সেবা। পরিহরা দূরতে যতেক আন দেবা ॥ নাম না শুনিবা তুমি আন দেবতার। যেন মতে নহিবে ভকতি ব্যভিচার ॥' (ভক্তি প্রদীপ)।

নাম ঃ নাম-মন্ত্র—'রামকৃষ্ণ নারায়ণ হরি'। নাম এবং নামী (শ্রীকৃষ্ণ) অভিন্ন। [তুলনীয় ঃ 'নামনামিনোরভেদঃ। ভগবৎস্বরূপমেব নাম।' —জীব গোস্বামী]। কৃষ্ণনাম স্মরণই কলিযুগে ভক্তিসাধনের উপায়।[২২] এই সাধনভক্তি নববিধা—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, বন্দন ও দেহার্পণ। ইহাদের মধ্যে শঙ্করদেব প্রথম চারিটি (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন) গ্রহণ করিয়াছেন (৬-৯ অধ্যায়), পুনশ্চ, ভক্তিরত্নাকরের ৩৯ সংখ্যক অধ্যায়ে দশবিধা ভক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রবণ ষড়্‌বিধ (উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস ইত্যাদি), কীর্তন চতুর্বিধ (নাম, স্তুতি, ভাগবত ব্যাখ্যা ও গীত) অথবা নৃসিংহপুরাণ-মতে ত্রিবিধ (বাচিক, উপাংশু, মানস), স্মরণ ত্রিবিধ (নাম, লীলা, রূপ), অর্চন দ্বিবিধ (সকাম, নিষ্কাম)। নিষ্কাম ভক্ত 'প্রসিদ্ধ দ্রব্য'-এর পরিবর্তে 'হৃদিভাবসম্মত-মনোময় দ্রব্য'-এর দ্বারা কৃষ্ণার্চনা করে অর্থাৎ বাহ্যোপচারের পরিবর্তে মানসোপচারের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা করে।

ভক্ত ঃ 'ভক্তিরত্নাকর'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ভক্ত ও বিষ্ণু অভিন্ন—'বিষ্ণু বৈষ্ণবর কিঞ্চিতে নাহি ভেদ'। ভক্ত-সঙ্গে ভক্তির উদয় হয়—'সৎসঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যভিপ্রেতম্'। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন নহে (২২ অধ্যায়)। মায়ার জন্যই এই ভিন্ন-বোধ জন্মে এবং মায়াতারণোপায় হইল ভক্তি (৩৫ অধ্যায়)। মহাফলপ্রদ অব্যভিচারিণী ভক্তি হইতে বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তে বৈরাগ্য ও জ্ঞান জন্মে—'ভগবদনুগ্রহমন্তরেণ ন কস্যাপি জ্ঞান সম্ভব ইতি', অর্থাৎ, ভগবৎ-কৃপা বিনা কাহারও জ্ঞান হয় না। যজ্ঞাদি কর্মে ভক্তি ও বৈরাগ্য জন্মে না, কর্মবন্ধ-বিমুক্ত হওয়া যায় না, অহঙ্কারও লুপ্ত হয় না। ঐকান্তিক ভক্ত বৈরাগ্য আশ্রয় করে কারণ, সে ঈশ্বরকে একমাত্র সৎ এবং সর্ববস্তুকে ঈশ্বরব্যতিরিক্ত পৃথক্

সত্তাসম্পন্ন বলিয়া মনে করে না—'পটাদিকাৰং তন্ত্বাদিব্যতিরেকেন ণ দৃশ্যতে… বিশ্বমিথ্যাদৃষ্টিত্বাৎ শুক্তিরজতাদিবৎ'। ভক্তি ও জ্ঞান সাধনের জন্য মানব জন্মই প্রশস্ত (২ অধ্যায়)। ভক্তি চতুর্বিধা (১১-১৪ অধ্যায়)—উত্তমা, অন্তরঙ্গা, সপ্রেমা ও নির্গুণা। অনিমিত্তা স্বাভাবিকী ভক্তি হইল উত্তমাভক্তি। সর্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি হইল অন্তরঙ্গাভক্তি। ভক্তের হৃদয়বৃত্তিসংযুক্ত ভক্তি হইল সপ্রেমা ভক্তি। ত্রিগুণাত্মিকা ও ত্রিস্তরা (উত্তম, মধ্যম, অধম) নববিধা ভক্তির অতীত যে-ভক্তি, তাহা নির্গুণা ভক্তি। ভক্তিরত্নাকরের ৩৮ সংখ্যক অধ্যায়ে যে-দশবিধ ভক্তির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইল—ত্রিগুণাত্মিকা ও ত্রিস্তরা নববিধাভক্তি এবং 'উত্তমোত্তমা' ভক্তি। ভক্ত ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত (ভক্তিরত্নাকর—অধ্যায়—১৬, ১৭, ১৮)। উত্তম ভক্তই শ্রেষ্ঠ। উত্তম ভক্ত নিষ্কাম, কৃষ্ণৈকচিত্ত। তিনি বিশ্বের মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে বিশ্বকে দেখেন ও বিশ্বকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া জানেন—'সকল প্রাণীক দেখিবেক আত্মসম। উপায় মধ্যত ইঠো অতি মুখ্যতম ॥' মধ্যম ভক্ত কৃষ্ণকে সর্বানিয়ন্তা রূপে দেখে। প্রাকৃত ভক্ত বিগ্রহের পূজা করে। এই বিগ্রহ-পূজা ভক্তিপথের প্রারম্ভ মাত্র—'প্রকৃত্যা প্রারম্ভকঃ। অধুনৈব প্রাকৃতভক্তঃ সন্ শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ' —(শ্রীধরস্বামী)। অর্থাৎ, প্রাকৃত ভক্ত ক্রমশ উত্তম ভক্ত হইতে পারে। ভক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম না করিলেও ভ্রষ্ট হয় না—'ইদানীন্তু নিত্যনৈমিত্তিকস্বধর্মনিষ্ঠাং অপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেবোপদেষ্টব্যা' —(শ্রীধরস্বামী)।

গুরু ঃ ভক্তিরত্নাকরের প্রথম অধ্যায়ে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বাসুদেবই গুরু ('গুরুরেব হরিঃ')।[২৩] গুরু শিষ্যের ভক্তিপথের প্রদর্শক। মাধবদেবও 'গুরুভাতিমা'-তে বলিয়াছেন—'বিনে গুরুভক্তি-রকতি কবহু না হোই।' এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শঙ্করদেবের নিজের কোন গুরু ছিল না। তিনি পরমেশ্বরকেই তাঁহার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—'হৃদয়র পরম ঈশ্বর মোর গুরু। প্রভু ভগবন্ত ভকতর কল্পতরু ॥' 'কথাগুরুচরিত' অনুযায়ী শঙ্করদেব ভক্তকেই স্বীয় গুরু বলিয়াছেন—'সর্বতত্ত্ব ভকতক মই গুরু মান'। এই স্থানে ভাগবতের প্রভাব লক্ষণীয়। ভাগবতে বলা হইয়াছে—'মদ্‌ভক্ত পূজাভ্যধিকা।[২৪] মায়াবন্ধনাশ ও মুক্তিলাভের জন্য পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরুই পরম ঈশ্বর, পরম জ্ঞানী, জীবদেহধারী নারায়ণ ও শিষ্যের পথপ্রদর্শক। মাধবদেব গুরু অপেক্ষা গুরুভক্তির উপর অধিক জোর দিয়াছেন। মাধবদেবও ভক্তজনের মর্যাদা দিয়াছেন—মুক্তিত নিস্পৃহ যিঠো সেহি ভকতক নম'। অপিচ, 'ভকতে সে মোর হৃদি জানিবা নিশ্চয়। ভকতজনর জ্ঞান আমি সে হৃদয় ॥'

পরবর্তীকালে গুরুকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(ক) ইষ্টগুরু অর্থাৎ কৃষ্ণ], (খ) উপকারী গুরু [যিনি তত্ত্বোপদেশ, অর্থাৎ চতুঃশ্লোকী ভাগবতানুসারী ('জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থম্, বিজ্ঞানমনুভবঃ, রহস্যং ভক্তিঃ, তস্যাঙ্গং সাধনম্') চারি বস্তুর ঐক্যসম্বন্ধে উপদেশ ও শীল শিক্ষা দেন], (গ) অপ্রনীয়া গুরু [অর্থাৎ, শিক্ষাগুরু] (ঘ) সুহৃদ্ গুরু [অর্থাৎ, ভক্ত-গুরু]।

॥ শঙ্করদেব ও বৈষ্ণবদর্শন ॥

শঙ্করদেব কোন বিশিষ্ট ধর্মদর্শন-প্রণেতা ছিলেন না। তাঁহার ধর্মমত প্রধানতঃ ভাগবতপুরাণ ও গীতার (উভয়ই শ্রীধর স্বামী/আচর্য কৃত যথানুক্রমিক টীকা—'ভাগবতভাবার্থদীপিকা' ও 'সুবোধিনী'—অনুসারে) উপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করদেব (ভক্তিরত্নাকর) ও বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টদেব উভয়েই ভাগবতপুরাণকে 'সর্ববেদান্ত-সার' বলিয়া মনে করিতেন—'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ॥' জীবগোস্বামীও ভগবতপুরাণকে উপনিষদের ভাষ্য বলিয়া মনে করিতেন।[২৫] শঙ্করদেব তাঁহার ধর্মমত প্রতিষ্ঠাকল্পে ভাগবত-পুরাণ অনুসারে চারিটি প্রমাণ (শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, মহাজনপ্রসিদ্ধি, ও অনুমান) গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে তিনি প্রস্থানত্রয়ের (শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি) উপর নির্ভর করেন নাই।

অদ্বয়তত্ত্ব ঃ ভাগবতপুরাণের প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিত্তি শব্দ্যতে॥' অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞানকে পরমতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ঐ তত্ত্ব কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও ভগবান্ বলিয়া উক্ত হন। পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নামভেদে ব্রহ্ম (বেদান্ত), পরমাত্মা (সাংখ্য) ও ভগবান্ (সগুণ ও নির্গুণ)। ভাগবত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম, সাংখ্যের পরমাত্মা ও সগুণ ব্রহ্ম সকলই অদ্বয়তত্ত্বের অন্তর্গত করিয়াছেন। প্রভেদ কেবল নামে ও রূপে।

জগৎ ও ব্রহ্ম ঃ অদ্বয়তত্ত্বই যাবতীয় সৃষ্টির কারণ। এই কারণ নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে দ্বিবিধ। মায়ার জন্যই জগৎকে সত্য (সদাভাস) বলিয়া মনে হয়। 'যৎ সত্ত্বতঃ সদা ভাতি জগতেতদসৎ স্বতঃ। সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্॥' —ভাবার্থ-দীপিকা (শ্রীধরাচার্য)। 'তুমি সত্যব্রহ্ম, তোমাত প্রকাশে, জগত ইটো অসন্ত। জগতত সদা তুমিও প্রকাশ অন্তর্যামী ভগবন্ত॥…অসন্ত জগতখান, তোমাত উদ্ভব ভৈল, সন্ত হেন প্রকাশে সদায়'॥—কীর্তনঘোষা। শঙ্করদেবের অভিমতে নারায়ণ পরব্রহ্ম। সর্বাতিশয়ী মায়ার প্রভাবে জীব তাঁহার সন্ধান

পায় না। তিনি যাবতীয় কিছুর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহর্তা। তিনিই একমাত্র সত্য, মায়াধীশ—'তুমি সে কেবল সঁচা, সব সবে মায়াময়। তোমাতে সে হন্তে সৃষ্টি হোবে স্থিতি লয়॥ নিরঞ্জন সত্যবাদী জগতকারণ। যার মায়াপাশে ইটো সংসার নির্মাণ॥'—কীর্তনঘোষা।

মায়া ঃ বেদান্তের মূলতত্ত্ব—ব্রহ্ম। সকলই ব্রহ্মান্তর্গত ('সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।) আত্মাও ব্রহ্ম। 'অযমাত্মা ব্রহ্ম')। ব্রহ্ম ব্যতীত অপব কিছুরই অস্তিত্ব নাই ('নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন')। ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ, সচ্চিদানন্দময় ('সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। 'সচ্চিদানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম')। এই জগতের অস্তিত্ব 'প্রাতিভাসিক', পারমার্থিক নহে। ব্রহ্মের মায়া-শক্তিব জন্য জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ, ঈশ্বর সগুণ। জ্ঞানোদয়ে মায়া দূর হয এবং জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। জীবেব কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত ও একমাত্র সত্য। মায়া ব্রহ্মেবই এক শক্তি। ইহাব কর্ম—আবরণ ও বিক্ষেপণ বা অধ্যাস (projection)। মাযা বস্তুকে আবৃত করে, অ-বস্তুতে বস্তু-বিক্ষেপ করে। এই নামরূপময় বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের মায়াশক্তিবই বচনা। ব্রহ্ম যুগপৎ জগদন্তর্গত (immanent) ও জগদতীত (transcendent)। শ্রীধরাচার্যের মতে প্রকৃতির দুই শক্তি—আবরণশক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা এবং বিক্ষেপণশক্তি অর্থাৎ মায়া—'আবরণ-বিক্ষেপণ-শক্তিভেদেন প্রকৃতির্দ্বিবিধা। তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপোধিরবিদ্যা, বিক্ষেপশক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী।' মায়াকৃতবন্ধন-যুক্ত জীব ব্রহ্মেরই অংশ—'হামু যত জীব, শিব তেরি অংশা, কাহে ওহি মোহবন্ধ।'—বড়-গীত; 'তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ আমিও অংশ তোমাবা। তোউ সেবা-চোর পায়া মহামায়া মুহিলে মন আমারা॥'— নামঘোষা।

॥ শঙ্করদেব এবং বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ ॥

শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদী। তাঁহার মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তন মাত্র বিবর্তবাদ-অনুসারে জীব ও জগৎ ব্রহ্মেব পরিণতি নহে, তাহারা আপাতদৃষ্টিতে নামরূপ কিন্তু পরমার্থ-বিচারে অংশ মাত্র।[২৬] শঙ্করদেবের মতে জীব কৃষ্ণের অংশ—'কৃষ্ণরে সে অংশ সবে···বিষ্ণু অংশ জীব।' তিনি বিবর্তবাদে বিশ্বাসী গীতাতেও জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।'[২৭]

পক্ষান্তরে, রামানুজ আচার্য পরিণামবাদে বিশ্বাসী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মমত ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিণামবাদে বিশ্বাসী

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁহার অভিমত কিয়দংশে ভিন্ন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের মধ্যেই জড়বস্তু ও চৈতন্যময় আত্মা থাকে। তিনি জগৎ ও জীবসৃষ্টি করেন। কর্মানুসারে চৈতন্যময় আত্মা জড়দেহ প্রাপ্ত হয়। কর্মবন্ধ-পাশমুক্ত হইলেই জড়দেহ হইতে আত্মার মুক্তি ঘটে। অজ্ঞানতা হইতে কর্মবন্ধের উৎপত্তি এবং এই অজ্ঞানতা বেদান্তপাঠে দূর হয়। ঈশ্বরে ভক্তি জীবকে কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত করে। মুক্ত আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ কিন্তু ব্রহ্ম নহে। জীব ও জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে ; কেহই মিথ্যা নহে এবং সকলই ব্রহ্মান্তর্গত।

শঙ্করদেবের সহিত শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের সাদৃশ্য আছে। পুনশ্চ, শঙ্করদেব যখন বলেন,—'তুমি সত্য ব্রহ্ম তোমাতে প্রকাশে জগত ইঠো অসন্ত। জগততে সদা তুমিও প্রকাশ .অন্তর্যামী ভগবন্ত॥' এবং, 'সমস্ত ভূতরে আছ হৃদয়ত। তত্ত্ব না পাই তোমাক বিচারে বাহিরত॥ তুমি সে কেবল সত্য, মিছা সবে গান। জানি জ্ঞানীজনে করে হৃদয়ত ধ্যান॥'—কীর্তনঘোষা।—তখন, শঙ্করদেবের এই ধারণা (জীব ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ ; ব্রহ্ম জীব ও জগৎরূপে পরিণত) রামানুজের পরিণামবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, যদিও, 'তুমি সে কেবল সঁচা সবে মায়াময়', এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদেরই সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে, শঙ্করদেবের বৈষ্ণবীয় সম্বন্ধতত্ত্বে (জীব, জগৎ, ব্রহ্ম) বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহা অনেকাংশে সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদের সমতুল্য। অবশ্য ইহার কারণও আছে। শঙ্করদেবের ধর্মমতে ও রচনায় শঙ্করাচার্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্মধারণা, মায়াবাদ, মোক্ষধারণা, কর্ম-সন্ন্যাসযোগ এবং জ্ঞানমার্গ শঙ্করদেবও সমর্থন করিয়াছেন, তবে, শ্রীধরস্বামীর আদর্শে গঠিত শঙ্করদেবের ধর্মমতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সেইহেতু, বিবর্ত ও পরিণাম উভয় বাদেরই ছায়া তাঁহার ধর্মধারণায় পরিস্ফুট।

॥ ভাগবত ও সাংখ্যদর্শন ॥

সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হইলেও ভাগবত সাংখ্য দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ভাগবতের অদ্বয়তত্ত্ব সাংখ্যপ্রোক্ত ধারণা অনুসারে আত্মা-অন্তর্যামী পুরুষ। ইনি পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম, পরমাত্মা, অন্তর্যামী, স্বয়ং নারায়ণ-হরি। সাংখ্যকারিকায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের[২৮] উল্লেখ আছে। ভাগবতে এই পরমাত্মাকে ষড়বিংশতি সংখ্যক তত্ত্ব বলা হয়। শ্রীধরাচার্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ হইলেন ঈশ্বরের শক্তি ও অংশ। শঙ্করদেবের মতে (ভক্তিরত্নাকর, .২২

অধ্যায়) ব্রহ্ম জীবে আত্মা-অন্তর্যামীরূপে প্রতিষ্ঠিত। 'অনাদিপাতন'-এ বর্ণিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় শঙ্করদেব ভাগবতপুরাণ-ব্যাখ্যানুসারী সাংখ্যদর্শনের অনুবর্তন করিয়াছেন। ভগবতপুরাণে বলা হইয়াছে যে, নারায়ণ হরি জীবাত্মারূপে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বে (পুরুষকে ধরা হয় নাই) প্রবিষ্ট হইয়া হিরন্ময় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর আপনার মায়াশক্তির সাহায্যে সপ্ত ঊর্ধ্বলোক (ভূর্ভুবঃস্বঃ মহ-জন-তপ-সত্য) এবং সপ্ত অধোলোক সৃষ্টি করিলেন। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সৃষ্টি করিয়া তিনি তিনটি দেবতা সৃষ্টি করিলেন—বিষ্ণু (পালনকর্তা), ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা) ও রুদ্র (ধ্বংসকর্তা)। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে সকল হিন্দুপুরাণেই পাওয়া যায়। 'অনাদিপাতন'-এ বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি এইরূপ—পরমপুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। জীবাত্মা-পুরুষ অবিদ্যাযুক্ত হওয়ায় সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে বুঝিতে পারিল না। নারায়ণের আদেশে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইল 'মহৎ'। মহৎ হইতে জন্মিল ত্রিবিধ অহমিকা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইল দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দশদেবতা। রাজসিক অহঙ্কার হইতে প্রসূত হইল দশেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইল পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্,) ও পঞ্চ সূক্ষ্মেন্দ্রিয় (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)। 'অনাদিপাতন'-এ বর্ণিত এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২।১,৩) সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখা যায়,—'আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।'

শঙ্করদেব যদিও ভাগবত-(শ্রীধরস্বামীকৃত টীকানুসারী)-বিশ্বাসী তবুও তাঁহার মতে সৃষ্টি প্রকৃতিপুরুষ-কেন্দ্রিক। শঙ্কর-শিষ্য মাধবদেব এই বিষয়ে তাঁহার 'নামঘোষা'-তে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ ও প্রকৃতিকে শাসন করেন এবং তিনি সকলের আত্মাস্বরূপ—'প্রকৃতিপুরুষ দুয়ো নিয়ন্তা মাধব', 'সমস্তরে আত্মা হরি'। শঙ্কর-দেবের মতে পুরুষ নিরাকার, জ্যোতির্ময়, পরমাত্মা এবং জীবাত্মার নিয়ন্তা। এই আত্মা-অন্তর্যামী পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীধরাচার্যের মতে পুরুষ দ্বিবিধ—একটি জন্মমৃত্যুর অধীন জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা বা ঈশ্বর যিনি প্রকৃতির সাহায্যে যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি পুরুষোত্তম ঈশ্বরেরই শক্তি। শঙ্করদেবের মতে পুরুষ ভগবানের অংশস্বরূপ এবং মায়া হইতেছে প্রকৃতির অংশ।

॥ ভগবত ও যোগদর্শন ॥

শঙ্করদেবের রচনায় যোগদর্শনের (পতঞ্জলি-প্রণীত) স্পর্শও পাওয়া যায়।

তাঁহার জীবনবৃত্তে দেখা যায় যে, ভাগবতে অনুরাগী হইবার পূর্বে তিনি কিছুদিন যোগশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রভাব তাঁহার 'অনাদিপাতন' গ্রন্থে ও 'ভক্তিরত্নাকর'-এর কোন-কোন পুঁথিতে লক্ষ্য করা যায়। দেহকেন্দ্রিক এই যোগব্যাখ্যাও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অনুসারী। মানবদেহের মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধান—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মেরুমণ্ডল বা মেরুদণ্ড ষট্‌চক্রসংযুক্ত—(ক) সহস্রার (মস্তক : দ্বিদল পদ্ম); (খ) বিশুদ্ধ (কণ্ঠ : ষোড়শদল পদ্ম); (গ) অনাহত (হৃদয় : অষ্টদল পদ্ম); (ঘ মণিপুর (নাভি); (ঙ) স্বাধিষ্ঠান (উপস্থ); (চ) মূলাধার (পায়ু। কুলকুণ্ডলিনী মায়াশক্তির অধিষ্ঠান)। অনাহত-চক্রে ভক্তের উপাস্য পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। প্রধান তিনটি নাড়ীর মধ্যে প্রধানতম সুষুম্না এবং এই নাড়ীগুলির মধ্যে দশবিধ বায়ু [প্রাণ (নাসিকা); অপান (উপস্থ); উদান (কণ্ঠ); ব্যান (সর্বত্র); সমান (নাভি); নাগ (উদ্গার-ক্রিয়ার সহায়ক); কূর্ম (উন্মীলন-ক্রিয়ার সহায়ক); কৃকর (ক্ষুৎকার-ক্রিয়ার সহায়ক); দেবদত্ত (বিজৃম্ভন-ক্রিয়ার সহায়ক); ধনঞ্জয় (সর্বব্যাপী)] প্রবাহিত হইয়া দেহকে সজীব রাখে।

॥ নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর ॥

'ভক্তিরত্নাকর'-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদে সগুণ ও সাকার উপাসনার কথা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিরাকার অর্থাৎ প্রকৃত-আকার-বিহীন। তিনি অবিকল্প, অনির্ভেদ হইলেও নানা অবতার গ্রহণ করেন। সর্ব-অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান,—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥'—ভাগবত (১।৩।২৮)। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ, ব্রহ্মরূপী সনাতন, অপরিমেয় ও বিশ্বমূর্তি—'পরমং সত্যং শ্রীনারায়ণাখ্যং তত্ত্বম্'। বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টদেবও এই মত পোষণ করেন ('ভক্তি-বিবেক')। উপাসনা-প্রকরণের জন্য ব্রহ্ম সগুণ ও সাকার রূপে গৃহীত হয়। ভাগবতে চতুর্ব্যূহের কথা বলা হইয়াছে—অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব। ইহারা যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শঙ্করদেব 'কালীদমন' নাটকে শ্রীকৃষ্ণের এই চার প্রধান মূর্তিকে স্বীকার করিয়াছেন বটে, তবে তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে ইহাদের পূজা করিবার কথা কোথাও বলেন নাই। অবতারী ভগবান্ নানা অবতার গ্রহণ করিলেও তিনি অনন্ত, কালাতীত, নিত্যস্বরূপ। তিনি নারায়ণরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম[২৯] —'প্রথমে প্রণামো ব্রহ্মরূপী সনাতন। সর্ব অবতারের কারণ নারায়ণ ॥'—কীর্তনঘোষা। ব্রহ্ম প্রাকৃত-আকার-বর্জিত সুতরাং

নিরাকার—এই রূপেই তিনি উপাসিতব্য। অন্য রূপের বা বিগ্রহের পূজা অনুচিত ভক্তজনের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মানোর নিমিত্তই নিরাকার ব্রহ্মের সাকার পরিকল্পনা। বরদোয়ার বিষ্ণুবিগ্রহ, বেলগুঁড়ির মদনগোপাল বিগ্রহ এবং অন্যান্য 'সত্র'-গুলির মণিকোঠাতে স্থাপিত বিগ্রহগুলি হইতে বোঝা যায় যে, নির্গুণ কৃষ্ণকেই শঙ্করদেব সগুণ করিয়াছেন—'নির্গুণ কৃষ্ণর গুণর প্রকাশ কবিলা শ্রীশঙ্করে'। সাকার-কল্পনা একশরণ-নামধর্মের প্রাথমিক স্তর মাত্র।

॥ জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তি ॥

শঙ্করদেব ভক্তিকে জ্ঞানের পূর্বে স্থান দিয়াছেন। অজ্ঞানাবদ্ধ ভ্রান্ত জীব বোঝে না যে, সে বিভুবিজ্ঞানময়, নিষ্পরিগ্রহ, শান্ত, পরমাত্মার অংশ। তাই সে কর্মচক্রে আবর্তিত হয়। ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারাই জীবের জ্ঞান হয় ও সে মায়ামুক্ত হয়। হরিভক্তির দ্বারাই জীবাত্মা মায়ার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইতে পারে—'কহতু শঙ্কর, এ দুখসাগর, পার কর হৃষিকেশ। তুহু গতিমতি, দেহ শ্রীপতি, তত্ত্ব পন্থ উপদেশ ॥'—বড়গীত (প্রার্থনা)। এই মায়াবন্ধের কারণ বহুবিধ। ভোগ ও জাগতিক নানা কর্মের দ্বারা জীবাত্মা মায়াবদ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং এই বিস্মৃতির অবসান হয় সন্ন্যাসে। 'অনাদিপাতন'-এ শঙ্করদেব ইহার নির্দেশ দিয়াছেন। হরিভক্তির দ্বারাই মায়া দূর করিতে হইবে। এই দিক দিয়া শঙ্করদেব ভক্তিবাদী (ভাগবত ও রামানুজপন্থী)—জ্ঞান ও কর্মবাদী (শঙ্করাচার্যপন্থী) নহেন। অবশ্য, শঙ্করদেবের মতে জ্ঞান এবং কর্মও পরিত্যাজ্য নহে, তবে তাহা 'ভক্তিশুদ্ধ' করিয়া গ্রহণীয়। ভক্তিশুদ্ধির অর্থ—হরি-কীর্তন-স্মরণ-ও-অর্চন। অষ্টাঙ্গিক যোগদর্শনের সহিত শঙ্করদেবের মতের কিয়দংশে সাদৃশ্য বর্তমান। ভক্তির মধ্যে দাস্যভক্তিই প্রশস্ত। কৃষ্ণ ও উদ্ধব এই দাস্যভক্তির উদাহরণ স্বরূপ। শঙ্করদেব ভক্তদের 'কলৌ পরমোপায' নাম-কীর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন—'ওহি পরমতত্ত্ব বেদকে, বাণী, জানি নর ন কর বিরাম। ধরমক করমক গরবক ছোরি, ডাকি বোলহু রাম রাম ॥' মুক্তি সম্পর্কে শঙ্করদেবের ধারণা শঙ্করাচার্যের মুক্তিধারণা হইতে পৃথক্। শঙ্করাচার্যের মতে মুক্তি হইল ব্রহ্মভূত হওয়া। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে যে-চারিপ্রকারের প্রলয়ের (নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রাকৃত-আত্যন্তিক) উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে, আত্যন্তিক প্রলয়ই হইতেছে মোক্ষ, যখন জীবাত্মা ব্রহ্মময় হইয়া যায়। বেদান্ত-পরিভাষাতেও বলা হইয়াছে—'তুরীয়প্রলয়স্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিমিত্তকঃ সর্বমোক্ষঃ'। 'কীর্তনঘোষা'-তেও এই অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত মুক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু 'জীবন্মুক্তি' ধারণা-বিষয়ে শঙ্করদেব অদ্বৈতবেদান্ত হইতে কিয়দংশে পৃথক্। ভক্তির দ্বারা জাত জ্ঞান হইতেই

মুক্তি আসে ('ঈশ্বরভক্ত্যা লব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি')। জীবের যখন পরমার্থজ্ঞান জন্মে, তখন প্রারব্ধ কর্ম থাকিলেও সে জীবন্মুক্ত হইতে পারে। পুনশ্চ, জীবন্মুক্ত জীবও ভক্তিচ্যুত হইলে মায়াবদ্ধ হয়। মুক্ত হইলেও ভক্ত ঈশ্বরকে অর্চনা করিতে চাহেন ; তাই, ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত-লোক বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া নহে। শ্রীধরাচার্যের মতে ভক্তির দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্য। কিন্তু শঙ্করদেব বলেন—জ্ঞান ও কর্ম ভক্তিশুদ্ধ না হইলে এবং ভক্তি নামাশ্রয়ী না হইলে মুক্তি সম্ভব নহে ; পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় হরিপদে আত্মসমর্পণ, হরিগুণকীর্তন এবং অনাসক্তি।

॥ শঙ্করদেব ও রাধা ॥

শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মে ও তদরচিত সাহিত্যে রাধার স্থান আদৌ নাই।

'It should however be noted that, unlike as in the Vaishnavite literature of other provinces, Radha does not appear, nor does she find a place in the whole of Shankarite literature.[৩০]

শঙ্করদেবর-প্রবর্তিত 'এক-শরণ নামধর্ম' ভাগবত-ভিত্তিক এবং ভাগবতপুরাণের রাস-অংশে রাধার উল্লেখ নাই[৩১],—'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥'—ভাগবত (১০।৩০।২৪)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার উল্লেখ আছে কিন্তু এই রাধা, কৃষ্ণের স্বকীয়া। তদ্ব্যতীত, পদ্মপুরাণ', 'বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র' ও 'গোবিন্দলীলামৃত'-এ রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়— যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা ॥'— পদ্মপুরাণ) ; 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥'—(বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র) ; 'কা কৃষ্ণস্যপ্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।'—(গোবিন্দলীলামৃত)। শঙ্করদেব তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে রাধা-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন। তবে তৎপ্রণীত 'কেলিগোপাল' নাটকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যথা,—'নিশম্য গর্বং গোবিন্দো গোপীনাং প্রেমবন্ধয়ে। রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজযোষিতঃ ॥' —(কেলিগোপাল) ; তুলনীয় : 'কংসারিরোঽপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী ॥'—(গীতগোবিন্দ)। অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের রচনায় এই একটিমাত্র স্থানে 'রাধা'-র উল্লেখ আছে।

অসমীয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধার প্রবেশ সসঙ্কোচ। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে কৃষ্ণপ্রণয়িনী শ্রীরাধার এই সঙ্কোচ কাটে নাই। সপ্তদশ শতকের কিছু-কিছু গীত-রচনায় (শ্রীরাম আতা ও তৎপুত্র রামানন্দ দ্বিজ) রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা উপাদান

হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। শঙ্করদেবের সমকালীন কোচ-রাজসভার দুই কবি—রাম সরস্বতী ও তৎপুত্র কলাপচন্দ্র—রাধা চরিত্রচিত্রণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন। রাম সরস্বতীর গীতগোবিন্দের ভাষানুবাদ ও কলাপচন্দ্রের 'রাধাচরিত'—এই দুই গ্রন্থে রাধাকে দেখি অন্যরূপে এবং অন্যভাবে। রাম সরস্বতীর গীতগোবিন্দ ভাগবতপুরাণ, জয়দেব ও সংস্কৃতসাহিত্য, এই ত্রিবিধ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। অসমীয়া বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে স্থাপিত রাম সরস্বতীর শ্রীরাধাচরিত্র নীলশাড়ী পরেন না, তাঁহার অঙ্গে ভক্তির শুভ্র চীনাংশুক। জয়দেবের 'বিলাসকলাকুতুহল' বর্জন করিয়া তিনি কেবল 'হরিস্মরণ'-টুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও আবার ভক্তি-রসাপ্লুত করিয়া। কলাপচন্দ্রের রাধাচরিতের শ্রীরাধা কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা এক অসামান্যা সাধিকার অনবদ্য রূপালেখ্য। পরবর্তী দুই শতকে শ্রীরাধার যে-ক্রম-বিকাশ অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষিত হয়, তাহার মূলে ছিল জনরুচির পরিবর্তন। বৈষ্ণবীয় কঠোর আদর্শবাদ অপেক্ষা পৌরাণিক প্রেমকাহিনীর বাস্তবতার প্রতি প্রবণতা এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনুবাদ ইহার সাক্ষ্য দেয়। যাহাই হউক, ইহা বলা চলে যে, কবি জয়দেবের হাত ধরিয়াই শ্রীরাধা আসামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

॥ ৭ ॥ মাধবদেব

শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের একটি স্থায়ী রূপ দিলেন তাঁহাব সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরাধিকারী মাধবদেব (১৪৮৯-১৫৯৬ খ্রীঃ)। গুরু শঙ্করদেব যে-ভক্তিরহস্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, শিষ্য মাধবদেব সেই ভক্তিরহস্যকে সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব সম্পর্কে মাধবদেব বলেন—'ভকতিভাণ্ডার-দ্বার সব চূড়ি মুকুতি কয়ল উদাস। একশরণ হরিনাম ধরম কহো রাজা করু পরকাশ।'; 'শ্রীমন্ত শঙ্কর, হরিভকতর, জান যেন কল্পতরু। তাহান্ত বিনাই, নাই নাই নাই, আমার পরম গুরু ॥'—(নামঘোষা)।

'While Sankara constructed the basic part of Assam Vaishnavism, his nominee, Madhava, added the superstructure of apostolic machinery and monastic organization. They two form the soul and a great part of the limbs of the Vaishnava movement.'[৩২]

কেবল ধর্মপ্রচার নহে, মাধব-গুরু শঙ্করদেবের লক্ষ্য ছিল অসমীয়া জনগণের আত্মিক উন্নতিবিধান। ধর্মকে জীবনের সহিত একীভূত করিয়া দিবার জন্য শঙ্করদেব ও তাঁহার শিষ্যেরা নানা স্থানে 'সত্র'[৩৩] নির্মাণ করিয়াছিলেন। মাধবদেব

চিরকুমার ছিলেন এবং তাঁহারই আদর্শে 'কেওয়ালিয়' (*Kewaliya*) বা উদাসীনপন্থী নামে একটি চিরকুমার সন্ন্যাসীসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ মাধবদেবই 'সত্র'-গুলিকে প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

মাধবদেবের রচনাবলী ঃ (ক) জন্মরহস্য (পুরাণনির্ভর সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের কাব্যরূপ); (খ) বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীকৃত 'ভক্তিরত্নাবলী'-র কাব্যানুবাদ; (গ) রামায়ণের আদিকাণ্ডের অনুবাদ; (ঘ) মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞের অনুবাদ; (ঙ) নামঘোষা বা হাজারী ঘোষা; (চ) অঙ্কীয়া নাঠ [সংখ্যা-৯। চোরধরা, পিম্পরা গুছুৱা, কোতোরা খেলেবা ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-অনুকরণে রচিত] (ছ) বড়গীত; (জ) পুরুষোত্তম গজপতি-কৃত 'নামমালিকা'-র অনুবাদ।

শঙ্করদেবের 'কীর্তনঘোষা'-র ন্যায় মাধবদেবের 'নামঘোষা' বা 'হাজারীঘোষা' আসামে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলতঃ বৈষ্ণবদর্শনাত্মক কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন এবং নিম্নলিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত :—

(ক) **মায়া ঃ** ইহার প্রকৃতি ও প্রভাব। নিদ্রিতের নিকট স্বপ্ন যে-রূপ সত্য রূপে প্রতিভাত হয় তেমনি, মায়ার প্রভাবে এই 'অসৎ' বিশ্ব 'সৎ' রূপে পরিগণিত হয়। মায়াবন্ধনের জন্য জীব ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

শঙ্করদেবও একই কথা বলিয়াছেন—ব্রহ্মের মায়াশক্তির জন্যই জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়।

(খ) **সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ** **সৃষ্টি**, স্থিতি এবং লয়—এই তিনি কার্যের কর্তা শ্রীকৃষ্ণ। সাংখ্যোক্ত পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ হইলেও, এই পুরুষ ও প্রকৃতির মূল কারণ হইল পরমেশ্বর নারায়ণ। ('প্রকৃতি পুরুষো দুইরো নিয়ন্তা মাধব। সমস্তরে আত্মা হরি পরম বান্ধব ॥'—(নামঘোষা, ঈশ্বরনির্ণয, ৪০৫)। পুরুষের দুই রূপ—ক্ষর এবং অক্ষর। জীবাত্মা ক্ষর, পরমাত্মা পরমেশ্বর নারায়ণ অক্ষর।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব ভাগবত-অনুসারী। শঙ্করদেবও সৃষ্টিতত্ত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(গ) **ব্রহ্ম ঃ** মাধবদেবের মতে ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, সর্বত্রস্থিত, অদ্বিতীয় এবং অপরিবর্তনীয়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সকলই ব্রহ্ম হইতে হয়। ব্রহ্ম নিরুপাধিক, গুণাতীত, নির্বিকার, নিরঞ্জন এবং সম। এই ব্রহ্মই পুরুষোত্তম নারায়ণ।

মাধবদেবের ব্রহ্মধারণা শঙ্করবেদান্ত এবং ভাগবতের 'অদ্বয়তত্ত্ব'-সম্মত। শঙ্করদেবের অভিমতও অনুরূপ। ৩৪

(ঘ) **আত্মদর্শন ঃ** আত্মদর্শনের উপায় ভক্তি এবং ইহার প্রদর্শক গুরু।

মাধবদেবের মতে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ—এই তিন মার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ। 'নাম-ঘোষা'-তে বলা হইয়াছে—সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে পূজা এবং কলিযুগে হরিনাম হইল একমাত্র ধর্ম। মুক্তির উপায় হইল ভক্তি। হরিকীর্তনকারী ত্রিগুণের (সত্ব, রজঃ, তম) দ্বারা অভিভূত হয় না। 'নামঘোষা-তে গুরুকৃপার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। গুরু এবং ঈশ্বর অভিন্ন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যের পথ প্রদর্শক এবং তাঁহারই সাহায্যে শিষ্য জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্র-পাঠে হয় না, গুরু-কৃপা দ্বারাই ইহা লাভ করা সম্ভব।

যুগধর্ম, গুরুবাদ ও কৃপা—এই তিনটি বিষয়েও মাধবদেব শঙ্করদেবের অভিমতের অনুসারী। গুরু-সম্পর্কে উল্লেখ্য এই যে, শঙ্করদেব শ্রীকৃষ্ণকেই গুরু বলিয়া গণ্য করিয়াছেন কিন্তু মাধবদেবের নিকট শঙ্করদেবই নরদেহধারী নারায়ণ।

(ঙ) **জীবতত্ত্ব** : এই বিষয়েও মাধবদেব শঙ্করদেবের অভিমতকে সমর্থন করেন। জীব ও ব্রহ্ম পৃথক্ নহে। কিন্তু জীব ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না কারণ, সে অবিদ্যার দ্বারা আবৃত। এই আবরণের জন্যই তাহার দেহাত্ম-ভ্রম হয় এবং সে জাগতিক সুখদুঃখে জড়াইয়া পড়ে। মায়াবৃত জীব সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করে। জীবের বাসনা ও তদনুযায়ী কর্মফল জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই মায়া এবং অহং-বোধ যখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া বিনষ্ট করেন, তখনই জীব জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত হয় এবং তাহার আত্মদর্শন হয়। 'তোমার সেবক ভৈলো নারায়ণ এ। নিজভৃত্য করি লৈয়ো গোপীনাথ এ ॥ নিশ্চয় তোমার দিবাক লাগে প্রসাদ। তবু কৃপাময় মিলয় কোন প্রমাদ ॥'—নামঘোষা (কাকুতি ৮০০)।

মাধবদেব জ্ঞানবাদী, অপিচ, তিনি শঙ্কর-বেদান্ত অনুযায়ী জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবর্তবাদী। কিন্তু মাধব-গুরু শঙ্করদেবে বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ সংমিশ্রিত।

(চ) **জীবনের লক্ষ্য** : 'নামঘোষা'-র অভিমতে নামানন্দই হইল জীবনের পরম লক্ষ্য। পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অভেদ-উপলব্ধিই মুক্তি নহে। এই অভেদ উপলব্ধির অর্থ হইল,—নামকীর্তনকারী ভক্তের ঈশ্বর-সামীপ্য। অর্থাৎ, মুক্তি অর্থে সাযুজ্যমুক্তি বা 'ব্রহ্ম ঐক্য' নহে। মুক্তির অর্থ হইল—নামানন্দ। ভক্ত মুক্তিপ্রার্থী নহে, ভক্তের কাম্য হইল—রাম-কৃষ্ণ-নামামৃত-সিন্ধুতে নিমজ্জন।[৩৫]

ভক্তজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে শঙ্করদেবের অভিমতও অনুরূপ। শঙ্কর-বেদান্তের মুক্তিবাদ ও ভাগবতের ভক্তিবাদ, উভয়ের সংমিশ্রণ শঙ্করদেবে তথা মাধবদেবে লক্ষণীয়।

আসামে বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের মাধ্যম হিসাবে শঙ্করদেব ও মাধবদেব 'সত্র' এবং 'স্তোত্র', 'বড়গীত' (প্রসঙ্গ বা উপাসনাকালে গেয় সঙ্গীত) ও 'অঙ্কীয়া নাট'-এর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এইগুলির প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যে পরবর্তী দুই শতক ধরিয়া চলিয়াছিল।

॥ ৮ ॥ অসমীয়া বৈষ্ণব-সংহতি

ধর্মের স্রোত কখনও এক খাতে প্রবাহিত হয় না, ইহ কালের গতিতে নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়াইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর শতাব্দী অতীত হইতে-না-হইতেই যেমন তৎপ্রবর্তিত ধর্মমত নানা শাখায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল তেমনি, শঙ্করদেব ও মাধবদেবের তিরোধানের পর অসমীয়া বৈষ্ণবসত্রগুলি চারিটি সংহতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। এই চারি সংহতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অনিরুদ্ধ দাসের 'গুরুবর্ণনা' গ্রন্থে। এই সংহতিগুলির নাম হইল:— ক) ব্রহ্মসংহতি, (খ) পুরুষসংহতি, (গ) নিকা বা নিষ্ঠা সংহতি এবং (ঘ) কালসংহতি।

শঙ্করদেবের শিষ্য দামোদর দেব 'ব্রহ্মসংহতি'-র প্রবর্তক। যাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মসংহতিতে যোগ দিয়াছিলেন। এই সংহতিকে শঙ্কর-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের 'ব্রাহ্মণসত্র' বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মসংহতিতে ভক্তি-ধর্মের সাধারণ পালনীয় বিধিগুলির সহিত ব্রাহ্মণ্য আচার-বিচার, রীতিনীতিও পালিত হয়। শঙ্করদেব জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মসংহতিতে জাতিভেদ প্রথার কঠোর সমর্থন বিদ্যমান। কয়েকটি দামোদরিয়া সত্রে (যথা—দখিণ পাঠসত্র) তান্ত্রিক দীক্ষাও দেওয়া হইত। আউনীআঠি সত্র, গড়মূর সত্র, কুরু-বাহি সত্র, ব্রহ্মসংহতির অন্তর্ভুক্ত। অহোমরাজগণ ব্রহ্মসংহতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর 'পুরুষ সংহতি'-র প্রবর্তন করেন। এই সংহতি আদি এবং প্রধান সংহতিরূপে প্রচারিত। শঙ্করদেবের ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শ এই সংহতি যথাযথভাবে পালন করে। বরদোয়া সত্র, বড় বারজনীয়া সত্র, সরু বারজনীয়া সত্র ও কনকা-বারজনীয়া সত্র পুরুষসংহতির অন্তর্গত।

'নিকা' বা 'নিষ্ঠা সংহতি'-র প্রবর্তক মথুরাদাস বুঢ়া আতা। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য নিয়মনিষ্ঠার প্রতি এই সংহতির বিশেষ লক্ষ্য। এই সংহতিতে ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান গুরুত্ব পায় না। মাজুলিস্থিত কমলাবাড়ী সত্র, কামরূপের বড়পেটা সত্র ও কোচবিহারের মধুপুর সত্র হইল নিকা সংহতির তিনটি প্রধান কেন্দ্র।

গোপাল দেব আতা 'কালসংহতি'-র প্রতিষ্ঠাতা। কালসংহতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইল গণতান্ত্রিকতা। শঙ্করদেবের একেশ্বরবাদের উপর নৈষ্ঠিক বিশ্বাস, গুরুবাদে প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠানে চরম ঔদাসীন্য কালসংহতির বৈশিষ্ট্য। 'মায়ামবা সত্র' এই সংহতির অন্যতম কেন্দ্র।

॥ ৯ ॥ অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম-আন্দোলন ও সাহিত্য

শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম অসমীয়া সাহিত্যেও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কেবল ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে নহে, ষোড়শ শতকের অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসেরও প্রধান পুরুষ হইলেন শঙ্করদেব এবং তৎশিষ্য মাধবদেব। উত্তরসূরীরা তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া অসমীয়া সাহিত্যকে ধ্রুপদী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া শঙ্করদেব ও তাঁহার উত্তরসূরীরা অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের রচনাবলী পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ :

(ক) হরিচরণ অনন্তকন্দলী : ইনি কোচরাজ নর-নারায়ণের সভাকবি, শঙ্করদেবের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। রচনা—ভাগবতপুরাণের অনুবাদ [৪, ৫, ৬, ৯ এবং ১০ স্কন্ধের শেষার্ধ (শঙ্করদেবের আদেশে)], হরিহরযুদ্ধ, বৃত্রাসুরবধ. ভারতসাবিত্রী, জীবস্তুতি, কুমারহরণকাব্য (উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী)।

(খ) **সার্বভৌম ভট্টাচার্য :** ইনি কুলগত ধর্মে শাক্ত, পরে শঙ্করদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। রচনা—ভাগবত-ভবিষ্য-পদ্মপুরাণের অংশবিশেষের অনুবাদ। 'স্বর্গখণ্ডরহস্য' পদ্মপুরাণ-অনুবাদের শিরোনাম।

(গ) **শ্রীধর কন্দলী :** ইনি শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন। রচনা—ঘুমুচা যাত্রা (শঙ্করদেবের 'কীর্তন-ঘোষা'-র অন্তর্গত একটি অধ্যায়), কানখোবা. (কৃষ্ণবাল্যলীলা-শ্রয়ী শিশুমনোরঞ্জক কবিতা)।

(ঘ) **কলাপচন্দ্র :** রাম সরস্বতীর পুত্র, শঙ্করদেবের সমকালীন কবি। রচনা—ভগবতের অনুবাদ (৪ স্কন্ধের কিয়দংশ) এবং রাধাচরিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শঙ্করদেব ও কলাপচন্দ্র উভয়েই কোচ রাজসভায় ছিলেন। কিন্তু কলাপচন্দ্র রচনা করিলেন 'রাধাচরিত' এবং শঙ্করদেব ভগবতের ভাষান্তর করিলেন। শঙ্করদেবের ধর্মে ও রচনায় কোথাও রাধ নামোল্লেখ নাই, কেবল 'কেলিগোপাল' নাটকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাহাও গীতগোবিন্দের অনুসরণে।

(ঙ) গোপাল চরণ দ্বিজ : রচনা—ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ-এর কিয়দংশের অনুবাদ।

(চ) ভটদেব (বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্য) : রচনা—শ্রীভাগবত-কথা (গদ্যে ভাগবতপুরাণের অনুবাদ)।

গীতা :

(ছ) ভট্টদেব (বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্য) : রচনা—শ্রীগীতা-কথা (শ্রীধরস্বামীর 'সুবোধিনী'-টীকানুযায়ী সমগ্র গ্রন্থ গদ্যে রচিত)।

(জ) গোবিন্দ মিশ্র : রচনা : সমগ্র গীতার পদ্যানুবাদ।

রামায়ণ :

(ঝ) হরিহর অনন্তকন্দলী : রচনা—মহীরাবণ বধ।

মহাভারত :

(ঞ) কংসারি কায়স্থ : ইনি রাম সরস্বতীর সমসাময়িক। রচনা—মহাভারতের অনুবাদ (মূলানুগ)।

(ট) রাম সরস্বতী (ওরফে, অনিরুদ্ধ/কবিচন্দ্র/ভারতভূষণ/শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ) : কোচ-রাজ নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি মহাভারতের ছয়টি পর্ব [আদি, বন, উদ্যোগ, ভীষ্ম (বিদ্যাপঞ্চাননের সহযোগিতায়), দ্রোণ (পুত্র গোপীনাথ ও দামোদরের সহ-যোগিতায়) ও কর্ণ] অনুবাদ করিয়া ছিলেন। দামোদর স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছিলেন শল্যপর্ব। রাম সরস্বতীর অন্যান্য রচনা—কয়েকটি 'বধ কাব্য' (মহাভারতের বন-পর্বান্তর্গত কুলাচলবধ, বঘাসুর বধ, ক্ষতসুর বধ, কূর্মবলিবধ, অশ্বকর্ণবধ, জঙ্ঘাসুর বধ, ভোজকঠবধ) এবং ভীম চরিত।

(ঠ) জয়নারায়ণ (স্তুতিপর্ব)।

(ড) লক্ষ্মীনাথ দ্বিজ (শান্তি পর্ব)।

(ঢ) গঙ্গাদাস ও তৎসহ সুবুধি রাই ও ভবানী দাস (অশ্বমেধ পর্ব)।

গীতগোবিন্দ :

(ণ) রাম সরস্বতী [ভাগবত ও গীতগোবিন্দ (শুক্লধ্বজ-কৃত টীকা অনুসরণে) গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ]।

চরিত্রে কিয়দংশে ভিন্ন হইলেও অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মেরই অনুবৃত্তি মাত্র। অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেবও স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্ট মতবাদ (যেমন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন) প্রচার করেন নাই। অসমীয়া বৈষ্ণব ভাবনায়

মূল উৎস—ভাগবত পুরাণ। এই ভাবনার রূপায়ণ দেখা যায়, শঙ্করদেবের 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'ভক্তিপ্রদীপ'-এ, মাধবদেবের 'নামঘোষা'-য় এবং ভট্টদেবের সংস্কৃতে রচিত 'ভক্তিবিবেক' গ্রন্থে। ভাগবতের পরেই যে-গ্রন্থটি অসমীয়া সাহিত্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইল মহাভারত। অসমীয়া মহাভারতের মূল সুর ভক্তি এবং ইহা অন্যতম বৈষ্ণবশাস্ত্র হিসাবে পরিগণিত। অনুবাদকেরা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব এবং এই অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার। বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রের ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে শঙ্করদেব ও মাধবদেব গীতার প্রাসঙ্গিক কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সমগ্র গীতা ও ভাগবতের গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন ভট্টদেব, শঙ্কর-শিষ্য দামোদর দেবের অনুরোধে। এই অনুবাদকার্যের পশ্চাতে ভট্টদেবের যুগচেতনা ও ধর্মচেতনা যুগপৎ লক্ষিত হয়। ভাগবত ও গীতা, এই দুই মহাগ্রন্থের মর্মবাণী যাহাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই ভট্টদেব পদ্যের পরিবর্তে গদ্যকে তাঁহার অনুবাদকর্মের বাহন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ঐতিহ্য-লালিত ভট্টদেবের সহজ, সরল ও পরিণত রচনাশৈলী উত্তরকালে বৈষ্ণব গদ্য-লেখকগণের আদর্শ হিসাবে (বিশেষতঃ তত্ত্বাত্মক রচনার) গৃহীত হইয়াছিল। সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপর একটি উজ্জ্বল নাম—রাম সরস্বতী। ইঁহার অনুবাদকর্ম (বিশেষ করিয়া মহাভারতের পর্বগুলির অনুবাদ) আয়তনেও যেমন বিস্তৃত, পাণ্ডিত্যেও তেমনি সুগভীর।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এই অনুবাদ-সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকে। সপ্তদশ শতকের শেষাংশে আসামে বৈষ্ণবসম্প্রদায় রাজানুকূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। রাজা গদাধর সিংহ [৩৬] বৈষ্ণববিদ্বেষী ও নৈষ্ঠিক শাক্ত ছিলেন। পরবর্তী রাজা রুদ্রসিংহ শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না। রাজানুকূল্যের জোয়ার-ভাঁটায় বৈষ্ণবধর্মের অগ্রগতিও মন্দীভূত হয় এবং শাক্তধর্মের পুনরভ্যুদয় হইতে থাকে। সাহিত্যেও ইহার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। অত্রলিখিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন কবি ও তাঁহাদের রচনাবলী লক্ষ্য করিলেই ইহা বোঝা যায়।

সপ্তদশ শতক :—(ক) রঘুনাথ মিশ্র, ওরফে, ভাগবত মিশ্র (বিষ্ণুপুরাণের আংশিক ও সাত্বত তন্ত্রের অনুবাদ); (খ) শ্রীরাম আতা (ইঁহার গীত-রচনায় জয়দেবের কাব্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইনি চক্রধ্বজ সিংহের সমকালীন ছিলেন)।

অষ্টাদশ শতক :—(গ) কবিচন্দ্র দ্বিজ (রাজা শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মপুরাণের অনুবাদ); (ঘ) অনন্ত আচার্য [রাজা শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শাক্ত (শিবদুর্গা-বিষয়ক) কাব্য 'আনন্দলহরী']; (ঙ) রামনারায়ণ চক্রবর্তী,

ওরফে, কবিরাজ চক্রবর্তী [রুদ্র ও শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় 'তুলসী চরিত' বা 'শঙ্খাসুর বধ' (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ড অনুসরণে), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আংশিক অনুবাদ, 'মাধবসুলোচনা' কাব্য (পদ্মপুরাণ অনুসরণে); গীতগোবিন্দের অনুবাদ; 'শকুন্তলা কাব্য'] ; (চ) দীন দ্বিজবর [মাধবসুলোচনা কাব্য (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় অনুসরণে)] ; (ছ) রুচিনাথ কন্দলী (মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। অনুবাদে কালিকা-বামন-ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব বিদ্যমান) ; (জ) মধুসূদন মিশ্র (মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ) ; (ঝ) কবিশেখর বিদ্যাচন্দ্র ভট্টাচার্য (রাজেশ্বর সিংহের সমকালীন। ইঁহার হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের অনুবাদে কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধার উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব সূচিত করে) ; (ঞ) কবিশেখর ভট্টাচার্য (সংস্কৃত কামশাস্ত্রের অনুবাদ) ; (ট) রতিকান্ত-নন্দেশ্বর-নরোত্তম-খড়্গেশ্বর দ্বিজ (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ) ; (ঠ) রঘুনাথ মহন্ত [অদ্ভুত রামায়ণ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে), শত্রুঞ্জয় কাব্য এবং রামায়ণের গদ্যানুবাদ] ; (ড) বড়পাত্র গোহাইন (যোগিনীতন্ত্রের অনুবাদ)।

তিনটি সূত্র হইতে আসামে বৈষ্ণবধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সূত্রগুলি হইল— ক) শঙ্করদেব, মাধবদেব ও অন্যান্য সন্তদের জীবনী (গদ্যে ও পদ্যে লিখিত) ; (খ) সত্র ও সংহতি প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিবৃত্ত ; গ) কোচ 'রাজবংশাবলী' এবং অহোম্ নৃপতিগণের 'বুরঞ্জি'। শঙ্করদেবের জীবন লইয়াই অসমীয়া সাহিত্যে জীবনীগ্রন্থের সূত্রপাত, যেমন চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে বাংলা-সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার শুভারম্ভ হইয়াছিল। গদ্যে ও পদ্যে রচিত সন্তজীবনীগুলির মধ্যে গদ্যে রচিত 'কথাগুরুচরিত'গুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য, যদিচ, এইগুলির তথ্যসমৃদ্ধি সর্বাংশে সন্দেহাতীত ও প্রমাণসিদ্ধ নহে। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে (১৭০০ খ্রীঃ) সত্র ও সংহতিগুলির বিবর্তনের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে দুইটি রাজসভা (কোচ ও অহোম্) সংযুক্ত। সপ্তদশ শতকের পূর্বে লিখিত এই দুই রাজগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত (বিশেষতঃ কোচ রাজবংশের) পাওয়া যায় না।

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম কেবল ধর্মমাত্র নহে, ইহা একটি প্রতিষ্ঠান। শঙ্করদেবের সত্র-প্রতিষ্ঠা আসামে বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সত্রগুলি কেবল দেবগৃহ হিসাবেই পরিগণিত নহে, এইগুলিকে একদিক দিয়া আবাসিক বিদ্যাসত্রও বলা যায়। সত্রাধিকারিকেরা সন্ন্যাসীদের বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ, পুঁথি-নকল, সংস্কৃত গ্রন্থাদির অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ-কার্যে পারদর্শী করিয়া তুলিতেন। বৈষ্ণবধর্মবিশ্বাস ও

ভাবধারায় বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষালাভের পর এই সকল সন্ন্যাসীকে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইত। কালক্রমে এই সন্ন্যাসীগণ নূতন নূতন সত্র স্থাপনা করিতেন এবং এইরূপে সমগ্র দেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটিত। আসামের জনজীবনে 'নামঘর' বা 'কীর্তনঘর'-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। অসমীয়া গ্রামাণ সমাজে এই নামঘরগুলি পঞ্চায়েৎ-সদৃশ। নামঘরগুলিতে কেবল ধর্ম-দর্শন-শাস্ত্রাদিই আলোচিত হয় না, জনজীবনের বিবিধ সমস্যা, এমন-কি, রাজনীতিও আলোচনার পরিসর হইতে বাদ পড়ে না। সংস্কৃতির দিক হইতেও নামঘরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্কিয়া নাঠ, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাদি পুরাণকাহিনীর নাট্যরূপায়ণ সংস্কৃতির উন্নতির সহায়ক।

ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি—কোনটিই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যে-কোন রূপ জাগরণের প্রাণ-কেন্দ্রে থাকে মানুষ। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মান্দোলন অসমীয়া জনগণের আত্মিক উত্তরণ এবং অসমীয়া ভাষা ভাবনা ও সংস্কৃতির একটি বলিষ্ঠ দিক্ পরিবর্তন। এই আন্দোলন অসমীয়া জনগণকে দিয়াছিল নূতন জীবন ও নূতন মর্যাদা।

ত্রিপুরা

॥ ১ ॥ জাতি

ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত অন্যূন পঞ্চদশ শতক হইতে সম্পৃক্ত। এই রাজ্যের আদি অধিবাসীরা জাতিতে বোড়ো (*Bodo*)। যদিও বর্তমানে তাহারা 'হিন্দু' বলিয়া পরিচিত, তথাপি, মধ্যযুগীয় বোড়ো জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সকল চিহ্নই তাহাদের মধ্যে বর্তমান। তিপ্রা (=সং ত্রিপুরা) বা মৃউং (Mrung) জাতি নিজেদের চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডবদের বংশধর বলিয়া দাবী করে।

দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস জানা যাইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমটি হইল রাজমালা (১৪৫৮খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়টি ত্রিপুরা-বুরঞ্জি (১৭২৪ খ্রীঃ) [১]। রাজমালায় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সমকালীন ইতিহাস হিসাবে ত্রিপুরা-বুরঞ্জি যথেষ্ট মূল্যবান।

॥ ২ ॥ রাজনৈতিক ইতিহাস

ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহসঙ্কুল। প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে ত্রয়োদশ শতকে (১২৪০ খ্রীঃ) গৌড়রাজ (সম্ভবতঃ বাংলার তুর্কী সুলতান) ত্রিপুরা আক্রমণ করিলে ত্রিপুরারাজ কীর্তিধরের (চেঙ্ ফুম্ ফা) [২] পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী অমিত বিক্রমে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাংলার তুর্কীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ইন্দোমোঙ্গলীয় জাতির এই প্রথম বিজয়।

ত্রিপুরার প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি হইলেন—ধর্মমাণিক্য (১৫ শতক)। ইনি জাতিতে বোড়ো হইলেও মনেপ্রাণে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন—

'The first great King of the *Tipras* was *Dharma-manikya* (c. 1431-1462) He was a patron of learning, i. e. learning in Bengali and Sanskrit, although he himself was a *Bodo*-speaker. He inaugurated, the *Raja-mala* poetic chronicle of Tripura in Bengali, and he settled Brahmans in his realm and was himself a staunch Hindu.' [৩]

তাঁহার পর অপর দুইজন প্রধান নৃপতি হইলেন, ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ খ্রীঃ ও বিজয়মাণিক্য (১৫২৯-৭০ খ্রীঃ)। ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার পত্নী কমলাদেবীর নাম ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রাজত্বকালে প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, বাংলার মুসলমান সুলতান হুসেন শাহের অধিকৃত চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলকে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তিকরণ (১৫২৫ খ্রীঃ) এবং ত্রিপুরা হইতে আক্রমণকারী মুসলমানদিগের বিতাড়ন। ধন্যমাণিক্যের অপর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল নরবলি প্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা। শক্তিদেবতার সম্মুখে এই নরবলি হইত। এই বিশেষ প্রথার উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে, তৎকালে ত্রিপুরায় শাক্তধর্মের প্রচলন ছিল।

'*Dhanya-manikya* tried to abolish human sacrifices which used to be performed very frequently before the *Sakti* goddess, and was able to reduce it to about three only, and then when suitable war-prisoners were available.' ৪

নৃপতি ধন্যমাণিক্য সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রজাদিগের মধ্যে বাংলাভাষা প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, তিনি সংস্কৃত গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। ধন্যমাণিক্য হিন্দুধর্মবিশ্বাসের সমর্থক ছিলেন এবং স্বীয় রাজ্যে বহু মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

'He was a patron of literature and of the arts as he was a soldier and conqueror, and he sought to spread the use of Bengali among the people by encouraging translations into Bengali of Sanskrit works. He built many temples and got artists to carve beautiful images ; and he was a great supporter of the Hindu faith. He was certainly one of the greatest personalities among the Indo-Mongoloids.' ৫

শাক্ত রাজা ধন্যমাণিক্যের দুই পুত্র—ধ্বজমাণিক্য ও দেবমাণিক্য। দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয়মাণিক্য। ইনি আকবর ও কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের সমকালীন ছিলেন। বিজয়মাণিক্য শ্রীহট্ট, জৈন্তী ও খাসিয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এবং পাঠান সুলতান সুলেমান কিরাণীর ত্রিপুরা-অভিযান ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ইনি অপ্রতিহত প্রভাবে বিক্রমপুর, সোনার গাঁ জয় করিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের বিস্তার করেন। বিজয়মাণিক্যের পর ত্রিপুরারাজ্যের গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ত্রিপুরার সহিত মোগল, বাংলার মুসলমান ও আরাকান-বর্মীদের

সংঘর্ষ চলিতেই থাকে। অমরমাণিক্য (১৫৯৭-১৬১৯ খ্রীঃ)ও তাঁহার দুই পুত্র আরাকান-বর্মীদিগকে কিছুকাল প্রতিহত করিলেও অবশেষে আরাকানীরা ত্রিপুরা অধিকার করে (১৫৮৮ খ্রীঃ) এবং অমরমাণিক্য আত্মহত্যা করেন। ত্রিপুরার সপ্তদশ শতকের ইতিহাস ক্রমাবনতির উল্লেখ্য, মোগলদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিলেও 'স্বাধীন ত্রিপুরা' কদাপি সুবা বাংলার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।

॥ ৩ ॥ ধর্মমত

অন্যান্য বোড়ো উপজাতিদিগের ন্যায় ত্রিপুরার আদি বোড়ো তিপ্রাদেরও নিজস্ব ধর্ম ও দেবগোষ্ঠী ছিল। সম্ভবতঃ, ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের ফলে এই উপজাতীয় দেবগোষ্ঠী হিন্দুদেবগোষ্ঠীর সহিত মিলিয়া যায়। বর্তমানে ত্রিপুরার হিন্দু-ধর্মে প্রধান দেবতার সংখ্যা চতুর্দশ—শঙ্কর, শিবাণী, মুরারি, কমলা, ভারতী, কুমার (=কার্তিক), গণেশ, বেধস্ (=বিধি বা ব্রহ্মা), ধরণী, জাহ্নবী, পয়োধি, মদন, অগ্নি ও হিমালয়। 'শঙ্করং চ শিবাণীং চ, মুরারিং, কমলাং তথা। ভারতীং চ কুমারং চ গণেশং বেধসং তথা॥ ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পযোধিং মদনং তথা। হুতাশং চ নগেশং চ দেবতাঃ তাঃ শুভাবহাঃ॥'—(সংস্কৃত রাজমালা); 'হরোমা, হরিমা, বাণী, কুমারো, গণপা, বিধিঃ। ক্ষমাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দশাঃ॥'—(রাজমালিকা)[৫]। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থে (পৃঃ ২৪-২৮) মোট উনবিংশটি দেবতার আদি নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়—(ক) মতই কতর *Matai-katar*=পরদেবতা [=শঙ্কর]; (খ, গ) লাম-প্রা *Lam-pra*=আকাশ-সমুদ্র [খাব্ধি অথবা ক্ষমা-অব্ধি]; (ঘ) সাং গ্রমা *San-gra-ma*=নগেশ অর্থাৎ হিমালয়; (ঙ) তুই-মা *Tui-ma*=গঙ্গা; (চ) মাইলু-মা *Mailu-ma*=ধান্যদেবতা [শ্রী বা লক্ষ্মী]; (ছ) খুলু-মা *Khulu-ma*=তুলার দেবতা; (জ) বুরহা-ছা *Burha-cha*=রোগনিরাময়ের দেবতা; (ঝ, ঞ) বনী রাও *Bani-rao* এবং থনি রাও *Thani-rao*=বুরহা ছায়ের দুই পুত্র; (ট, থ) সাতজন বুড়ারক-ভগিনী। ইহারা হিন্দুমতে সপ্ত ডাকিনী বা যোগিনী, ত্রিপুরী মুসলমানমতে সপ্ত পরী; (দ, ধ) গোরাইয়া *Goraiya* ও কালাইয়া *Kalaiya*=এই দুই ভ্রাতা চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূজিত হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রাজা রত্ন ফা, ওরফে, রত্নমাণিক্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত একটি রৌপ্যমুদ্রার উভয়দিকে যথাক্রমে উৎকীর্ণ আছে—'শ্রী শ্রীযুত রত্নমাণিক্যদেব/শ্রীচতুর্দশদেব চরণপর শক ১৩৮৬'। ইন্দোমোঙ্গলীয় এক শাখা গোষ্ঠীর দেবদেবীর

পৌরাণিক দেবদেবীতে রূপান্তরীকরণের ইহা একটি সুনির্ভর সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইতে পারে।[৬]

অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, ত্রিপুরায় পূর্ণাবয়বযুক্ত, মূর্তির পরিবর্তে এই সকল দেবতাদিগের মস্তকই কেবল প্রতিমা হিসাবে পূজিত হয়। হিন্দুদেবতার পূজায় ইহা একটি আর্যেতর প্রভাব বলা যায়। এই মস্তকপূজা মস্তক-শিকারী নাগা ও বোর্ণিয়োর ডায়াক উপজাতিদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রিপুরার দুইটি বৃহৎ উৎসব হইল—খারচি পূজা ও কের পূজা। শেষোক্ত পূজাতে 'ভেম্‌রা'-র ব্যবহার ব্রাহ্মণ্য-পূজানুষ্ঠানের অন্তর্গত নয়। ইহা ব্যতীত মহিষ, বন্য মহিষ, শূকর, কুক্কুর, হংস, কবুতর, মৎস্য এবং কূর্ম বলিও আর্যেতর প্রভাবের স্মারক। ত্রিপুরার জাতীয় মন্দিরে (বর্তমানে, আগরতলার সহরতলিতে অবস্থিত) ব্রাহ্মণ ও ত্রিপুরী পুরোহিত উভয়েই একত্রে পূজানুষ্ঠান করে।

'The *Tipras,* like the other *Bodo* groups, had their tribal religion much modified by Hinduism. But among them, and under the ægis of the ruling house of *Tripura*, a good deal of their old pre-Hindu religion and its rituals is preserved, as part of the State religion. For a number of centuries the *Tipra comtawas* (as the Assamese writers have called them in 1724) or *Cantais* (as they are now called) or high priests, and the *Tipra Deodhais* or *Deodharis* (*Deoris*) have ministered to the old gods, holding a position in society almost as exalted as that of the Brahmans. *Cantais* and *Deodhais* on the one hand, and Brahmans on the other—the former preserving the old gods (though sometimes under new names) and the old rites—these are the custodians of *Tipra* religion : a dual arrangement which is still in vogue. The 'national pantheon' of the *Tipras* consists of a group of 14 gods who were worshipped by the *Cantais* in a series of 14 metal heads in a temple at Udayapur which formed the *Tipra* Palladium. This Palladium or National Shrine of the *Tripura* people has now been removed to a suburb of the present capital of the

State, Agartala, where the rites daily take place—with both Brahmans and *Cantais* officiating.' [৭]

দেখা যাইতেছে, ত্রিপুরার হিন্দুধর্মে আর্য ও আর্যেতর উভয় উপাদানই বর্তমান। চতুর্দশ দেবতার অন্তর্গত শিব ও হরি এই নামের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মই ত্রিপুরায় প্রচলিত। তবে ত্রিপুরাতে বৈষ্ণবধর্ম থাকিলেও তাহার প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। ত্রিপুরা ও ত্রিপুরেশ্বরী, এই দুই নাম শৈব ও শাক্তধর্মের প্রাধান্যেরই ইঙ্গিত করে। ইহা ব্যতীত, ত্রিপুরা একটি পীঠস্থানও বটে—'ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মতা। ভৈরবস্ত্রি-পুরেশশ্চ সর্বাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥'—(তন্ত্রচূড়ামণি)।

মণিপুর

॥ ১ ॥ নাম

কুচবিহার-আসামের ন্যায় ভারতবর্ষের অপর একটি ভূখণ্ডের সহিত ভাগবত-সম্পৃক্ত ধর্ম বিশেষভাবে জড়িত। এই ভূখণ্ডটি হইল বর্তমান মণিপুর রাজ্য। মিথাই (Meithei) রাজ্যের সংস্কৃত নাম—মণিপুর। এই নামকরণ সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়—পার্বতী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলা-দর্শনের অভিলাষিণী হইলে শ্রীকৃষ্ণ হরপার্বতীকে অন্যত্র রাসলীলা করিতে বলেন। হরপার্বতী তখন সপ্তদেবতা-(সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি)-কে সঙ্গে লইয়া মণিপুরে আসেন। কিন্তু কৌব্রু পর্বত সংলগ্ন ভূখণ্ডটি জলাদ্র থাকায় রাসলীলার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়। শিবের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার ঈষাণ, বায়ু প্রভৃতি দশদেবতা সহ আসিয়া একটি স্থান (বর্তমানে 'বিষ্ণুপুর' নামে পরিচিত) শুষ্ক করিয়া দিলেন। অতঃপর হরপার্বতী সেই স্থানে মহারাসলীলা করিলেন। সপ্ত অহোরাত্রব্যাপী এই মহারাসলীলায় অনন্তনাগ স্বীয় মস্তকস্থিত মণির দ্বারা স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম হইল মণিপুর বা শিবনগর। মতান্তরে, শিবনগরই পরে মণিপুর বলিয়া পরিচিত।

'The land originally was named Siva-nagara after Siva : after the *Maha-rasa* dance, it came to be known as *Manipura*.'[১]

এই মণিপুর বা মিথাই রাজ্যের উল্লেখ 'ভবিষ্যপুরাণ'-(ব্রহ্মখণ্ড)-এ পাওয়া যায়। 'বরেন্দ্রতাম্রলিপ্তাঞ্চ হেড়ম্ব-মণিপুরকম্। লৌহিত্যাত্রিপুরঞ্চৈব জয়ন্তাখ্যং সুষঙ্গকম্॥'[২] শ্লোকস্থ—বরেন্দ্র, উত্তর-মধ্য বাংলায়; তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায়; হিড়িম্ব, কাছাড় রাজ্যের অন্তর্গত ডিমাপুর; মণিপুর; লৌহিত্য অর্থাৎ আসাম; ত্রিপুরা; জয়ন্ত অর্থাৎ বর্তমান জৈন্তি; এবং সুষঙ্গ, উত্তর মৈমনসিংহ।

॥ ২ ॥ জাতি

মিথাই (Meithei) বা মণিপুরীগণ হইল কুকী-চীন গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। অসমীয়াদিগের ন্যায় ইহারাও বহিরাগত। ইহাদের পূর্ব-ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মিথাইগণের মণিপুরে আগমনের পূর্বে কুকী-চীন

গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখা এই অঞ্চলের আসিয়াছিল এবং ইহারা বর্তমানে মণিপুর ও পূর্ব-ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছে। অনুমান করা যায়, পঞ্চদশ শতকে মিথাইরা হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই প্রভাবের ফলে মণিপুরী দেবতারা হিন্দুদেবগোষ্ঠীব অনুরূপ হইয়াছিল। যেমন—মই Mai= ব্রহ্মা; ইশিং Ising=বিষ্ণু; নাঙ শিট্ Nung Shit=শিব; শোররেণ Shoraren =ইন্দ্র; মরজিঙ Marjing=কুবের; খোরিফব Khoriphaba=বরুণ; ওয়াঙব্রেল Wangbrel=যম; ইরুম Irum=অগ্নি; তওরৈনই Taoroinai= অনন্ত, প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত, মিথাই দেবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীন মণিপুরী সূর্যকন্যা (Panthoibi), বাস্তুদেবতা (Yumthailai), বাসুকীও (Tai bong khomba) অন্তর্গত। এইরূপে কুকী এবং নাগারাও ক্রমশঃ হিন্দুসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া মণিপুরীদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

'Definite evidence of Hinduisation through the spread of the worship of Vishnu is found in Manipur, as early as the 15th century, when king Kiyamba ruled over the Meitheis,—apart from traditional accounts which take the matter to a hoary antiquity. As usual, approximation of the old Meithei religion to the Hindu Brahmanical one began with the identification of the gods of the two religions. This must have gone hand in hand with the advent of the first Hindu missionaries, who were Brahmans in the first instance (not sent by any organisation but individuals drifting on their own from the neighbouring Sylhet and Kachar and beyond) and Vaishnava mendicants in the second, belonging to the North Indian Ramananda order and the Bengali Chaitanya order, which had establishments in Sylhet.'[৩]

॥ ৩ ॥ মণিপুরী পুরাণ

মণিপুরীগণের নিজস্ব পুরাণ-উপকথা আছে। কালক্রমে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সহিত মিলনের ফলে 'মণিপুরী পুরাণ' গড়িয়া উঠে। তবে, এই পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত নহে—ইহা মণিপুরী ভাষায় লিখিত। পুরাণ-কাহিনীগুলিও কোন একটি বিশেষ গ্রন্থে গ্রথিত হয় নাই। পুনশ্চ, একই কাহিনীর অন্যত্র রূপান্তরও লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস, কাহিনী, কিংবদন্তী-সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সৃষ্টিতত্ত্বটির উল্লেখ করা যাইতে পারে (কাহিনীটি শিব গণেশকে বলিয়াছিলেন)—পরদেবতা অতিয় গুরু শিদব (Atiya Guru Shidaba) সৃষ্টিমানসে স্ব-অঙ্গ হইতে কোডিন (Kodin) নামে এক দেবতাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে মরণশীল প্রাণী সৃজন করিতে বলিলেন। কোডিন সাতটি বানর ও সাতটি ভেক সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহা পরদেবতার মনঃ-পূত হইল না। ইহার পর, কোডিন তাঁহার নির্দেশে তৎসদৃশ মানব-সৃষ্টি করিলে পরদেবতা সেই মানবদেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন। পরদেবতা সপ্ত অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া মণিপুরে আসিয়াছিলেন। পরে, এই সপ্ত অপ্সরা সপ্ত গ্রহদেবতাকে বিবাহ করে ও প্রত্যেকের একটি করিয়া সন্তান হয়। এই সপ্ত পুত্র হইল মণিপুরের সাতটি বংশের আদিপুরুষ। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, হিন্দুগোত্রপিতা ঋষিদিগের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বর্তমান। যথা,—Angom=কৌশিক; Ningthouja=শাণ্ডিল্য; Luwang=কশ্যপ; Khumon=মৌদ্গল্য; Khabangangba=নৈমিষ্য; Moirang=আত্রেয়; Chengloi=ভরদ্বাজ। অপর একটি মিথাই কাহিনীতে এই একই গল্পের রূপান্তর দেখা যায়—পরদেবতার দেহের বিভিন্ন অংশ (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র ও দন্ত) হইতে এই সাতটি গোত্র বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল।[৫]

॥ ৪ ॥ পৌরাণিক ঐতিহ্য ও মণিপুরী রাজবংশ

পূর্বলিখিত ('নাম' অংশ দ্রষ্টব্য) মণিপুরী পুরাণ-কাহিনী অনুসারে মহারাসের পর দেবতাগণ শিবকে মণিপুরের অধিপতি হইতে বলেন। কিন্তু শিব তৎপরিবর্তে পাতালাধিপ অনন্তনাগকে মণিপুরের নৃপতি করেন। বরাহরূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে পাতালের সহিত মণিপুরের একটি সংযোগকারী সুড়ঙ্গ পথও নির্মিত হয়। পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসারে নাগরাজ অনন্তই মণিপুরের প্রথম রাজা। অনন্তের পর গন্ধর্ব চিত্রভানু মণিপুরের রাজা হন। তবে কি-করিয়া তিনি নৃপতি হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

মণিপুরের রাজ-বংশ সম্পর্কে পৌরাণিক অন্যান্য দেবতাদের গল্পও আছে। একটি কাহিনীতে দেখা যায়, পরদেবতার (Atiya Guru Shidaba) দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সেন্‌ট্রেঙ (Sentreng) ও কনিষ্ঠ শেমহি (Shemahi)। তাঁহারা পিতার অনুমতি লাভ করিয়া মণিপুরে আসিয়াছিলেন। একদা তাঁহাদের পিতৃভক্তি-পরীক্ষাকল্পে পরদেবতা একটি মৃত গো-রূপ ধারণ করিয়া বিজয়া নদীতে ভাসিতে

ভাসিতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিলেন।[৬] জ্যেষ্ঠাত্মজ ছদ্মবেশী পিতাকে চিনিতে পারেন। তিনি গো-দেহটিকে সপ্ত খণ্ড করিয়া সাতজন গোত্রদেবতাকে দান করেন। পরে, গোত্র দেবতারা সেই গোমাংস দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুকী-পৌরাণিক কাহিনীতে এইস্থানে ইন্দো-ভারতীয় আর্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। কারণ, ইন্দো-ভারতীয় আর্যেরা যজ্ঞ করিতেন এবং সেই যজ্ঞে জীবমাংস উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পুনরায়, পরদেবতা তাঁহার দুই পুত্রকে পরীক্ষা করিলেন—যিনি প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবেন, তিনিই মণিপুরের নৃপতি হইবেন।[৭] জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃসিংহাসনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিযোগিতায় জয়ী হন ও পরদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মণিপুরের সিংহাসন দান করিয়া অন্তর্হিত হন। কিন্তু কনিষ্ঠ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই বিবাদ মীমাংসার্থে পরদেবতা পাতাল হইতে অনন্তনাগে আরোহণ করিয়া মণিপুরে আসেন ও এক বৎসর অন্তর-অন্তর এক-এক ভ্রাতা মণিপুরের নৃপতি হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করেন। অনুমান করা হয়, অনন্তনাগ এবং এই দুই ভ্রাতার রাজত্বের পর গন্ধর্ব চিত্রভানু মণিপুরের নৃপতি হন। এই রাজ-গোষ্ঠীর নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য পুরাণের সহিত মণিপুরী পুরাণের সংমিশ্রণও লক্ষণীয়। যেমন, বিষ্ণুর নাভিকূপ হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব। ব্রহ্মা হইতে মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। তৎপরে যথাক্রমিক বংশধারা হইল—সূর্য, সাবর্ণ, চিত্রকেতু, চিত্রধ্বজ, চিত্রবীজ, চিত্রসর্ব, চিত্ররাজ ও চিত্রভানু। চিত্রকেতু হইতে চিত্রভানু পর্যন্ত সকলেই গন্ধর্ব। চিত্রভানুর কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত মহাভারতের অর্জুনের বিবাহ হয়। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন। তাঁহার পুত্র সুপ্রবাহু, তৎপুত্র যবিষ্ঠ। মণিপুরে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়, এই প্রসঙ্গে মণিপুরের কয়েকটি স্থানও চিহ্নিত। মহাভারতের সহিত এইভাবে মিথাই পুরাণ-কাহিনীর সংযুক্তি ঘটিতে দেখা যায়। অপর একটি মণিপুরী পুরাকথায় বভ্রুবাহন ও যবিষ্ঠের অন্তবর্তী ত্রয়োদশ নৃপতির নাম পাওয়া যায় এবং এই ত্রয়োদশ নৃপতির মধ্যে আবার প্রথম দুইজনের নাম সংস্কৃতে (কলাপচন্দ্র ও শক্তি)[৮] এবং অবশিষ্ট একাদশের নাম মণিপুরী ভাষায়। যবিষ্ঠকে কোন-কোন স্থলে পরদেবতার জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে।

॥ ৫ ॥ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মণিপুর

রাজা কিয়াম্বার (*Kiyamba*, খ্রীঃ ১৫ শতক) সময় হইতেই মণিপুরের সহিত বঙ্গদেশের যোগাযোগ ঘটে এবং এই সংযোগ রাজা পম্‌হিবোর (খ্রীঃ ১৮ শতক) রাজত্বকালে ঘনিষ্ঠ হয়। কিয়াম্বার শাসনকালে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে প্রচলিত

হয় এবং তাঁহার সময়েই মণিপুরী ভাষার বর্ণমালারও উদ্ভব হয়। এই বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শে রচিত হইলেও ইহা অত্যন্ত জটিল ছিল। প্রধানতঃ মণিপুরী পুরোহিতরাই (Maiba) এই বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহার তেমন প্রচলন ছিল না। বহু মণিপুরী পুঁথি, ইতিহাস ও রীতিনীতির গ্রন্থ এই বর্ণমালাতে রচিত হইয়াছে। গরীব নওয়াজ. সিংহের রাজত্বকালে (১৭০৯-৪৮ খ্রীঃ) মণিপুরীরা এই জটিল বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া বাংলা বর্ণমালা গ্রহণ করে। এর বর্ণমালায় কেবল 'ব.' অক্ষরটি অসমীয়া বর্ণমালা হইতে গৃহীত।

'From the time of king Gharib-nawaz Singh of Manipur (1709-1748), the Manipuri people, through the influence of the Bengali Vaishnavas of the Chaitanya School from Navadwip and Sylhet, accepted the Bengali Script for their language (c. 1740), and now this has become fully established. This has enabled Manipur to come in intimate touch with Bengali in its literature, and with Sanskrit.[৯]

রাজা পম্‌হিবোর (গোপাল সিংহরায়, গরীব নওয়াজ. । ১৭০৯-৪৮ খ্রীঃ) রাজত্বকালে শ্রীহট্টের পথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি মণিপুরে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। মণিপুরের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রাচীন মিথাই ধর্ম, মণিপুরের লৌকিক দেবদেবী, পুরাণকাহিনী, সামাজিক ও লোক-সংস্কৃতি এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম (শৈব ও বৈষ্ণব, বিশেষতঃ, রাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কিত) ও সংস্কৃতি সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

'Manipur Hinduism gradually became a synthesis of the old Meithei religion with its gods and goddesses and myths, its own legends and traditions, its social customs and usages, and its priests and ceremonials, and of Brahmanical Hinduism with its special worship of Radha and Krishna.'[১০]

মণিপুরীরা প্রাচীন মিথাই ধর্ম ও তাহার রীতিনীতিকে বর্জন করে নাই, বরং সমাগত ইন্দো-ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে একটি নবরূপ দিয়াছে। মণিপুরী পুরোহিত (Maibas) এবং পুরোহিতানীরা (Maibis) তাহাদের প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপগুলির সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইয়াছে। মণিপুরবাসীদিগের জীবনধারায়, রীতিনীতিতে এবং ধর্ম-সংস্কৃতিতে এই নূতন ও

পুরাতনের মেলবন্ধনই তাহাদিগকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

'The Hindu-Meithei culture of Manipur is something quite distinctive as a creation of an Indo-Mongoloid people, and it is now evident from the natural and easy beauty and artistic environment of their life, which, isolated from the rest of India, still preserves an old world aroma and atmosphere of its own. The old Meithei religion and cults have not been suppressed, but they have been given a new form and content through contact with the Indo-Aryan world of Hindudom, through Sanskrit and Bengali. The Brahman and Vaishnava spirit is working, but the Maibas (old Meithei priests) and Maibis (priestesses) still carry on the old rites which have been harmonised with the Brahmanical ones.'[১১]

পমৃহিবোর পর মণিপুরের অপর দুইজন নৃপতির নাম উল্লেখযোগ্য—মোরম্বা বা গৌরশ্যাম সিংহ এবং চিং থাং খোম্বা বা ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহ (১৭৫৯-৯৮ খ্রীঃ)। গৌরশ্যাম নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহ রাধাকৃষ্ণের উপাসক, উপরন্তু, নৃত্যগীতললিতকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নৃপতি ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহ মণিপুরের জনসাধারণের মধ্যে গভীরভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পরমভক্তিমতী কন্যা মহারাজ-কুমারী বিম্ববতী (১৭৮০ খ্রীঃ) সুবিখ্যাত মণিপুরী রাসলীলা নৃত্যের প্রবর্তক। গুজরাট হইতে মণিপুর পর্যন্ত, যেখানেই বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি দেখা যায়, সেইখানেই রাস-নৃত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আসামে শঙ্করদেব এবং মাধবদেব তাঁহাদের অঙ্কীয়া নাঠগুলিতে (যথাক্রমে, 'রাস-ক্রীড়া' ও 'রাসঝুমুরা') এই রাসনৃত্য প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আসামের রাস-নৃত্যে রাধার কোন ভূমিকা নাই; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত মণিপুরের রাসনৃত্যে রাধার ভূমিকাই মুখ্য। আসামের 'চালি' নৃত্যও মণিপুরে প্রচলিত। ভাগ্যচন্দ্র সিংহের 'গোবিন্দসঙ্গীত লীলা বিলাস' গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।[১২] প্রাচীন মণিপুরী নৃত্য (সৃষ্টি-বিষয়ক ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদজ্ঞাপক) লৈ-হরব (Lai-haoraba)-এর আধারে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নৃত্য (বিশেষতঃ, রাসলীলা) পরি-কল্পিত হইয়াছিল এবং এই নৃত্য বর্তমানে সর্বভারতীয় নৃত্যকলা হিসাবে স্বীকৃতি

লাভ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা নৃত্যের প্রথম রূপকার মণিপুরী 'মীরাবাঈ' রাজকুমারী বিম্ববতী। মণিপুরী নৃত্যের পোষাকের সৃষ্টিও তিনি করিয়াছিলেন। এই পোষাকেরও আদর্শ উত্তরভারতীয়, রাজস্থানী ও বৃন্দাবনী বস্ত্রসজ্জার অনুরূপ। মণিপুরী রাসনৃত্য কেবল নৃত্য-কলাই নহে,—পিতাপুত্রীর যুগ্মসাধনার অমৃতফল। এই নৃত্যলীলায় ধর্ম ও নন্দনতত্ত্বের যে-অপরূপ মরমিয়া রূপকৃতি প্রকাশিত, তাহাও ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অনন্য।

'Bhagya Chandra is said to have had a vision of Krishna with Radha and the Gopis dancing the *Rasa,* and Princess Bimbavati, who was an accomplished singer and dancer, and quite great in her *bhakti* to Krishna and Radha, helped to translate her father's vision into the exquisitely charming forms of the Radha-Krishna *Rasa* Dance. She transformed the Manipuri religious folk-dance, the Lai-haoraba, the Dance of Creation and Thanks-giving to the Gods, which in her hands retained its original beautiful character, but was sublimated into something mystical, and still more beautiful, by being employed in the worship of Krishna and Radha. Through her artistic sense she designed the remarkably lovely costumes for Radha and the Gopis and for Krishna for this *Rasa,* and in this way gave to India and the Hindu world a new form of aesthetic and mystical expression, which has now captured the rest of India. Maharaj-Kumari Bimbavati of Manipur (c. 1780) thus deserves to have her own niche of honour in the hall of Indian devotion and mysticism and culture and art. Bimbavati is now quite aptly described as the Mira Bai of Manipur.'[১৩]

॥ ৬ ॥ মিথাই সাহিত্য

প্রাচীন মণিপুরী সাহিত্যের সূত্রপাত হইয়াছিল আনুমানিক ১৫০০-২০০০ বৎসর পূর্বে। এই প্রাচীন মণিপুরী সাহিত্য ও তাহার ভাষা আধুনিক মণিপুরী ভাষা ও

সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কিছু-কিছু প্রাচীন মিথাই লোকসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন—চৈনরোল Chainarol (মণিপুরের জাতীয় রোম্যান্টিক ও শৌর্যসূচক কাহিনী-সংগ্রহ), নিং-থৌরোন লম্বুব Ning thouron Lambuba (মণিপুরের রাজাদের যুদ্ধ অভিযান সংক্রান্ত কাহিনী) ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত, মণিপুরী সাহিত্যে নানা রোম্যান্টিক কাহিনীরও (যথা, খম্ব ও থৈবী এবং নোম্‌পোক্‌নিংহৌ ও পন্থৈবীর কাহিনী) সন্ধান পাওয়া যায়। একাদশ। দ্বাদশ শতকের রাজা লোয়াম্বা Loyamba ওরফে লবঙ্গসিংহের (১০৭৪-১১২২ খ্রীঃ) রাজত্বকালে রাজকুমার খম্ব ও রাজকুমারী থৈবীর রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনীর জন্ম হয়। ইহা ভাগবতপুরাণ-কাহিনীর তুল্য লোকপ্রিয় এবং মণিপুরের জাতীয় রোম্যান্টিক গাথাকাব্য হিসাবে পরিগণিত। রাজকুমার নোম্‌পোক্‌নিংহৌ ও রাজকুমারী (রাজা চিং নিংথৌ Ching Ningthou-এর কন্যা) পন্থৈবীর প্রেমকাহিনীর জন্মকাল অপরিজ্ঞাত। খম্ব-থৈবীর কাহিনী প্রাকৃত মানব-মানবীর মিলনোত্তীর্ণ বিষন্ন পরিণতির বেদনাদীর্ণ প্রেমগাথা। হৌ-পন্থৈবীর কাহিনী বিষাদান্ত হইলেও ইহা খম্ব-থৈবীর কাহিনীর সমগোত্রীয় নহে। পন্থৈবীর বিবাহ হইয়াছিল খব নামে জনৈক সেনানীর সঙ্গে। কিন্তু খব ও পন্থৈবীর মধ্যে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। বরং বিবাহের পরেও হৌ-পন্থৈবীর প্রণয়লীলা চলিতে থাকে। এই প্রেমলীলারও পরিণতি অবশ্য বিয়োগান্ত। এই প্রেমকাহিনীটিতে পৌরাণিক আভিজাত্যও পরিলক্ষিত হয়, কারণ, ইহার নায়ক-নায়িকা প্রাকৃত মানব-মানবী নহে—হরপার্বতী এবং উভয়ের মধ্যে 'পরকীয়া প্রেমের' লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সঞ্জাত।

> 'This story has been sublimated as a religious myth—the hero was considered to be an incarnation of Siva, and Panthoibi was Parvati incarnate, and it was a case of *parakiya* love as between Krishna and Radha which is a very vital mystico-philosophical doctrine with the Gaudiya Vaishnavism of Navadwip, which again is the accepted form of Vaishnavism in Manipur.'[১৪]

অতএব, অনুমান করা অসঙ্গত নহে, পন্থৈবীর কাহিনীর জন্মকাল মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের পরবর্তী সময়ে হইয়া থাকিবে।

গরীব নওয়াজ. সিংহের (১৭৪০ খ্রীঃ) রাজত্বকালে মণিপুরী ইতিহাস ও সাহিত্যের

একটি নূতন দিক্ পরিবর্তন হইয়াছিল। এই সময়ে মহাভারত ও রামায়ণ মণিপুরী ভাষায় অনূদিত হয়। মণিপুরী রামায়ণ কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের অনুবাদ। আদি, বিরাট ও অশ্বমেধ, মহাভারতের এই তিনটি পর্বের মণিপুরী অনুবাদ পাওয়া যায়।

ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহের (১৭৮০ খ্রীঃ) রাজত্বকালেই মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচার ঘটে। প্রাক্-হিন্দু মিথাই-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের সামঞ্জস্যসাধনও তাঁহার সময়ে হইয়াছিল।[১৫] অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ধরণের মণিপুরী সাহিত্যের (যথা, ভ্রমণকাহিনী, বংশাবলী ইত্যাদি) সন্ধান পাওয়া যায়।

মণিপুরের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মণিপুরী পরিবেশ এবং সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ বাঙ্গালীত্ব তথা উত্তরভারতীয় হিন্দুত্বের প্রভাব বর্তমান। মণিপুরী পোষাকে, তাহাদের বৈষ্ণবধর্মের আচার-আচরণে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। মণিপুরী অথবা এই মিথাই প্রভাব বর্তমানে 'কুকী' এবং অন্যান্য নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই মণিপুরী-হিন্দু বলিয়া পরিচিত। মণিপুরী সংস্কৃতি হইল আর্য-কিরাত সংস্কৃতি। আর্য এবং আর্যেতর উভয় উপাদানের সার্থক সম্মিলনই হইল মণিপুরী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

'The composite *Arya-Kirata* culture of Manipur will have its own special place of honour among the different forms of provincial or regional culture in India.'[১৬]

মণিপুরী সংস্কৃতির সর্বাধিক রূপায়ণ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার নৃত্যে ও সাহিত্যে। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে মণিপুরের বিশেষ অবদান তাহার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে, তাহার চারু ও কারু শিল্পের রূপায়ণে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংগ্রহণে।

ধর্ম, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি যে-কোন জাতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। বিবর্তনের ধারায় এই বৈশিষ্ট্য নানা উপাদানে (স্বগত ও বহিরাগত) ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। মণিপুরী বলিতে আজ যেমন সেই আদিম ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠী-বিশেষের জনগণকে বোঝায় না, তেমনি তাহার ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেই আদিম গণ্ডীর মধ্যে থামিয়া থাকে নাই। নানা সংযোজন ও বিয়োজনের ফলে আজ সৃষ্টি হইয়াছে মণিপুরী হিন্দুধর্ম ও মণিপুরী হিন্দুসংস্কৃতি। ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সুবিশাল ক্ষেত্রে মণিপুরী হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া দীপ্যমান হইয়া আছে।

গৌড়-বঙ্গ খণ্ড

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের গৌড়-বঙ্গের পরিসীমার পরিপ্রেক্ষীতে পূর্বাঞ্চলীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ ও তৎসম্পর্কিত সাহিত্য হইল বর্তমান আলোচনার মূল বিষয় বস্তু। প্রসঙ্গতঃ, মধ্যযুগে ভারতীয় ধর্মসাধনার সুবিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণববাদের বৈশিষ্ট্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবসাহিত্য সাধনারও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

গৌড়-বঙ্গ

॥ ১ ॥ নাম

প্রাচীন হিন্দুযুগে সমগ্র বঙ্গদেশের কোন স্বতন্ত্র নাম ছিল না। বঙ্গদেশের মানচিত্র বারংবার নানা কারণে (বিশেষতঃ রাজনৈতিক) পরিবর্তিত হইয়াছে। 'গৌড়-বঙ্গ' বলিতে আজ কোন বিশেষ ভূখণ্ড চিহ্নিত নহে ; এই নাম আধুনিক বঙ্গ দেশের প্রাচীনত্ব দ্যোতনা করে মাত্র। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন-ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন—বরেন্দ্রী ও পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি (পশ্চিমবঙ্গ), বঙ্গাল (পূর্ববঙ্গ), গৌড (উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ) প্রভৃতি। বর্তমান কালে 'গৌড়' বলিতে মালদহ ও সন্নিকটস্থ অঞ্চলকে বুঝায় এবং 'বঙ্গ' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের পুরাতন নাম ছিল 'সুহ্ম', পরে ইহা 'রাঢ়' (৯।১০ শতক) নামে পরিচিত হয়। 'গৌড়' নামের উল্লেখ পাণিনির সূত্রে (৬।২।১০০-'গৌড়পুর') ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ('গৌড়িক স্বর্ণ') পাওয়া যায়। ছয় শতকের পূর্বেই বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চল 'গৌড়' নামে পরিচিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের সময় হইতে সম্ভবতঃ 'গৌড়' নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুযুগের অন্তিম পর্যায়ে বঙ্গদেশ 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন 'রাঢ়া' ও 'বরেন্দ্রী' গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান যুগের শেষ ভাগে গৌড়দেশ বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশকেই বুঝাইত। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'-তে পঞ্চগৌড়ের (গৌড়, পাঞ্জাবের পূর্বভাগ, কনৌজ, মিথিলা ও উৎকল) উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ, গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সময় হইতেই এই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। চৈতন্যদেবের সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল গৌড়। সেই হেতু বঙ্গদেশের বাহিরে 'গৌড়ীয়' হিসাবেই বাঙ্গালী জাতি পরিচিত ছিল। অলঙ্কার শাস্ত্রেও বামনাচার্য-প্রোক্ত 'গৌড়ী-রীতি' নামক রচনারীতির কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। বঙ্গদেশের প্রাচীন পীঠস্থানগুলি রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। স্থূলভাবে বলিতে গেলে 'গৌড়-বঙ্গ'-কে প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রমূল বলিতে হয়। পূর্বভারতে আর্য-সংস্কৃতির ধারা গঙ্গা-ভাগীরথীর খাত বাহিয়া আসিয়াছিল। 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'-র উভয়তীরেই আর্যসংস্কৃতি, তথা, বঙ্গ-সংস্কৃতি পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

॥ ২ ॥ প্রত্নলিপি ও মূর্তিশিল্পে বিষ্ণু ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনী

গুপ্ত-পাল-বর্ম-সেন যুগের (কালসীমা—খ্রীঃ ৪।৫ হইতে ১২।১৩ শতক) নানা প্রত্নলেখে এবং মূর্তিশিল্পে বিষ্ণু-কৃষ্ণলীলার খণ্ড পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। গুপ্ত-শাসনের সময় হইতে গৌড়বঙ্গের পরিচয় কিছু-কিছু পাওয়া যাইতেছে; ইহার পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত একান্ত ভাবেই অনুমান-নির্ভর। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রত্নলিপি হইতেছে বাঁকুড়ার অনতিদূরস্থ শুশুনিয়া গুহালিপি। বাঁকুড়ার বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়া পর্বত অবস্থিত। লিপিটি সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন, সংস্কৃতে রচিত, লিপিকাল ৪০০ খ্রীঃ, নির্মাতা 'পুষ্করণাধিপ'[১] সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা। গৌড়-বঙ্গে বিষ্ণু-উপাসনার ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক দলিল। চন্দ্রবর্মা 'চক্রস্বামী' অর্থাৎ বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের নিম্নে ও পার্শ্বে অত্রলিখিত লিপিটি উৎকীর্ণ আছে—'পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিঙ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য/মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ/চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ'। অর্থাৎ, পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি, চক্রস্বামীর দাসপ্রধানের দ্বারা উৎসর্গিত। ('দোসাগ্রেণ' সম্ভবতঃ ভুল পাঠ, শব্দটি 'দাসাগ্রেণ' বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন)। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমতে পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে এমন-কি সুদূর হিমালয়-শিখরেও গোবিন্দস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, কোকামুখস্বামী প্রভৃতির মন্দির ছিল। সম্ভবতঃ, এই সমুদয়ই বিষ্ণুমূর্তি। বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য বহুকাল হইতেই ছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণের বাল্যলীলার বহু কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। সদ্যঃপ্রসূত কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের গোকুলে গমন, গোপগোপীগণের সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়া, গোবর্ধন-ধারণ, যমলার্জুন-সংহার, কেশীবধ, চাণুর ও মুষ্টিকের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি কাহিনী-যে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তাহার পূর্বেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, পাহাড়পুরের প্রস্তর-শিল্প হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। পাহাড়পুরের একখানি প্রস্তরে একটি পুরুষ ও একটি নারীমূর্তি ক্ষোদিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। পাহাড়পুরের যুগলমূর্তিকে যদি রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ধরা যায়, তবে ইহাই গৌড়-বঙ্গে রাধাকৃষ্ণাখ্যানের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সপ্তম শতকে কৃষ্ণলীলা জনপ্রিয় হইলেও সেই সময়ে বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রচলিত ছিল কি-না, তাহা সংশয়িত। পাহাড়পুর-প্রস্তরে অঙ্কিত স্ত্রীমূর্তি রুক্মিণী অথবা সত্যভামাও হইতে পারে।[২] ইহা ব্যতীত, সপ্তম শতকে বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তস্থ

অরণ্য প্রদেশেও ভগবান অনন্তনারায়ণের মন্দির ও পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যায়, বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম বহুদিন হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩]

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পরবর্তী কালে বঙ্গদেশের নৃপতিগণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পাল-রাজগণ বৌদ্ধ, সেন-রাজগণ (বিজয় ও বল্লাল সেন) শৈব, বর্মণদেব ও বল্লাল পরবর্তী সেন-রাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন। তবে সেই সময়ে পারম্পরিক ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বিদ্যমান ছিল; বিভিন্ন ধর্মমতের ব্যবধান রেখাটিও তেমন সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ছিল না। বাঙ্গালীর মানসিক প্রবণতাই হইল—বিবিধের মধ্যে মিলনসাধন। পাল-শাসন সময়ে রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র 'কলিকাল-বাল্মীকি' সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যের প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনা আছে—'শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতঃ ভুজে নাগম্'—ইত্যাদি। শিব ও বিষ্ণুর একত্র বন্দন শ্লোকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলমান অধিকারের পূর্বে বঙ্গদেশের রাজশক্তির ধর্মমত ও ব্রাহ্মণ্যমতানুসারী শাস্ত্রশাসনের পরিচয় পাওয়া গেলেও জনসাধারণের ধর্মমতের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই সময় রাজশক্তির ধর্মমতে প্রধানতঃ বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন জনের প্রাধান্য ছিল।

বর্মশাসন সময়ে বিষ্ণু-কৃষ্ণের বন্দনার নিদর্শন আসাম-বঙ্গের বর্ম-রাজগণের রাজ্যকাল হইতে পাওয়া যায়। কামরূপের বনমালবর্মের শাসনে (৯ শতকের মধ্যভাগ। কামরূপশাসনাবলী) এবং সমতটের 'পরম-বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' ভোজবর্মার শসানে (ঢাকার বেলোবা গ্রামে প্রাপ্ত) ব্রজলীলার ইঙ্গিত আছে—'সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ, কৃষ্ণো মহাভারত-সূত্রধারঃ। অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ, প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ।' অর্থাৎ, সেই গোপী-শতকেলিকার, মহাভারত নাটকের সূত্রধার কৃষ্ণ এখানে ভূমিভার-উদ্ধারকারী অংশা-বতার হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্লোকটিতে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও মহাভারতের কৃষ্ণ — কৃষ্ণের দ্বিবিধ রূপেরই (মাধুর্য ও ঐশ্বর্য) উল্লেখ রহিয়াছে। রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামবাসী 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভট্ট ভবদেব (হরিবর্মার মহামন্ত্রী। ১১।১২ শতক) ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত প্রথম শ্লোকে পূর্তকার ভট্টদেবের প্রশস্তি বর্ণনায় (প্রশস্তিকার তদীয় বন্ধু বাচস্পতি) হরিস্মরণ ('হরিঃ প্রিয়ে বঃ') করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর

পূর্তকীর্তির ইহা একটি নিদর্শন। ভট ভবদেব ও বিজয় সেন উভয়েই মন্দিরে দেবদাসী-নৃত্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে বহু সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। সেন-রাজত্বে মন্দিরের অলঙ্করণে (প্রস্তর চিত্রে) রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর সন্ধান মিলিলেও পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বঙ্গ-ভাষায় রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী-রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সেন-রাজগণ বরেন্দ্রী ও দক্ষিণ রাঢ়ে অনেকগুলি পাথরের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার নিকটে যে-মন্দিরটি ছিল, তাহাতে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর অনেকগুলির চিত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। সেন-রাজগণ শৈব ছিলেন। বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের শাসনগুলিতে যথাক্রমে 'ধূর্জটি', 'অর্ধনারীশ্বর', 'শম্ভু'-র বন্দনা দেখা যায় (যথা, ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের শাসন ; সীতাহাটি নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লাল সেনের শাসন ; লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণ-দীঘি ও শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসনাবলী)। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' (অর্ধনারীশ্বর), শিব-শক্তি ও বিষ্ণুর উল্লেখ রহিয়াছে—ইহার রচয়িতা উমাপতি ধর। সেন-রাজগণের কৌলিক দেবতা শিব হইলেও পরে তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অন্যতম অলঙ্কার ছিলেন 'কেন্দুবিল্বগ্রামসম্ভব'[৪] 'পদ্মাবতীরমণ' কবি জয়দেব। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'গীতগোবিন্দ', বিষয়বস্তু রাধাবিরহ—অন্য গোপীর সহিত মিলিত কৃষ্ণের প্রতি রাধার মান এবং সখীর মধ্যস্থতায় উভয়ের পুনর্মিলন হইল এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের রাধাবিরহ-গানের সহিত গীতগোবিন্দের গানগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গীতগোবিন্দে ভাগবতের প্রধানা গোপীর পরিবর্তে রাধাকে পাওয়া যাইতেছে। লক্ষ্মণ সেন, তাঁহার পুত্রদ্বয় (বিশ্বরূপ ও কেশব সেন) এবং অমাত্যগণও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন (সদুক্তিকর্ণামৃত—১।৫৪।৫ ; ১।৫৫।২ ; ১।৬২।২)। সেন-রাজত্বকালে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি যেমন স্বীকৃত হইয়াছিল, তেমনি সম্ভবতঃ সস্ত্রীক বিষ্ণু-পূজারও আয়োজন চলিতেছিল ; কিন্তু তুর্কী-আক্রমণে উহা তখন বাস্তবায়িত না হইলেও চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

॥ ৩ ॥ সঙ্কলন গ্রন্থ, অবহট্‌ঠ কবিতাদিতে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী

কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে বিভিন্ন কবিরচিত শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়।

'সুভাষিতরত্নকোশ'-এর কয়েকটি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। শ্লোকগুলি গীতগোবিন্দ ও পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ উমাপতিধরের একটি কবিতায় চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাচিন্তার পূর্বলক্ষণ যেন দেখা যায়—'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া, রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদয়ালিঙ্গিতস্য। বিশ্বং পায়ান্ মসৃণযমুনাতীরবানীর-কুঞ্জে, রাধাকেলিভরপরিমলধ্যানমূর্ছা মুরারেঃ॥'[৫] অর্থাৎ, রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত সমুদ্র-তীরস্থ দ্বারকার মন্দিরে প্রবল-পুলকিত রুক্মিণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ যে-মুরারি যমুনা-তীরস্থ বেতসকুঞ্জে রাধার সহিত কেলির মহিমা ও মাধুর্য ধ্যান করিতে-করিতে মূর্ছিত হইয়াছিলেন, সেই মূর্ছা বিশ্বকে পালন করুক।

'অমরকোষ'-এর প্রাচীনতম বাঙ্গালী টীকাকার সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব'-(১২ শতক ; ১১৫৯-৬০ খ্রীঃ)-এর প্রারম্ভ-শ্লোকে বালগোপাল কৃষ্ণের বন্দনা আছে—'বর্হিণবর্হাপীডঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে। মেদুরমুদির-শ্যামলরুচিরব্যাদ্ এষ গোবিন্দঃ॥' অর্থাৎ, উষ্ণীষে ময়ূরপুচ্ছধারী বংশীবাদনপর মেদুরশ্যামলতনু গোষ্ঠের বালবল্লভ সেই গোবিন্দ পালন করুন।

কৃষ্ণলীলা-গান লোক-ব্যবহারে বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ১১ শতকের কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্রের একটি গান ও ১২ শতকের শেষ ভাগের কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তাহার প্রমাণ। উভয় রচনারই উপজীব্য বিষয় কৃষ্ণের ব্রজলীলা। 'দশাবতার স্তোত্র'[৬] কাব্যে উদ্ধৃত (৮-১৭৩) ক্ষেমেন্দ্রের গানে বলা হইয়াছে—'কালকলিন্দসুতাবিবলজ্জল-কালিয়কুলদমনে, কেশিকিশোরমহাসুরমারণ-দারুণ গোকুল-দুরিতবিদারণগোবর্ধনধারণে, কস্য ন নয়নযুগং রতিসজ্জে মজ্জতি...' অর্থাৎ, যিনি কালিন্দীর কৃষ্ণজলরাশি এবং কালিয়বংশদমনকারী, যিনি মহাসুর কেশিকে বিনাশ করতঃ গোকুলের দারুণ বিপদ দূর করিয়া গোবর্ধন ধরিয়াছিলেন, সেই রতি-সাজ-সজ্জিত (কৃষ্ণে) কাহার নয়নযুগল নিমগ্ন না হয়।

অবহট্‌ঠ কবিতাতেও রাম, কৃষ্ণ, হর-গৌরী প্রভৃতির বন্দনা পাওয়া যায়। গঙ্গা-দাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে উদ্ধৃত একটি অবহট্‌ঠ কবিতায় বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত বর্তমান—'রাঈ দোহডী পঢ়ণ সুণি হসিউ কণ্‌হ গোআল। বৃন্দাবণঘণকুঞ্জঘর চলিউ কমণ রসাল॥' অর্থাৎ, রাধার দোহা শুনিয়া গোপাল হাসিল এবং কেমন রসযুক্ত পদক্ষেপে বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে চলিল।

'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর (১৪ শতকের দিকে সঙ্কলিত) কয়েকটি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণ-

রাম ও শিবের উল্লেখ রহিয়াছে।—'অরে রে বাহিহি কাহ্ণু ণাব, ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি। তুহুঁ এখনই সন্তার দেই, জো চাহসি সো লেহি॥' অর্থাৎ, ওরে কৃষ্ণ, তুমি নৌকা বাহিয়া যাও। নৌকা দুলাইয়া আমাদের (গোপীদের) দুর্গতি দিয়ো না। তুমি এখনই খেয়া পার করিয়া দিয়া যাহা চাও, তাহা লও। 'জিণি কংস বিণাসিঅ/কিত্তি পআসিঅ / মুট্ঠিঅরিট্ঠী / বিণাস করে / গিরি হত্থ ধরে।···সো তুম্হ ণরাঅণ/বিপ্প পরাঅণ/চিত্তহ চিন্তঅ/দেউ বরা/ভব-ভীই-হরা॥' অর্থাৎ, যিনি কংস নিধন করিয়া কীর্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মুষ্টিক-অরিষ্ট বিনাশ করিয়াছিলেন, গিরি হস্তে ধরিয়াছিলেন, সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণ তোমার চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভবভয়হর বর দান করুন। 'মারুই মিল্লিঅ বালি বহিল্লিঅ রজ্জ সুগীবহ দিজ্জ অকণ্টঅ। বন্ধু সমুদ্দ বিণাসিঅ রাঅণ সো তুহ রাহব দিজ্জউ শিব্ ভঅ॥' অর্থাৎ, যিনি মারুতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, বালিকে বধ করিয়াছিলেন, নিষ্কণ্টক রাজ্য সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন, সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন, রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রাম তোমাকে অভয় দান করুন। 'বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ডধারী, উবাঅহীণা মুই এক্ক ণারী। অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী, গঈ ভবিত্তী কিলা হমারী॥'[৮] অর্থাৎ, ছয় মুণ্ডধারী বালক পুত্র, উপায়হীনা আমি একা রমণী, ভিখারী (হর) দিবা রাত্র বিষ খায়। আমার কি গতি হইবে।

মানসোল্লাসের একটি 'শুকসারিক'-এ (উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক গান) গোপকন্যা ও তাহার মাতার কথায় গোবিন্দের উল্লেখ রহিয়াছে — '···ছাড়ু ছাড়ু মই জাইব গোবিন্দ সহ খেলন···নারায়ণু জগহকারা গোসাঁমী।' অর্থাৎ—ছাড, ছাড় আমি গোবিন্দের সঙ্গে খেলিতে যাইব। নারায়ণ জগতের প্রভু।

॥ ৪ ॥ তুর্কী-আক্রমণ : বাঙ্গালীর ধর্মমত ও জাতীয় সংহতি

তুর্কী-আক্রমণের কালে (১২০৩ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে প্রধানতঃ চারিটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল—(ক) লোকায়ত ধর্মমত (স্থানীয় অপৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা); (খ) মহাযান বৌদ্ধধর্মমতের স্থানিক রূপ; (গ) যোগীধর্মমত (শৈব ধর্মমতের সংমিশ্রণ); (ঘ) পৌরাণিক ধর্মমত (শিব, চণ্ডী, বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা)। পূর্ব-ভারতের আর্য-সংস্কৃতির সহিত উত্তর ও মধ্য ভারতের আর্য-সংস্কৃতির পার্থক্য আছে। মৌর্য-শাসনের অবসানের পর মধ্যভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গুপ্ত-শাসন সময়ে উহা প্রায় সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। গুপ্ত-শাসন

কালেই গৌড়-বঙ্গে মধ্যদেশীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। মধ্যভারত বৈদিক ক্রিয়াকর্মে সমধিক আস্থাশীল ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, বৌদ্ধ ও জন এই দুইটি বেদবহির্ভূত ধর্ম পূর্বভারতেই উদ্ভূত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশের রাজশক্তি মধ্যদেশীয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণকে এখানে আনিয়া সংস্থিত করাকে সম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। নবাগত এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাজকার্যে অংশগ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ইহারা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মবিশ্বাস সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। রাজসভার ও সামন্তসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকাহিনী প্রভৃতি সভাকবিদিগের দ্বারা অনুশীলিত ও প্রচারিত হইতে থাকিল।

বঙ্গদেশে মধ্যদেশাগত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সংস্থিতির ফলে জনগণের মধ্যে দুইটি দুরতিক্রম্য বিভাগ দেখা দিয়াছিল—প্রাচীন অধ্যাত্মপন্থী বিভাগ এবং নবীন বৈদিক ক্রিয়াকর্মনিষ্ঠ বিভাগ। এই দুই বিভাগের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাব-ভাবনার মধ্যে যে-দুরূহ ব্যবধ্যান ছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতিকে একটি অখণ্ড জাতি রূপে পরিণত হইতে দেয় নাই। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে তুর্কী-আক্রমণ এই ব্যবধানের প্রাচীরকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তুর্কী-আক্রমণের অসংখ্য কুফলের মধ্যে ইহাই একমাত্র সুফল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

> 'মুসলমান-শক্তির মধ্যস্থতায় বাঙ্গালী জাতি নিজস্ব রূপটি লইয়া আরও সংহত হইতে চলিল। এই জমাট বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূ শ্রীচৈতন্য। ইহার চরিত্রে এবং চারিত্র্যে 'গৌড়ীয়া' অর্থাৎ বাঙ্গালী মানুষ তাহার দোষগুণ ভালো-মন্দ সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ভারতবর্ষের এক কোণে নিজস্ব স্থানটি করিয়া লইয়াছে। জাতি হিসাবে মূর্ত রূপ ধারণ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য সংঘাত যোগাইয়াছিল তুর্কী-অভিযান ও মুসলমান-শাসন, আর আভ্যন্তর শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য।'[৯]

তুর্কী-অভিযানের পর বহুদিন যাবৎ সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অ-স্থিতাবস্থা দেখা দিয়াছিল। চতুর্দশ শতকের শেষদিকে বঙ্গদেশে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ স্বাধীন সুলতান-রাজ্য স্থাপিত করিলে দেশ বহুলাংশে সংস্থিত হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহী আমলেই বঙ্গদেশে পুনরায় জ্ঞান ও সাহিত্য-

চর্চার সূত্রপাত হয়। ১২০০-১৪৫০ সালের মধ্যে রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

॥ ৫ ॥ গৌড়দরবার ও ত্রিহুতের রাজসভা

পঞ্চদশ শতকে পূর্বভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান দুইটি কেন্দ্র হইল—গৌড় সুলতানদিগের দরবার এবং ত্রিহুতের রাজসভা। গৌড় দরবারে সংস্কৃত-চর্চার প্রাধান্য ছিল, ত্রিহুত রাজসভায় সংস্কৃত ও দেশী (ত্রিহুতী) উভয় ভাষারই চর্চা ছিল। তবে, ত্রিহুতের প্রবণতা ছিল দেশীয় ভাষার প্রতি; কেবল রাজপ্রশস্তি, স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনায় সংস্কৃতের ব্যবহার হইত। গৌড় ও ত্রিহুত—এই দুই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পশ্চাতে রাজনৈতিক পটভূমিকাও লক্ষণীয়। ত্রিহুতে মুসলমান-শাসন বঙ্গদেশে তুর্কী-আক্রমণের অন্ততঃ পক্ষে ১২৫/১৫০ বৎসর পরে হইয়াছিল। এই মুসলমান-শাসন লইয়াই বঙ্গদেশের সহিত ত্রিহুতের রাজনৈতিক বিরোধ বাধিয়াছিল। যাহার ফল হইল, ফিরোজ শাহ্ তুঘ্‌লক কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রমণ এবং সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক প্রত্যাক্রমণ। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে ত্রিহুত জৌনপুরের শর্কী সুলতানদের করায়ত্ত হয়। ইহার পর ত্রিহুতে গৌড়ের সুলতানের অধিকার বিস্তৃত হয় এবং ত্রিহুত ও গৌড়ের বিরোধের অবসান ঘটে। রাজনৈতিক বিরোধের জন্য ত্রিহুত ও গৌড়ের সাংস্কৃতিক ঐক্য যাহা একদা শিথিল হইয়াছিল, তাহা পুনরায় দৃঢ় হইল।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গসংস্কৃতি পূর্বমুখী, দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের সংস্কৃতি মিলিত হয়। জৌনপুরের শেষ সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী দিল্লীর বাদশা বহলুল্ লোদী ও সিকন্দর লোদীর কাছে পরাজিত হইয়া (১৪৭৮ খ্রীঃ) গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেন। শর্কী সুলতানের সঙ্গী ছিলেন সূফী সাধক কবি কুতবন্ ('মৃগবতী কাব্য' রচয়িতা। রচনাকাল ১৫০৩ খ্রীঃ)। সূফী-সাধনাযুক্ত রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যের ধারা এইভাবে গৌড়বঙ্গে ষোড়শ শতকের প্রথমে চলিয়া আসে।

ষোড়শ শতকের চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম-আন্দোলনের প্রস্তুতি ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি পূর্ব-দক্ষিণ এবং পূর্ব-উত্তর সীমান্ত অঞ্চলগুলিও বঙ্গ-সংস্কৃতির সহিত বিজড়িত হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহী সুলতানদের পরাক্রম পূর্ব-ভারতের সর্বত্র, এমন-কি, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চদশ

শতকেই আরাকানের সঙ্গে গৌড়ের সংযোগ ঘটে। রাজ্যচ্যুত আরাকানরাজ গৌড়-সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহায়তায় সিংহাসন পুনরধিকার করেন। ফলে, আরাকান ও গৌড় দুই রাজসভার সংযোগ ঘটে। উপরন্তু এই সূত্রে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলও গৌড়ের সহিত ঘনিষ্ঠ হয়। শুধু আরাকান নহে, ত্রিপুরা ও কাছাড়ের রাজসভাতেও বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব পড়িয়াছিল। কোচবিহার-রাজসভায় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাহ বঙ্গদেশ ও কামরূপ উভয়দিক হইতেই আসিয়াছিল।

'গৌড়-দরবার হইতে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকিরণ ঘটিয়াছিল পূর্বদিকে,—চাটিগাঁ-আরাকানে বাণিজ্য ও রাষ্ট্রিক অভিযানসূত্রে, ত্রিপুরা-সিলেটে (আর চাটিগাঁয়েও) রাষ্ট্রিক অভিযান ও ধর্মপ্রচার সূত্রে, এবং কামতা-কামরূপে কেবল সাংস্কৃতিক প্রবাহ সূত্রে। এই সব অঞ্চলে রাজা-সামন্ত-শাসনকর্তারা গৌড়-দরবারের রীতি যথাসাধ্য অনুকরণ করিতেন।'[১০]

পঞ্চদশ শতকের প্রথম হইতেই মিথিলা, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় সাহিত্য-সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটে। বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহী আমলে রাজদরবারে হিন্দুকর্মচারীদিগের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। হুসেন শাহের রাজত্বকালে সেই প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাধীন সুলতানদিগের আমলে ব্রাহ্মণ-শাসিত উচ্চবর্ণের সমাজ বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের সহায়তায় জাতিভেদের প্রাচীরকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে শাসিত ও শাসক সম্প্রদায় অর্থাৎ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মানবিক স্নেহ-সম্পর্কে ফাটল ধরে নাই। রাজদরবারাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমঝোতাও ছিল। ইহার পশ্চাতে রাজদরবারে দরবেশ-ফকিরদেব প্রভাব থাকাও অসম্ভব নহে। গৌড়-বঙ্গে শর্কী সুলতানদের সহিত আগত সূফী-সাধনার ধারাটিকে বঙ্গদেশ স্বাগত জানাইয়াছিল এবং অসম্ভব নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই ধারার কিছু ছাপ থাকিতে পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ—Islamic Mysticism: Iran and India (Indo-Iranica. Oct. 1946. Vol. 1. No. 2) দ্রষ্টব্য]।

ষোড়শ-শতকের প্রথম দিকে চৈতন্যদেব যে-ভক্তিধর্ম আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার পটভূমিকায় ছিল গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের (পূর্বনাম হুসেন খাঁ সৈয়দ) হিন্দুরাজকর্মচারীদের ভাগবত-পুরাণের অনুশীলন ও বৈষ্ণবতা। বাংলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানেরা হিন্দুরাজকর্মচারীদিগের প্রভাবেই কবিপণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। গৌড়-রাজসভার অনেক হিন্দুকর্মচারীই বৈষ্ণব ছিলেন। তন্মধ্যে রূপ,

সনাতন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রূপ, সনাতনের নিবাস ছিল গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলি গ্রামে। রূপ ছিলেন হুসেন শাহের 'সখীর্ মালিক' (প্রতিরাজ) এবং সনাতন ছিলেন 'দবীর্ খাশ্' (প্রধান মুন্সী)। রামকেলি গ্রাম তখন শিষ্টসংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল। 'হরিচরিত কাব্য'-(১৪৯০ খ্রীঃ)-রচয়িতা চতুর্ভুজ রামকেলিতে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটির প্রথম শ্লোকে যদুপতি মধুসূদনের বন্দনা আছে—'যদুকুলেঽবততার য এব নঃ সততমস্তু মুদে মধুসূদনঃ।'

গৌড়-রাজসভার বৈষ্ণবতার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিল ত্রিহুতের বৈষ্ণবতা। উমাপতি ও বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রবাহ গৌড়ের বৈষ্ণব-ভাবনার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল, যাহার ফলে সাহিত্য নবচেতনার সূত্রপাত ঘটে। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে মিথিলার শেষ স্বাধীন নৃপতি হরিহর সিংহের মন্ত্রী উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ' নাটকের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা। নাটকটির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু নাটকোক্ত গানগুলির ভাষা প্রাচীন মৈথিল। বিরহদীর্ণা নায়িকার উদ্ধার-কল্পে এই নাটকের দূতী কৃষ্ণকে বলিতেছে—'মাধব অবহু করিঅ সমধানে, সুপুরুখ নিঠুর ন রহয় নিদানে।' অর্থাৎ, মাধব এখনই সমাধান কর। সুপুরুষ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর থাকে না। উমাপতির নাটকের গানগুলির ভাষা এবং পঞ্চদশ শতকের রাজসভা-কবি বিদ্যাপতির গানের ভাষা একই। পঞ্চদশ শতক হইতে এই ভাষা সমগ্র পূর্বভারতে রাজপৃষ্ঠ-পোষকতা-পুষ্ট দেশীয় শিষ্টসাহিত্যে গীতি-কবিতার আদর্শস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। এই ভাষা ব্রজবুলি, প্রাচীন মৈথিল ও অবহট্‌ঠের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক কৃত্রিম ভাষা এবং এই ভাষায় রচিত গীতি-কাবিতার রীতি পঞ্চদশ শতকে মিথিলা হইতে পূর্বভারতের রাজসভাগুলিতে (বঙ্গদেশ-আসাম-উড়িষ্যা-ত্রিপুরা) ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।[১১]

মিথিলা শিব-শক্তির দেশ, মিথিলার দেশীয় ধর্ম হইল স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম। মিথিলায় ত্রিদেবতা (শিব, শক্তি ও বিষ্ণু) পূজ্য হইলেও শিব-শক্তির তুলনায় বিষ্ণুর স্থান সঙ্কীর্ণ। 'মৈথিল বৈষ্ণব' বলিতে বিরক্ত সন্ন্যাসীকে বোঝায় এবং 'ভজন' সঙ্গীত বলিতে বিষ্ণুর দুই অবতার, রাম ও কৃষ্ণের প্রশস্তি-গাথা (রাম-বিষয়ক গাথা অবধিতে এবং কৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা ব্রজভাখাতে রচিত, শুদ্ধ মৈথিল ভাষায় নহে) বোঝায়। মধ্যযুগের মৈথিল-কাব্যে তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরের কাব্যে, বিদ্যাপতির প্রভাব মুখ্য। কল্পনার ঐশ্বর্য, ভাষার লালিত্য, অলঙ্কারের প্রাচুর্য ও নরনারীর প্রেমের বর্ণাঢ্য রূপায়ণ, এই স্তরের কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় স্তরের কাব্যে, ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের প্রভাব দেখা যায়। দীর্ঘ বর্ণনাত্মক রচনা (যেমন, মনবোধের কাব্য) এই স্তরের

বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তরের কাব্যে, বিষ্ণু-ভজনাই প্রধান। ব্রজভাখায় রচিত কাব্য সমূহ এবং সুরদাস ও তুলসীদাসের ভজন-সঙ্গীতগুলি এই স্তরের কাব্যরচনার প্রেরণা। প্রথম স্তরের কবি 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলিতে ভক্তি-ভাবনা বিরল। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ জানা থাকিলেও, এই দুই পুরাণের কোন প্রভাব বিদ্যাপতির পদগুলিতে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যাপতির দূরপ্রসারিত প্রসিদ্ধির মূল কারণ সুললিত ভাষা, সমৃদ্ধ অলঙ্কৃতি, প্রগাঢ় গীতিধর্মিতা এবং অনুপম ভাব-বৈচিত্র্য। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পরিচিতি দুই হিসাবে—প্রাচীন ধ্রুপদী কবি এবং রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদকর্তা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রাচীন কবি রূপেই দেখিয়াছেন, চৈতন্যসমাদৃতি-হেতু তিনি চৈতন্যসমকালীন ও তদুত্তরকালীন কবিদের নিকট বৈষ্ণব না হইয়াও 'মহাজন' রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। চৈতন্যদেব ও বিদ্যাপতির মাধ্যমেই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মানসিকতার সহিত মিথিলার সংযোগ ঘটিয়াছিল। আসামে বিদ্যাপতির প্রভাব পড়িয়াছিল শঙ্করদেবের মধ্যস্থতায়। তাঁহারই প্রব্রজ্যায় কামরূপ ও মিথিলা সংযুক্ত হইয়াছিল। তবে, বৈষ্ণব শঙ্করদেবের 'বড়গীত' ও 'অঙ্কীয়া নাঠ'গুলিতে বিদ্যাপতির যে-প্রভাব দেখা যায়, তাহা ভাবের দিক দিয়া নহে, ভাষার প্রসাদগুণে। নেপালেও বিদ্যাপতির প্রভাব তাঁহার অতুলনীয় ভাষার জন্য। নেপালে রচিত নাটকগুলিতে ধীরে-ধীরে মৈথিলী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল।[১২]

ভাগবত-পুরাণ ঃ অধ্যাত্মের দিক দিয়া বঙ্গদেশকে ত্রিহুতের দান ভাগবত-পুরাণ। পঞ্চদশ শতকের পূর্বে গৌড়-দরবারে ভাগবত-পুরাণের কোন কথা শোনা যায় নাই। পরবর্তীকালের ভক্তিধর্ম-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ভাগবত-পুরাণকে পঞ্চদশ শতকেই প্রথম পাওয়া গেল, অথচ, ত্রিহুতে ইহা ইতিপূর্বেই পৌঁছিয়াছিল।

> 'পঞ্চদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালা দেশে ভাগবত-পুরাণ জানা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সর্বানন্দ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং তিনি টীকাসর্বস্বে বহু পুরাণ-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে হরিবংশ আছে, বিষ্ণু-পুরাণ আছে, কিন্তু ভাগবত-পুরাণ নাই। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের এই পরম গ্রন্থখানি তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দের মহিন্তাপনীয় বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট (ইনিও বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন) অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন 'পদচন্দ্রিকা' নামে। তাহাতে আরও বেশি

গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি আছে কিন্তু ভাগবতের নাই। সুতরাং এ অনুমান অপরিহার্য হইতেছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমার্ধেও বাঙ্গালা দেশে ভাগবত-পুরাণ অজ্ঞাত ছিল। অথচ দেখিতেছি যে, গৌড়-সুলতান সংবর্ধিত মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন এবং গৌড়ে রামকেলি গ্রামে সুলতান হোসেন শাহার মহামন্ত্রী সনাতন পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকে ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তীরহুতে ভাগবত পৌছিয়াছিল। ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবতে (১৪৬৮) বিদ্যাপতির হাতে নকল-করা ভাগবত পুরাণের পুথি পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদে বাঙ্গালায় এবং তীরহুতে ভাগবত-পুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত।'[২৩]

উপরি-উক্ত অনুমান সম্পর্কে নিঃসংশয়িত হওয়া যায় না। কারণ, দ্বাদশ শতকের জয়দেবের কাব্যে এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ভাগবতের ছায়া অলক্ষিত নহে।

বড়ু চণ্ডীদাস: কৃষ্ণলীলা-গানের তিন প্রবীণ রসিক—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস। জয়দেব ও বিদ্যাপতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা গিয়াছে। ভাগবতের সঙ্গে এই তিন কবিরই পরিচয় ছিল, যদিও জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং বিদ্যাপতির পদাবলীতে ভাগবত-কাহিনীর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ বিশেষ দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর সহিতও ভাগবতের সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। এই গ্রন্থের কোন-কোন কাহিনী বরং বিষ্ণুপুরাণের অনুসারী, আবার অধিকাংশ কাহিনী (দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি) লৌকিক ঐতিহ্য-অনুসারী। প্রাচীনকাল হইতে কৃষ্ণ-কাহিনীর মধ্যে তিনটি রসের সন্ধান পাওয়া যায়—(ক) ঐশ্বর্য-রস (পুতনা-বধ, গোবর্ধন-ধারণ ইত্যাদি। এইগুলি গুপ্তযুগের পূর্ব হইতেই স্থাপত্য শিল্পের বিষয়ীভূত); (খ) আদি বা শৃঙ্গার-রস (প্রাচীনকালের কৃষ্ণ-কাহিনীতে এই রস নাই। পরবর্তী-কালে রাস, দান, নৌকা প্রভৃতি লীলায় শৃঙ্গার রসের পরিচয় পাওয়া যায়); (গ) বাৎসল্য-রস (বাঙ্গালী ভক্ত পদকর্তারা তাঁহাদের রচনায় এই রস ব্যবহার করিয়াছেন)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন-কোন আখ্যান নাই যাহা ষোড়শ শতক ও তৎ-পরবর্তী কালে বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে কোন-না-কোন ভাবে অনুসৃত হয় নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ আছে ('জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥'—আদিখণ্ড); কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় ('বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥' ৩।১৭)। রূপগোস্বামীর 'ললিতমাধব' নাটকে কৃষ্ণের হার চুরির, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'পদ্যাবলী'-তে বাঁশী চুরির উল্লেখ আছে (২।৪৯); 'দানকেলিকৌমুদী'-তে দানখণ্ডের সারূপ্য দেখা যায়। সনাতন গোস্বামী-কৃত ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্ধের টীকা 'দশম টিপ্পনী'-তে (১৪৭৬ শক=১৫৫৪ খ্রীঃ) এবং জীবগোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী'-তে (১৫০৪ শক=১৫৮২ খ্রীঃ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুস্মৃতি লক্ষণীয়। 'বৈষ্ণবতোষণী'-তে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের উল্লেখ আছে —'শ্রীজয়দেবচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিলীলা-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড, নৌকখণ্ড, বংশীখণ্ডের কোন পৌরাণিক মূল নাই। এইগুলি লোকগীত-পালায় (কৃষ্ণলীলার গ্রাম্য-আখ্যানে) প্রচলিত। এই লৌকিক ঐতিহ্যই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কৃষ্ণমঙ্গল-কাহিনীর মূল উৎস, যাহা বাংলা 'হরিবংশ'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ'-এ (১০।৮১) বংশী ও হার চৌর্যের উল্লেখ আছে।[১৪] একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই, তবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা-যে চৈতন্যপূর্বকালীন কবি, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।[১৫]

জয়দেবের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুনরায় রাধাকে পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা 'চন্দ্রাবলী রাহী' কিন্তু এই চন্দ্রাবলী রাহীকে কি ভাগবতোক্ত প্রধানা গোপী বলা যায়? কৃষ্ণ রাধাকে কামনা করে, অন্য গোপীকে নহে — ইহাও তো ভাগবত-সমর্থিত ('যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ')। ভাগবতের এই বিশিষ্টা গোপী রাধা-নামিত নহে বটে, তবে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ভাবনায় এই অনামিকা গোপীই সম্ভবতঃ রাধা নামে গৌরবিত। পুনশ্চ, ভাগবতে এই প্রেয়সী গোপীর সহিত কৃষ্ণের একান্ত ক্রীড়ার কোন উল্লেখ নাই। জয়দেবের কৃষ্ণকাহিনীও ভাগবতানুসারী নহে। তবে উভয় গ্রন্থেই (গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) রাধার স্থান বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণ-কথা আছে, পরকীয়া প্রেমও আছে; কিন্তু এই পরকীয়া প্রেম চৈতন্য-প্রবর্তিত পরকীয়া প্রেম নহে, ইহা স্থূল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের দেবতা বিষ্ণু, লক্ষ্য মুক্তি। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের দেবতা কৃষ্ণ, লক্ষ্য ভক্তি।

মালাধর বসু ঃ ভাগবত-পুরাণকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চদশ শতকে কৃষ্ণভক্তির নূতন প্রবাহের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই প্রবাহের উৎসমূলে রহিয়াছেন পরমভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী। ইহার পূর্বাশ্রম কিংবা জীবৎকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। ইনি বাঙালী কিংবা দক্ষিণ দেশীয় ছিলেন, তাহাও বলা কঠিন। পঞ্চদশ শতকের

শেষার্ধে ইহার নিকট নবদ্বীপের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর মাধবেন্দ্রের কথা বলিয়াছেন। দক্ষিণদেশের পণ্ঢরপুরের শ্রীরঙ্গপুরী মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৯)। মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়তম শিষ্য দশাক্ষরী গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু (চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৭)। পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত মাধবেন্দ্র পুরী-রচিত শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইলেও স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন— 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥' অর্থাৎ, হে দীন দয়াল প্রভু, হে মথুরানাথ তোমায় কবে দেখিব ? প্রিয় তোমার অদর্শন-কাতর হৃদয় মথিত হইতেছে। আমি কি করিব। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী (৩৩৪) হইতে সংগৃহীত এই শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তদীয় চৈতন্যচরিতামৃতে (২।৪) উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুলীন-গ্রামী (আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত) মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ'-র 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর (নামান্তর 'গোবিন্দবিজয় বা 'গোবিন্দমঙ্গল', রচনাকাল ১৩৯৫-১৪০২ শক=১৪৭৩-৮০ খ্রীঃ) উল্লেখ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আছে। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই শ্লোকটি মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববর্তী বঙ্গভাষায় লিখিত রচনা হইতে উদ্ধৃতিগ্রহণ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। মালাধর বসু মূলতঃ ভাগবতানুযায়ী (দশম-একাদশ) কৃষ্ণলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের ঘনিষ্ঠ-অনুসরণ নহে ('ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি। তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি॥')। কাব্যটির মধ্যে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের ছায়াও বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মূল রস বাৎসল্য (মধুর নহে), সেই হেতু, কাব্যটির কালীয়দমনকাহিনীতে নন্দ, যশোদা ও গোপবালকবৃন্দকে দেখা যায়, অথচ, গোপীরা অনুপস্থিত (ভাগবতে গোপীদেরও উপস্থিতির কথা রহিয়াছে)। কবি তাঁহার গ্রন্থে সরল ভাষায় ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার সার কথা বলিয়াছেন — 'সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ। আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ॥ নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তারে জানে। তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে॥' 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এ সংক্ষেপে রামকথা আছে। কৃত্তিবাসের কথা বাদ দিলে বঙ্গসাহিত্যে প্রথম রামকথা পাওয়া যায় মালাধর বসুর রচনায়। বিশ্রুত কবি কৃত্তিবাসের জীবৎকাল ও রামায়ণ রচনাকাল সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে এবং সঠিক কাল-নিরূপণও সম্ভব নহে।

যদি কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের কবি বলিয়া ধরা যায় তবে, সমকালীন কবি হিসাবে অসমীয়া কবি মাধবকন্দলীর শ্রীরাম পাঞ্চালীর নাম করিতে হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এর দ্ব্যর্থতা হেতু ইহাকে রামকাহিনীর সমপর্যায়-ভুক্ত করা যায় না। চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব-দীক্ষা-মন্ত্র ছিল দ্বিবিধ—কৃষ্ণমন্ত্র ও রামমন্ত্র। রামমন্ত্রের দীক্ষা উত্তরপূর্ব-বঙ্গে ও আসামে প্রচলিত ছিল। শঙ্করদেব কৃষ্ণোপাসনার প্রতিষ্ঠা করিলেও রাম-মাহাত্ম্যের লাঘব করেন নাই। চৈতন্য-সহচর মুরারি গুপ্ত দীক্ষিত রামোপাসক ছিলেন। এই রামনিষ্ঠা সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পূর্ববাসভূমি শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আনিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহার রামনিষ্ঠা জানিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দেন নাই। 'রাম-রাঘব' এবং 'কৃষ্ণ-কেশব', এই দুইয়ের অভিন্নতা চৈতন্যদেব স্বীকার করিতেন—'কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥' সেন-রাজাদের সময়ে মন্দিরচিত্রে রামকথা পাওয়া যায় কিন্তু রামসীতার মূর্তি-পূজা সেন-রাজাদের আমলে অজ্ঞাত ছিল। রামমূর্তির পূজা সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রামায়েৎ সাধুসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এই রামায়েৎ সম্প্রদায়ের পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনতম কেন্দ্র হইল, চন্দ্রকোণা।

রামায়ণ-মহাভারতঃ রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই প্রাচীন মহাকাব্য ভারতীয় সাহিত্যের দুই পাদস্তম্ভ। বিভিন্ন রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় এই দুই মহাকাব্যের ভাষানুবাদ হইয়াছে। বঙ্গভাষায় প্রথম মহাভারত-কাহিনীকার কবীন্দ্র পরমেশ্বর। চটগ্রামের শাসনকর্তা হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁয়ের নির্দেশে পরমেশ্বর তাঁহার কাব্য রচনা করেন। সম্ভবতঃ ত্রিপুরা, কাছাড রাজসভা হইতে মহাভারত-রচনার প্রেরণা আসিয়াছিল। কামরূপ-আসাম অঞ্চলেরও পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন মাধবকন্দলীর 'শ্রীরাম পাঞ্চালী'।

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অভিন্নতা চৈতন্যদেব স্বীকার করিতেন; কিন্তু চৈতন্য-ধারণায় এই কৃষ্ণ কে? মহাভারতেও যদুপতি কৃষ্ণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, তথাপি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের কৃষ্ণভাবনায় মহাভারতের কৃষ্ণকে স্বীকার করেন নাই। গৌড়ীয় ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের নন্দসূনু কিশোর-কৃষ্ণ। এই কিশোর-কৃষ্ণই গোপালকৃষ্ণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে ইনি নিত্যবৃন্দাবন-বিহারী।

স্বয়ং চৈতন্যদেব রূপগোস্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (৩।১); 'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥' —লঘুভাগবতামৃত (পূর্বখণ্ড), অর্থাৎ যদুবংশীয় কৃষ্ণ এক এবং নন্দনন্দন কৃষ্ণ অন্য, যিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

॥ ৬ ॥ চৈতন্যদেব ও বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম

ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে যে-সমুন্নত পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ)। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক স্থিরতা আসিয়াছিল। তৎকালীন আম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত নবদ্বীপ অঞ্চল (কালনা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর) জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বজ্জনদিগের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। নদীপথে একদিকে পূর্ববঙ্গ, অপর দিকে গৌড়ের সহিত নবদ্বীপের সংযোগ ছিল এবং ইহার খ্যাতিও সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ছিল।

বঙ্গীয় (গৌড়ীয়) বৈষ্ণবধর্মের পথিকৃৎ চৈতন্যদেবের পিতা পুরন্দর-উপাধিক জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ ছিলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার পিতৃভূমি ছিল শ্রীহট্টের জয়পুর অথবা জাজপুর গ্রাম। 'শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।··· পূর্বে সরস্বতী উত্তরে গোমতী। পশ্চিমে ঢোল সমুদ্র দক্ষিণে করাতি॥··· শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।··· নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে। সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে॥··· দিব্যদোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি। গঙ্গা নবদ্বীপ দেখে প্রেমানন্দে ভাসি॥'; 'চৈতন্য গোসঞির পূর্বপুরুষ আছিল জাজপুরে। শ্রীহট্ট দেশেরে পালাইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥' জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (যথাক্রমে, নদীয়াখণ্ড ১।২; উৎকল খণ্ড ১)। জয়ানন্দের রচনা হইতে মনে হয় জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার জাজপুরবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক কারণে তাঁহারা শ্রীহট্টের জয়পুরে চলিয়া যান।[১৬] পুনরায়, প্রাকৃতিক এবং রাষ্ট্র বিপর্যয় হেতু জগন্নাথ মিশ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত: চৈতন্যদেবের জীবৎকাল ১৪০৭ শক-১৪৫৫ শক ('চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান॥' —চৈতন্যচরিতামৃত ১।১৩) অর্থাৎ, ১৪৮৫।৮৬ হইতে ১৫৩৩।৩৪ খ্রীঃ। এই আটচল্লিশ বৎসর জীবৎকালকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—২০ (গৃহস্থাশ্রম),..

+ ৬ (ভ্রমণ) + ১৮ (নীলাচলবাস)। চৈতন্যদেবের সময় বঙ্গদেশে দুইটি প্রধান সমস্যা ছিল—গৌড় রাজদরবার-প্রভাবিত বিজাতীয় (ঐস্লামিক) চাল-চলনের প্রসার এবং ইহার নিরোধের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সমাজের ক্রমবর্ধমান সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতি একটি নূতন পথের দিশা পাইয়াছিল। এই পথ হইল—ঈশ্বরে অকাম, অহেতুক প্রীতি। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের মর্মকথা হইল নিষ্কিঞ্চনতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, ভগবন্নামনিষ্ঠা, জীবনযাত্রার সারল্য এবং সর্বজীবে সম্মানদান। এই সহজ কথাগুলি চৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন (চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।২০)। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত সঙ্কীর্তন-যজ্ঞের ফলে সমকালীন ও উত্তরকালীন বৈষ্ণবপদাবলীতে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হইয়াছিল। এই সঙ্কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি বঙ্গসাহিত্যকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। রাধাবিরহ-কল্পনা শ্রীচৈতন্যের ভাব-রূপের আধারেই সঞ্জাত।

চৈতন্যদেবের জীবৎকালের পরিসর স্বল্প হইলেও বঙ্গসাহিত্যে, বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মে ও জন-জীবনে তাঁহার প্রভাব অপরিসীম। ষোড়শ শতকের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যখন বাঙ্গালী জাতির শ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সেই চরম অশুভ মুহূর্তে এই দেবকল্প মহাপুরুষটির আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতি মুক্তির আস্বাদ লাভ করিল। এই মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি নহে, আত্মিক মুক্তি। বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মহামানবের অলৌকিক চরিত্র লইয়া প্রথম জীবনীকাব্যের সূত্রপাত। বৈষ্ণবধর্মের নববিধানও (Neo-Vaishnavism) চৈতন্যদেবের অপর অবদান। 'দ্রাঘিমোদ্দামবাহু দীর্ঘোজ্জ্বলতনু' চৈতন্যদেব তাঁহার জীবিত-অবস্থাতেই পূর্বভারতের এক বৃহৎ ভূখণ্ডে ঈশ্বরের অবতার কিংবা স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন।[১৭] অদ্বৈত আচার্যই[১৮] তাঁহাকে নীলাচলে প্রকাশ্যে ঈশ্বর বলিয়া প্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন—'আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি। সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥' —চৈতন্যভাগবত (৩।১০)।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে তাঁহার শক্তিশালী ভক্তবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গজপতি প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, রাজমহেন্দ্রীর (বর্তমান, রাজামাণ্ডী) শাসক রামানন্দ রায় (পট্টনায়ক) প্রভৃতি। পুরী হইতে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন (১৪৩২ শক= ১৫১০ খ্রীঃ)। এই ভ্রমণের সময়ে রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও শ্রীরঙ্গমে পরমানন্দ পুরীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। রায় ও পুরী উভয়েই পরে উড়িষ্যাতে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ফলে

চৈতন্যদেবের দুইটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লাভ হইয়াছিল—'ব্রহ্মসংহিতা' এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'। দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্যদেবের গৌড়ের মধ্য দিয়া বৃন্দাবন-গমনের প্রথম প্রচেষ্টা (১৪৩৫ শক=১৫১৩ খ্রীঃ) অসফল হয়। দ্বিতীয়বার (১৪৩৬ শক=১৫১৪ খ্রীঃ) ঝারিখণ্ড দিয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে তখন মাধবেন্দ্র পুরী-প্রতিষ্ঠিত গিরিগোবর্ধনের উপরিস্থিত মন্দিরের গোপালদেবের বিগ্রহ ভিন্ন তীর্থস্থলী বলিতে কিছু ছিল না। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া রাধাকুণ্ডাদি কয়েকটি লুপ্ত লীলাস্থল নির্ণয় করেন। তাঁহারই নির্দেশে পরে রূপ ও সনাতন লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার করেন এবং মদনগোপাল, গোপাল ও গোবিন্দ এই তিন প্রধান বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে দেববিগ্রহের পার্শ্বে রাধার মূর্তি ছিল না। মথুরাতেও বল্লভাচার্য এবং তাঁহার সম্প্রদায় যে-দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও রাধামূর্তি সংযুক্ত ছিল না। রূপ গোস্বামীর রসশাস্ত্র-অনুসারে এবং জীব গোস্বামীর নির্দেশে রাধামূর্তি প্রথম স্থাপিত হয়। জীব গোস্বামীর স্বীকৃতিতেই ব্রজভূমে এবং বঙ্গদেশে রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

'কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চিন্তাকে নূতন দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এই কাজের সূত্রপাত করিয়াছিলেন রামানন্দ রায় ও স্বরূপ-দামোদর। রঘুনাথ দাসের কাছ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণের মূর্তিব বামে রাধামূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং যুগলমূর্তির উপাসনা জীব গোস্বামীর স্বীকৃতি পাইয়াই প্রথমে বৃন্দাবনে ও পরে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। যুগলমূর্তির স্বীকৃতি হইতেই বল্লভ ভট্টের সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শেষ বিচ্ছেদ হইয়া গেল। জীব গোস্বামীর সময় হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।'[১৯]

চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ : চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ কিংবা রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ এই সম্পর্কে চৈতন্যচরিতকার বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবত, ১।২) চৈতন্যদেবকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে কলিযুগে কৃষ্ণের চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ হিসাবে গীতা ও ভাগবত হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন—'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—গীতা (৪।৭ ; ৮), অপিচ, 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥' —ভাগবত (১১।৫।৩২)।

চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবকে কোথাও রাধকৃষ্ণের মিলিতরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, যদিচ, অন্ত্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ-সম্পর্কে সার্বভৌমের প্রতি চৈতন্যদেবের উক্তিটি ('কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হইলু') বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। স্বয়ং কৃষ্ণের আবার কৃষ্ণবিরহ হইবে কেন? রামানন্দ ও স্বরূপের দ্বারাই চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিতবিগ্রহ রূপে প্রচারিত হইয়াছিলেন—'পহিলে দেখিলু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (৩।৮)। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চাতে বলিয়াছেন,—'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥' — চৈতন্যচরিতামৃত (১।১)। অবশ্য এই ধারণারও সূত্রপাত করিয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্য। প্রথম বৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুকে আচার্যদেবের প্রণাম মন্ত্রটি স্মরণীয়—'রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যোঽসি সোঽসি নমস্তুভ্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥' —চৈতন্য-চরিতামৃত (২।১৫), অপিচ, 'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর। দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥'—চৈতন্যভাগবত (৩।১০)।

নবদ্বীপে ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণবভাবনা এবং সাধনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই। তবে, নবদ্বীপের গোস্বামীদের নিকট গৌরাঙ্গদেব উপেয় কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি উপায়। উভয় গোষ্ঠীর উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, মাধ্যম ভক্তি, উদ্দেশ্য কৃষ্ণোপাসনা। রূপ এবং সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিলেও চৈতন্যাদেশে বৈষ্ণব-শাস্ত্র-প্রণয়ন কালে তাঁহারা কৃষ্ণলীলাস্মরণ ও কৃষ্ণোপাসনারই বিধান দিয়াছিলেন। অর্থাৎ, কৃষ্ণ-ঐতিহ্যের (Krishna-cult) পরিবর্তে চৈতন্য-ঐতিহ্যের (Chaitanya-cult) প্রবর্তন করেন নাই। চৈতন্যদেবের নীলাচলে থাকাকালীন বঙ্গদেশে চৈতন্যভক্ত-দিগের নেতা হইয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্য—'আচার্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান। আচণ্ডাল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥' — চৈতন্যচরিতামৃত (২।১৫)।

চৈতন্যচরিত-কাব্য ঃ চৈতন্যদেবের কর্মবহুল বিচিত্র জীবনকথাই বঙ্গভাষায় জীবনী-সাহিত্য রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই জীবন-চরিত গ্রন্থগুলি হইতে

চৈতন্যদেব, তাঁহার পরিকরবৃন্দ ও তাঁহার পরিমণ্ডল সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

মুরারি গুপ্ত : চৈতন্যদেবের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন মুরারি গুপ্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (১।১৩)। এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, আদিলীলার কড়চাকর্তা মুরারি গুপ্ত এবং মধ্য ও অন্ত্য লীলার কড়চাকার স্বরূপ-দামোদর। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি ব্যতীত মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ-দামোদরের কড়চার প্রামাণ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায় না। ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতে[২০] 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' নামে মুদ্রিত সুবৃহৎ একটি গ্রন্থকে মুরারিগুপ্তের কড়চা বলা হয়। এই গ্রন্থ মৃণালকান্তি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত (৪র্থ সং। চৈতন্যাব্দ ৪৫৯)। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদক হরিদাস দাস 'অবতরণিকা'-তে বলিয়াছেন যে, গ্রন্থটির রচনাকাল চৈতন্য-তিরোধানের পর (১৫৫৬-৬০ খ্রীঃ)। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। 'কড়চা' শব্দটির মূল অর্থ হইল সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (original draft)। চৈতন্য-সতীর্থ মুরারি গুপ্ত কখনই চৈতন্য-তিরোধানের পর ঈদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। তদ্ব্যতীত, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'—এর সহিত প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রায় আদ্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, লোচনের গ্রন্থ রচনার পূর্বেই মুরারি গুপ্তের কড়চাটি স্ফীতকায় হইয়াছিল। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থটি চৈতন্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনে সমাপ্ত, অবশিষ্টাংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত। লোচন-দাসের প্রাচীন পুঁথি সুলভ কিন্তু মুরারি গুপ্তের কড়চার পুঁথি ১৩০৩ সালের পূর্বে পাওয়া যায় না এবং ১৩০৩ সালের পুঁথিরও কোন প্রাচীন আদর্শ নাই। সুতরাং, কেবল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়াই সমগ্র মুদ্রিত গ্রন্থটিকে মুরারিগুপ্তের কড়চা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

জনৈক বঙ্গদেশীয় বিপ্র : জনৈক 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' বিরচিত চৈতন্যদেব সম্পর্কিত একটি নাটকের নান্দীশ্লোক ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। নান্দীশ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃতে (৩।৫) উদ্ধৃত রহিয়াছে— 'বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে, কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ। প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ, স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥'

কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন : শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর উপাধিক

পরমানন্দ সেন চৈতন্যচরিত এবং তৎপরিকরবৃন্দ-সম্পর্কিত তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন —চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক মহাকাব্য 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'। কবিকর্ণপূরের অন্যান্য রচনা—'আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ', 'অলঙ্কার কৌস্তুভ' এবং 'আর্যাশতক' (খণ্ড-কবিতা)। চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের রচনা-সমাপ্তিকাল ১৪৬৪ শক ('বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে শাকে') = ১৫৪২ খ্রীঃ। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-র রচনাকাল পুষ্পিকার নানা পাঠান্তর অনুসারে যথাক্রমে ১৪৬৯ শক ('শাকে রসগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে')=১৫৪৭ খ্রীঃ; ১৪৭৬ শক ('শাকে রসারসমিতে মনুনৈব যুক্তে') = ১৫৫৪ খ্রীঃ; ১৪৮৯ শক ('শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে') = ১৫৬৭ খ্রীঃ। এই গ্রন্থে 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক গজপতি প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে রচিত হয়। কোন-কোন পুঁথির পুষ্পিকা শ্লোক অনুসারে নাটকটির রচনাকাল ১৪৯৪ শক ('শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজি যুক্তে, তস্মিশ্চতুর্নবতি ভাজি')=১৫৭২ খ্রীঃ। কিন্তু এই পুষ্পিকা শ্লোকটির অকৃত্রিমতা সংশয়িত। কারণ, প্রথমতঃ পুষ্পিকা শ্লোকটিতেই গ্রন্থকার আপনাকে অনুক্ত রাখিয়াছেন ('গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ'), যাহা স্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়তঃ, 'গৌরগণোদ্দেশাদীপিকা'-র রচনাকাল অন্যূন ১৪৬৯ শক=১৫৪৭ খ্রীঃ ধরিলে এবং তাহাতে চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের উল্লেখ থাকায় নাটকটির রচনাকাল ১৫৭২ খ্রীঃ হইতে পারে না। অন্যদিকে হইতে বলা যায়, প্রতাপ রুদ্রের জীবৎকালেই (১৫৪০ খ্রীঃ পূর্বে) গ্রন্থরচনারম্ভ হইয়াছিল, পরমানন্দ তখন অপরিণত বয়স্ক (জন্মকাল আনুমানিক ১৫১৬-২০ খ্রীঃ) এবং চৈতন্যদেবের তিরোভাব ১৫৩৩ খ্রীঃ হইয়াছে। এই দিক দিয়াও ১৪৯৪ শককে নাটকটির রচনাকাল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বরং বলা যায়, নাটকটির রচনাকাল ১৫৪০ খ্রীঃ পরে নহে। পরমানন্দ সেনের নামাঙ্কিত বঙ্গভাষায় রচিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

প্রবোধানন্দ সরস্বতীঃ ইনি গোপালাভট্টের গুরু ছিলেন। ইহা ব্যতীত ইহার কোন পরিচয় জানা যায় না। ইনি ১৪৩ শ্লোকে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' (চৈতন্যতত্ত্বামৃতম্ ?) নামক চৈতন্যস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাসঃ বঙ্গভাষায় প্রথম চৈতন্যচরিত রচনা করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' 'শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী'-নন্দন বৃন্দাবনদাস। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' (চৈতন্যভাগবত), রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪১-৪২ খ্রীঃ, অর্থাৎ, চৈতন্য-তিরোধানের অত্যল্পকাল পরেই। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,

গদাধরের জীবৎকালেই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বৃন্দাবনদাস ভাগবতের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের নিকট ['নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত, জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত' (১।৮)] এবং স্বীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং গৌরভক্তজনদিগের নিকট হইতে ['নিত্যানন্দপ্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব' (২।২০); 'তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে' (১।১)]। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শেষলীলা এবং রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাস, স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপুরীর কোন বিশদ বিবরণ নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যভাগবতে কবিকর্ণপূরের নামোল্লেখ নাই।[২১]

'পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে আদ্যন্ত উদ্দীপ্ত ইংরেজীতে যাহাকে বলে Inspired রচনা বলিতে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা 'চৈতন্য ভাগবত'।[২২] ভক্ত-কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যচরিত্রের যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেই বর্ণনা যেমন সহজ তেমনি তথ্যনিষ্ঠ। ১৫।১৬ শতকে হুসেন শাহের রাজত্বকালের পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক অর্থাৎ অ-রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদানও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে স্বাভাবিক ভাবেই নিত্যানন্দ-বিমুখতার প্রতি উষ্মা বর্তমান। নিত্যানন্দের জাতিবিচার-হীনতাদির জন্য সমকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। অদ্বৈতাচার্যকে অবতাররূপে প্রচারেও বৃন্দাবন দাসের প্রতিবাদ ছিল ['এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া। বোলায় অদ্বৈতভক্ত চৈতন্য নিন্দিয়া॥' (৩।১০)]। গৌর-নাগর ভাবের প্রতিও তাঁহার আদৌ সমর্থন ছিল না ['স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বোলে॥ যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥' — (১।১০)]।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ: বঙ্গভাষায় রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির তথ্যনিষ্ঠা ও প্রামাণিকতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত দুইটি গ্রন্থ হইল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (চৈতন্যভাগবত) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। দুইখানি গ্রন্থ পরস্পরের সম্পূরক বলা যায়, কারণ, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্যজীবনের প্রথম ২৪ বৎসরের ঘটনাই মুখ্য এবং কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে তাঁহার শেষ ২৪ বৎসরের ঘটনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত 'মহৎ-বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতাদের জন্য লেখা'। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ও বৈষ্ণবতত্ত্বের পূর্ণ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই 'কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত'-এ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকতা, রসজ্ঞতা ও দার্শনিকতত্ত্ব-বিচার এই মহাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যের ভারতভ্রমণের বর্ণনা কৃষ্ণদাস

কবিরাজের গবেষণার ফল। মুরারিগুপ্ত এবং স্বরূপ-দামোদর 'এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিঞা' কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের পরিব্রজ্যার কথা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে সনাতন ও রূপের ভক্তিরসতত্ত্ব এবং স্বরূপ-দামোদর ও রঘুনাথের পররসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান কাটোয়ার কিছু উত্তরে প্রাচীন নৈহাটি গ্রামের নিকট ঝামটপুর। জীবৎকাল ১৪১৮-১৫০৪ শক=১৪৯৬-১৫৮২ খ্রীঃ। বংশ-পরিচয়—পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস, জাতি বৈদ্য, উপাধি কবিরাজ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-র ভূমিকায় (১৩১০ সাল) সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র কৃষ্ণদাস-সম্পর্কিত এই তথ্যগুলি দিয়াছেন, তবে তিনি কোন সূত্র উল্লেখ করেন নাই। 'গোবিন্দলীলামৃত'-এর সাক্ষ্যে (সর্গান্তিক শ্লোক—'শ্রীরূপ সেবাফলে') বলা যায়, কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর পরিচর্যা করিতেন ('রূপ গোসাঞির ভৃত্য')। রূপ গোস্বামীর পর তিনি রঘুনাথ দাসের তত্ত্বাবধান করিতেন ('সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার')। কৃষ্ণদাস স্বীয় গুরুর স্পষ্ট নামোল্লেখ করেন নাই ('আমার গুরু চৈতন্যের দাস')। ষড়্‌গোস্বামীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া রূপ ও রঘুনাথের নামোল্লেখ করিয়াছেন ('শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ') এবং ষড়্‌গোস্বামী-কে তাঁহার শিক্ষাগুরু ('এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু যে আমার') বলিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনাবলী—(ক) বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এর টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা' (সংস্কৃতে)। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত; (খ) 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্য (সংস্কৃতে)। গ্রন্থটি বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ (চৈতন্যাব্দ ৪৬৩) হইতে প্রকাশিত। ২৩ সর্গে বিভক্ত এই গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'-র অনুসরণে রচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তদীয় গ্রন্থে রাগমার্গী সাধকদিগের উদ্দেশ্যে গোলোকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন—'শ্রীরূপদর্শিত-দিশা লিখিতাষ্টকাল্যা শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততির্ময়েয়ম্। সেবাস্য যোগ্যবপুষানিশ-মত্র চাস্যা। রাগাধ্বসাধকজনৈর্মনসা বিধেয়া।'—(২৩।৯৪); (গ) 'চৈতন্যচরিতমৃত' (বাংলায়)। এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া মতবিরোধ আছে। সাধারণভাবে জ্ঞাত পুষ্পিকা শ্লোকটি ('শাকেঽবিন্দুবাণেন্দৌ'=১৫০৩ শক / 'শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ'= ১৫৩৭ শক) সম্প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথিটিতে (লিখিত ১০২৩ সাল=১৬১৩ খ্রীঃ। পাটনার গৌরাঙ্গমঠে রক্ষিত) নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে জীবগোস্বামীর 'গোপাল-চম্পূ'-র (রচনাসমাপ্তিকাল আনুমানিক ১৫৯২ খ্রীঃ) নামোল্লেখ আছে (২।১ ; ৩।৪), তবে, এই গ্রন্থের কোন উদ্ধৃতি নাই। 'গোপালচম্পূ' কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দ-

লীলামৃত'-এর পরে রচিত। চরিতামৃতে গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকোদ্ধৃতি থাকায় বলা যায়, 'চৈতন্যচরিতামৃত' গোবিন্দলীলামৃতের পরবর্তী রচনা। চরিতামৃতে 'ভগবৎসন্দর্ভ'-হইতেই উদ্ধৃতি সর্বাধিক এবং 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' হইতে কিঞ্চিৎ। জীব-গোস্বামীর অপর কোন গ্রন্থের উল্লেখ কৃষ্ণদাস করেন নাই। সুতরাং, অনুমিত হয় চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল ১৫৭০-৮০ মধ্যে—এই সময়ে রূপগোস্বামী তিরোহিত, রঘুনাথ দাস জীবিত। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রণ ১৮২৭ খ্রীঃ (চন্দ্রিকা প্রেস। প্রকাশক বেণীমাধব দত্ত)।

লোচন (=লোচনানন্দ) দাস ঃ শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস সরকারের শিষ্য লোচনানন্দ মুরারিগুপ্তের (কড়চার) অনুসরণে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ('শ্লোক বন্ধে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গচরিত। দামোদরসংবাদ মুরারি-মুখোদিত ॥') লোচনানন্দের কাব্যে চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কিত (জগন্নাথবিগ্রহে চৈতন্যদেবের বিলীন হওয়া) এবং অপরাপর কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে। তবে জীবনীগ্রন্থ হিসাবে লোচনের রচনা জনপ্রিয় হইলেও মূল্যবান নহে।

নরহরি দাস সরকার ঃ চৈতন্যের জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহাকে উপাস্য দেবতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস সরকার তাঁহাদের অন্যতম। নরহরি 'গৌরাঙ্গাষ্টকালিকা' নামে গৌরাঙ্গপূজা-বিষয়ক একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' গ্রন্থটিতে (শ্রীখণ্ডস্থ রঘুনন্দন সমিতি প্রকাশিত, ১৩৩৯) কয়েকটি মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়—(ক) গৌরাঙ্গ কৃষ্ণের অবতার ('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ ···কেবলং প্রেমধারৈব সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্ আসুরীভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্'।); (খ) স্বরূপ-দামোদর কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ('চৈতন্যচারুচরণাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ শ্রীমৎস্বরূপ ইহ মে প্রভুরাশ্রয়শ্চ') কিন্তু স্বরূপ-দামোদরের নির্ণীত চৈতন্যদেবের 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপত্ব' এই গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই; (গ) গ্রন্থ মধ্যে অদ্বৈত অনুল্লিখিত এবং নিত্যানন্দ গৌণভাবে স্থিত; (ঘ) গদাধর পণ্ডিতকে রাধার অবতার রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ('রাধা শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ এব সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশস্ত স্বৈবিখ্যাতঃ')। নরহরি দাসই গদাধর পণ্ডিতকে রাধার অবতার ধরিয়া 'গৌর-গদাই' মূর্তির উপাসনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

চূড়ামণি দাস ঃ নিত্যানন্দের অনুচর 'কটক-উজ্জ্বল' ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাস ('নিত্যানন্দ প্রভুশক্তি ধনঞ্জয় ধরে। কটক-উজ্জ্বল বলি কহিতেন তাঁরে।' পৃঃ ৫৪) রচিত 'গৌরাঙ্গ-বিজয়' গ্রন্থটিতে (রচনাকাল ১৫৪২-৫০ খ্রীঃ

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত (১৯৫৭ খ্রীঃ) কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়—(ক) এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা নাই, চৈতন্যকে মধ্যে-মধ্যে 'বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ' বলা হইয়াছে এবং তাঁহার পিতৃভূমি শ্রীহট্টে গমনের বিবরণ আছে, যাহা চৈতন্যভাগবতে কিংবা চৈতন্যচরিতামৃতে নাই ; (খ) এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, নিত্যানন্দের জন্মস্থান 'একচক্রা' নহে, 'খলপপুর'। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে কবি তদীয় গুরু ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গদাধর দাস প্রভৃতির নিকট হইতে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়ানন্দ ঃ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত (রচনাকাল ১৫৫০-৬০, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত, ১৯৬১ খ্রীঃ)। কবি চৈতন্য, নিত্যানন্দ, তৎপুত্র বীরভদ্র গোসাঞি ও তদনুচর অভিরাম গোসাঞি এবং গদাধর পণ্ডিতের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কবির পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র ('তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্বশিষ্য'। ইনিই কি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত চৈতন্যশাখার সুবুদ্ধি মিশ্র ?)। জয়ানন্দের বংশ রামোপাসক—'বন্দিঘটিবংশে রঘুনাথ উপাসক' কিন্তু 'তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক'। নীলাচল-গমনের পর চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে জয়ানন্দের ধারণা স্পষ্ট নহে। জয়ানন্দের মতানুযায়ী চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের কারণ (বামপদে ক্ষত—'ইটাল বাজিল বামপাএ আচম্বিতে') স্বাভাবিক হইলেও চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ (স্বরূপ-দামোদর, পরমানন্দ পুরী, গদাধর পণ্ডিত) এই বিষয়ে নীরব। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' নিতান্ত লৌকিক ধরণের রচনা।

॥ ৭ ॥ চৈতন্যপরিকর—বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী

'শ্রীরূপ সনাতন আর ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (১।১)। বৃন্দাবনবাসী এই ছয় গোস্বামী ছিলেন চৈতন্যদেবের বিশেষ পরিজন। মাধবেন্দ্র পুরীর সময় হইতেই মথুরা ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাবেশের সূত্রপাত হয়। চৈতন্যদেব রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সনাতন, রূপ ও অনুপম (বল্লভ) এই তিন ভ্রাতা চৈতন্যভক্ত ছিলেন। সনাতন ও রূপ কৃষ্ণোপাসক এবং অনুপম রামোপাসক ছিলেন। সনাতন ও রূপ চৈতন্য অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন, ইঁহাদের কাহারও জন্মকাল জানা নাই। সনাতনের তিরোভাব ১৫৫৪ খ্রীঃ পর, রূপের তিরোভাব

আরও পাঁচ-ছয় বৎসর পর বলিয়া অনুমিত হয়। গৌড়ে অনুপমের দেহত্যাগ হয় আনুমানিক ১৫১৫-১৬ খ্রীঃ। অনুপমের পুত্র জীব গোস্বামী।

রূপ গোস্বামী : হুসেন শাহের অধীনে কর্মনিরত থাকাকালীন রূপ গোস্বামীর (সখীর্ মালিক=প্রতিরাজ) এই কয়টি কাব্য রচনা করেন—(ক) 'হংসদূত'। ধোয়ীর পবনদূতের ন্যায় মেঘদূতের অনুসরণে রচিত এই দূত কাব্যটির বিষয়—কৃষ্ণলীলা। (খ) 'উদ্ধব-সন্দেশ'। এই কাব্যও কৃষ্ণবিষয়ক। (গ) 'গীতাবলী'—জয়দেবের অনুসরণে রচিত পদাবলী ; বিষয়—কৃষ্ণকথা। (ঘ) 'বিদগ্ধমাধব'। রচনাকাল ১৫৮১ সংবৎ=১৫২৪ খ্রীঃ। রচনাস্থান—গোকুল ('রাধা-বিলাসবীতাঙ্কং চতুঃষষ্ঠীকলাধরম্। বিদগ্ধমাধবং সাধু শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ॥ নন্দসিন্দুরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে। বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥' (ঙ) 'ললিতমাধব'। ভদ্রবনে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা। রচনাকাল ১৪৫১ শক=১৫২৯ খ্রীঃ। ('পূর্ণং কলাচতুঃষষ্ঠ্যা লক্ষণৈর্ভূষিতৈরপি। ভজন্তু শ্রিতগান্ধর্বং ধীরা ললিতমাধবম্॥ নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্। দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥'[২৩]। (চ) 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'। গোকুলে রচিত এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৬৩ শক ('রামাঙ্গশক্র')=১৫৪১ খ্রীঃ। গ্রন্থটির প্রথম তিনটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব ও স্বীয় গুরু সনাতনের বন্দনা আছে। চৈতন্য ও কৃষ্ণকে এই গ্রন্থে অভিন্ন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে,—'হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি। তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য'। (ছ) 'দানকেলি কৌমুদী'। রচনাকাল—১৪৭১ শক=১৫৪৯ খ্রীঃ। এই একোক্তি নাটিকাটির ('ভাণিকা') বিষয় কৃষ্ণের ঘাটদানলীলা। এই বিষয়বস্তু পুরাণে নাই, তবে, বঙ্গদেশের লৌকিক কবিতা ও গানে প্রচলিত ছিল (যথা, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন')। নন্দীশ্বরে অবস্থান-কালীন এই নাটিকাটি রচিত হয় ('গতে মনুশতে শাকে স্বরচন্দ্রসমন্বিতে। নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্মিতা॥')। (জ) 'উজ্জ্বলনীলমণি'। এই গ্রন্থে কৃষ্ণলীলাভাবনা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসঃসরণীতে প্রবাহিত। গ্রন্থটি চৈতন্য-তিরোধানের পরে রচিত এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিগণ এই গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারেই পদরচনা করিয়াছিলেন। (ঝ) 'পদ্যাবলী'। বৈষ্ণবকবিতার সঙ্কলিত সঞ্চয়ন। বিষয়—ব্রজলীলা। নির্বাচিত রচয়িতাদিগের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য—মাধব চক্রবর্তী, জগন্নাথ সেন, জগদানন্দ রায়, সঞ্জয় কবিশেখর, কেশব ভট্টাচার্য, কেশব ছত্রী, গোবিন্দ ভট্ট প্রভৃতি। চৈতন্যদেব-প্রোক্ত শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলিও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

সনাতন গোস্বামী ঃ হুসেন শাহের 'দবীর্ খাশ্' (=প্রধান মুন্সী) সনাতন ছিলেন রূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গৌড়ে রাজদরবারে কর্মনিরত-থাকাকালীন তিনি মেঘদূতের 'তাৎপর্য-দীপিকা' নামে টীকা রচনা করেন। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের গুরু ছিলেন। চৈতন্যদেব সনাতনকে অত্রলিখিত বিষয়গুলি করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন— 'ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্ধার। বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥ কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-প্রবর্তন। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥' — চৈতন্যচরিতামৃত (৩।৪)। সনাতনের রচনাবলী—(ক) 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' ও ইহার টীকা 'দিগ্দর্শিনী'। এই গ্রন্থের বক্তা জৈমিনী, শ্রোতা জনমেজয়, বিষয় পরীক্ষিত কর্তৃক উত্তরাকে রূপকের মাধ্যমে ভাগবততত্ত্ব (প্রেমভক্তিতত্ত্ব) বর্ণনা। গ্রন্থটির দুইটি খণ্ডে বিবিধ দেব ও মানবচরিত্রের মাধ্যমে ভক্তিকথা, প্রেমভক্তিসাধনতত্ত্বাদি (সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব, সমাধি, মুক্তি, দশাক্ষর গোপালমন্ত্র, অবতারতত্ত্ব, ভগবদ্বিগ্রহের চিন্ময়তা, কৃষ্ণের ভগবত্তা, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রকাশ ইত্যাদি) বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটির লক্ষণীয় বিষয় হইল—রাধা, কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীমাত্র ('শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি। গোপ্যো নিতান্তভগবৎপ্রিয়তা প্রসিদ্ধা॥')। চৈতন্যদেব সনাতনের গ্রন্থে স্বয়ং কৃষ্ণ— 'জয়তি নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণো, বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ। গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপাদ্, অনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্॥··· স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ, সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ। জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্য-নামা, হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥' অর্থাৎ, যিনি স্বচরণকমলে প্রেমদানের নিমিত্ত অবতীর্ণ, যিনি বিবিধমাধুর্যের সমুদ্র, যাঁহার পরমদশাগত চৈতন্যরূপ হইতে গোপীপ্রেম নিত্য অনুভবের বিষয়ীভূত, সেই কিশোর (অনির্বচনীয়ের) জয় হউক।···স্বভাবতঃ যিনি স্বভক্তদিগের সুমধুর নিজভাব অনুভব করিয়া লোভবশে ভক্তরূপে অবতীর্ণ, সেই কনকদেহ, কৃষ্ণচৈতন্য নামা যতিবেশী, শচীনন্দন হরির জয় হউক। (খ) ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষনী' গ্রন্থটি সনাতন জীব গোস্বামীর দ্বারা পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন। (গ) 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতন-প্রণীত বৈষ্ণবকৃত্য ও বৈষ্ণবাচার শাস্ত্র। চৈতন্যদেব সনাতনকে বৈষ্ণবস্মৃতি-শাস্ত্র রচনা করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাও দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সহযোগী হিসাবে গোপালভট্টের নাম পাওয়া যায়। গোপালভট্ট-কৃত হরিভক্তিবিলাসের টীকার নাম 'সারার্থদর্শিনী'।

রঘুনাথ ভট্ট (মিশ্র) ঃ তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট চৈতন্যদেবের আদেশে

বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করেন। ইনি ভাবুক, ভক্ত, সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনার পূর্বেই তাঁহার তিরোধান হইয়াছিল—'মহাপ্রভুর দত্তমালা মরণের কালে। প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে ॥'—চৈতন্য-চরিতামৃত (৩।১৩)। [২৪]

গোপাল ভট্ট ঃ প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্ট মথুরামণ্ডলে রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-কাশীশ্বর-লোকনাথ ও কৃষ্ণদাসের সহযোগী ছিলেন—'ভক্তের্বিলাসাংশ্চিম্বতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥ জীয়াসুরাত্যন্তিক ভক্তিনিষ্ঠাঃ শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেঽত্র। কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্ত শ্রীকৃষ্ণদাসস্য সলোকনাথঃ ॥' পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইনি সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তি-বিলাসের 'সারার্থদর্শিনী' নামক টীকা রচনা করেন; রচনাকাল ১৪৬৫ শক (=১৫৪৩ খ্রীঃ। 'পঞ্চবট্ শক্র')। রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর পরিচয়-জ্ঞাপক পুঁথির [ডঃ সুকুমার সেন সংগৃহীত পুঁথি (বর্ধমান সাহিত্য সভা সংগ্রহ। রচনাকাল ১৩৫২ শক=১৬০১ খ্রীঃ; লিপিকাল ১৬২০ শক=১৬৯৮ খ্রীঃ) সাক্ষ্যে অনুমান করা যায় যে, গোপাল ভট্টের তিরোভাব ১৬১০খ্রীঃ পূর্বে নহে]।

রঘুনাথ দাস ঃ 'উন্মেষে বিকাশে ও পরিণতিতে এই চরিত্রটি (রঘুনাথ দাস) আদ্যন্ত চৈতন্যভাবপ্রণোদিত। কর্মে-চিন্তায়, শিল্পে-সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাবের গভীরতা সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য (ভট্ট) ইত্যাদির চরিত্রে মিলে। আর তাঁহার ত্যাগ তপস্যার আদর্শ প্রকটিত সর্বাধিক রঘুনাথ দাসের চারিত্র্যে।'[২৫] বাল্যকাল হইতে বিষয়ে উদাস রঘুনাথের গুরু ছিলেন অদ্বৈতের শিষ্য চৈতন্যভক্ত যদুনন্দন আচার্য। চৈতন্যদেবের আদেশে রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদরকে আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ উপদেশ ছিল—'গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥' —চৈতন্য-চরিতামৃত (৩।৬)। চৈতন্যদেব তাঁহাকে দুইটি বস্তু দিয়াছিলেন—শঙ্করানন্দ সরস্বতী কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে আনীত গোবর্ধন-শিলা এবং জগন্নাথের গুঞ্জা-মালা। চৈতন্যদেব ও স্বরূপ-দামোদরের তিরোধানের পর আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁহাকে আপনাদের নিকট রাখিয়া-ছিলেন। রঘুনাথ দাসের 'অভীষ্ট সূচন'-এর অন্তিম শ্লোকে ইহার স্বীকৃতি আছে—'যৎপাদাম্বুজযুগ্মবিচ্যুতরজঃসেবাপ্রভাবাদহং, গান্ধর্বাসরসীগিরীন্দ্রনিকটে কষ্টোঽপি—নিত্যং বসন্। তৎপ্রেয়োগণপালিতো জিতসুধাধারামুকুন্দাভিধা, উদ্গায়ামি

শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স রূপোঽবতু ॥'। রঘুনাথের জন্ম ও মৃত্যু সময় অজ্ঞাত। 'প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশক'-এর ৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে কেবল জানিতে পারা যায় যে, তিনি রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ ভট্টের পর দেহত্যাগ করেন। চৈতন্য-জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসরের লীলার তিনি ছিলেন ভাণ্ডারী—'চৈতন্যলীলারত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।' রঘুনাথ দাসের রচনাবলী—'চৈতন্যাষ্টক', 'গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ', 'মুক্তাচরিত্র', 'দানকেলিচিন্তামণি', স্তব ও প্রার্থনা শ্লোকাবলী (স্তব-মালায় সঙ্কলিত। বহরমপুর। ২য় সং। ১৯২৩ খ্রীঃ)।

জীব গোস্বামী ঃ রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী রূপ-গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।[২৬] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে জীব গোস্বামীর বিশেষ অবদান আছে। রূপ ও সনাতন বৈষ্ণবচর্যা, সাধনবিধি ও অধ্যাত্মচিন্তার পথপ্রদর্শক ছিলেন। জীব গোস্বামী ভারতীয় দর্শনের আলোকে বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্মচিন্তাকে প্রতিফলিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাঁহার লিখিত ছয়টি সন্দর্ভে (তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমার্থসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও পরমাত্মসন্দর্ভ)। 'ষট্ সন্দর্ভ' ব্যতীত তিনি ভাগবত ('ক্রমসন্দর্ভ'), ব্রহ্মসংহিতা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। জীব গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ রচনা 'গোপালচম্পূ' (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রকাশিত। বৃন্দাবন, ১৯৪৫ সংবৎ। এই সংস্করণ অনুসারে গ্রন্থটির 'পূর্ব বিভাগ' ১৬৪৫ ও 'উত্তর বিভাগ' ১৬৪৯ সংবতে রচিত হয়)। 'গোপালচম্পূ'-র বিষয়বস্তু হইল—কৃষ্ণের ব্রজলীলার সহিত গোলোকের নিত্যলীলার ঐক্যস্থাপন।

॥ ৮ ॥ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও গুরুবাদ

চৈতন্য-তিরোধানের পর ব্রজমণ্ডলে গোস্বামীদের এবং গৌড়-বঙ্গে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রাধান্য, এই দুই ভিন্নমুখী বৈষ্ণবচিন্তার ধারাকে মিলাইয়া দিবার প্রয়াস লক্ষিত হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে—'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥' (১।১)।

নামোপদেশ দিয়া চৈতন্যদেব জনসাধারণকে ঈশ্বরমুখী এবং তাহাদের জীবনের মান উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে বৃন্দাবনে রূপ এবং সনাতন মাধবেন্দ্র পুরীর আরব্ধ কার্য চালাইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে এই জাতীয় কার্য করিতে অনুগামীদের প্রতি চৈতন্যদেবের কোন নির্দেশ

ছিল না। চৈতন্যতিরোধানের পর বঙ্গদেশে কৃষ্ণবিগ্রহ (তথা, জীব গোস্বামীর স্বীকৃতিতে ব্রজে এবং বঙ্গদেশে রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমূর্তির) প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব মহান্তেরা একাধারে বিগ্রহ-সেবক ও দীক্ষাগুরুপদ অধিকার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। ষোড়শ শতক শেষ হইবার পূর্বেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (২।২২)। সনাতন, রূপ ও জীব ক্রমান্বয়ে গুরু-শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বৃন্দাবনে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গোপালভট্টই প্রধান দীক্ষাগুরু ছিলেন। সনাতনকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব মানব-গুরুকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই—'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে গুরু চৈত্য রূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে ॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (১।১)। অর্থাৎ, চিত্ত জাগিলে মহান্তরূপে (সে মানব-রূপেই হউক কিংবা চৈত্য বা চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামীরূপেই হউক) কৃষ্ণই জীবকে শিক্ষাদান করেন। এই শ্লোকানুসারে বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যদেব ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সাক্ষাৎ সংযোগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই বিষয়ে গুরুর কোন ভূমিকা নাই। কিন্তু বৃন্দাবনী ভক্তিশাস্ত্র-অনুসারে ভগবান হইলেন রাধাকৃষ্ণ এবং এই রাধাকৃষ্ণলীলার সহায়ক হইলেন শ্রীগুরু। রাগাত্মিকা-ভক্তি মতে লীলাসহায়িকা হইলেন গোপী বা সখীগণ এবং রাগানুগা ভক্তি অনুসারে গুরু হইলেন সখী-সহায়ক অর্থাৎ 'মঞ্জরী'। রাগাত্মিকার সখী অপ্রাকৃত বা আদর্শ কিন্তু রাগানুগার 'মঞ্জরী' প্রাকৃত। গুরু বা মঞ্জরীর কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবারসাস্বাদনের কোন উপায় নাই—'গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥—চৈতন্যচরিতামৃত (২।৮)। রঘুনাথ দাসের 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' ও 'প্রার্থনামৃত'-এ মঞ্জরী-অনুগামিতার কথা স্পষ্ট। রঘুনাথ দাস আপনাকে 'শ্রীরূপরতি-মঞ্জর্যোরঙ্ঘ্রিসেবৈকগৃধ্নু' বলিয়াছেন। এই মঞ্জরীতত্ত্ব কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-'য় চূড়ান্ত হইয়াছে (যথা, রূপ=রূপ-মঞ্জরী, সনাতন=লবঙ্গ-মঞ্জরী ইত্যাদি। পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ=কস্তুরী-মঞ্জরী, জাহ্নবাদেবী=অনঙ্গ-মঞ্জরী হইয়াছেন)। লক্ষণীয়, 'পঞ্চতত্ত্ব'-এর কেহই 'মঞ্জরী' নহেন, ভগবানের অংশ স্বরূপ।

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীদের সর্বাধিকার স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের প্রভাব বঙ্গদেশে বিশেষ পড়ে নাই। চৈতন্য-তিরোভাবের পর খড়দহ, শান্তিপুর ও শ্রীখণ্ড এই তিন স্থানে গুরুসম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। চৈতন্য-তিরোভাবের পূর্বেই কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কাষ্ঠনির্মিত যুগলমূর্তির পূজা

বঙ্গদেশে আরম্ভ হইয়াছিল। এই পূজায় অদ্বৈতের সম্মতি ছিল। সর্বপ্রথম এই যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আম্বুয়া-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে। গৌরীদাসের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যাকে (বসুধা ও জাহ্নবা) নিত্যানন্দ [২৭] বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের পর খড়দহে শ্যামসুন্দর মূর্তির সেবা প্রকট করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বঙ্গদেশে বৈষ্ণবেরা অদ্বৈত আচার্যকেই প্রধান নেতা বলিয়া মান্য করিতেন। কিন্তু বসুধার পুত্র বীরভদ্রের শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বৈষ্ণবদের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া বিভেদ দেখা দিল। বীরভদ্রের বিমাতা প্রভাবশালিনী জাহ্নবাকেই নিত্যানন্দভক্তেরা গোস্বামিনী (মা গোসাঁই) বলিয়া মানিতেন। বীরভদ্রও জাহ্নবার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে খড়দহে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা, পুত্র বীরভদ্র ও নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গার সন্তানেরা-গুরু পর্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। নিঃসন্তানা জাহ্নবার পোষ্যপুত্র রামচন্দ্র কালনার অদূরস্থ বাগ্‌নাপাড়ার গুরুপাটের আদিপুরুষ ছিলেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈতচার্যের পর প্রধান হইলেন তৎপত্নী সীতা দেবী ও তৎপুত্রগণ। চৈতন্যতিরোধানের পর বৈষ্ণব-নেতৃত্ব খড়দহ ও শান্তিপুর এই দুই স্থানের গুরুবংশে নিবদ্ধ ছিল। শ্রীখণ্ডে (বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট) নরহরি ও রঘুনন্দনকে লইয়া একটি পারিবারিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রীখণ্ডের প্রধান ছিলেন চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত হুসেন শাহের প্রধান চিকিৎসক মুকুন্দদাস-পুত্র নরহরি দাস সরকার ও তৎপুত্র রঘুনন্দন দাস। নরহরি দাস সরকার গৌরাঙ্গ-গদাধর (গৌর-গদাই) পূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। খড়দহ, শান্তিপুর ও শ্রীখণ্ড—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে খড়দহ সম্প্রদায় বৃন্দাবনের প্রভাব মানিয়া ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও বৈষ্ণববিদ্যার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের প্রবণতা ছিল সঙ্গীতে এবং শিল্পে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিলগ্নে বঙ্গদেশ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবভাবের যে নূতন বন্যা আসিয়াছিল, তাহা বৃন্দাবনে মিলিত তিন বৈষ্ণবকে (শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ) কেন্দ্র করিয়া। বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী গুরু-সরণীর প্রতিষ্ঠাতা তিনজন—(ক) পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য; (খ) উত্তরবঙ্গে নরোত্তম দাস দত্ত; (গ) বঙ্গ-উড়িষ্যাপ্রান্তে শ্যামানন্দ দাস (মণ্ডল)। ইঁহাদের বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম-বিলাস', 'অনুরাগবল্লী', 'রসিকমঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাপ্তব্য। বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে এই তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, খড়দহ, শান্তিপুর ও শ্রীখণ্ডে গুরু সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ (যথাক্রমে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, মুকুন্দ-নরহরি-রঘুনন্দন দাস) চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত

ছিলেন। তৎপরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৃন্দাবনী বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুগৃহীত ছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য ঃ ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও শ্রীখণ্ডের নরহরি দাসের স্নেহ-ভাজন ছিলেন। শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা এবং জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট বৈষ্ণবীয় বিধিমার্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তদনুযায়ী তাঁহাদের শিষ্য-প্রতিনিধি শ্রীনিবাস বৈষ্ণবাচারে বিধি-মার্গের প্রচারক ছিলেন এবং ইনি বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচারের ভার পাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরের মল্লরাজসভায় (মল্লরাজ বীর হাম্বীর ও তৎপুত্র ধাড়ী হাম্বীর) মর্যাদাপ্রাপ্তি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি প্রণিধানযোগ্য ঘটনা। শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্যা ও শিষ্যবর্গ বৃহৎ গুরু-গোষ্ঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালেই পদাবলী-কীর্তন বিধিবদ্ধ ও সাধনভজনের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

নরোত্তম দাস (দত্ত)ঃ ইনি জাতিতে কায়স্থ, ধনী-সন্তান, নিবাস অধুনা রাজশাহীর অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম; পরে ইনি খেতুরী গ্রামে বাস করেন। নরোত্তমের পিতৃব্য 'পদ্মাবতী তীরবর্তি গোপালপুর নগর নিবাসি···শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত' 'গৌড়াধিরাজ-মহামাত্য' ছিলেন। নরোত্তম বৃন্দাবনে অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তী গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবের (সময় আনুমানিক ১৫৮১-৮২ খ্রীঃ) ইনি উদ্যোক্তা ছিলেন এবং কীর্তন-সঙ্গীতকে (রসকীর্তন পালা) যথার্থ শৈল্পিক সুষমা দান করিয়াছিলেন। নরোত্তম ভাগবত পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার একান্ত অবলম্বন ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ ('কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত'—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। নরোত্তম রাগমার্গীয় 'সখীভাব'[২৮]—এর সাধক ছিলেন এবং সহজিয়াদের গুরুস্থানীয় ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শ্যামানন্দ দাস (মণ্ডল)ঃ ইনি জাতিতে সদ্গোপ, নিবাস আধুনিক মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের নিকট ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রাম। জন্মকাল অজ্ঞাত, মৃত্যু ১৬৩০ খ্রীঃ। শ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু ছিলেন চৈতন্য-নিত্যানন্দভক্ত আম্বুয়াবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ জীব গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দের বৃন্দাবন-গমনের কথা মুরারি আচার্যের 'বিন্দু প্রকাশঃ' গ্রন্থে (১৬১৮ শক=১৬৯৬ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। নরোত্তম দাসের মত ইনিও সখীভাবের সাধক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের মত শ্যামানন্দও

ভক্তিপ্রচার করিতেন এবং তাঁহার প্রচার কার্যের প্রধান সহায়ক ছিলেন মুরারি (=রসিক মুরারি/রসিকানন্দ) দাস। শ্যামানন্দ দাসের নামে প্রচলিত কয়েকটি সাধনা-নিবন্ধ ('উপাসনাসার', 'ভাবমালা', 'অদ্বৈততত্ত্ব', 'বৃন্দাবন-পরিক্রমা',) পাওয়া যায়। গোপীজনবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল'-এ রসিকানন্দ ও শ্যামানন্দ এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস'-এ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ সম্পর্কিত বিবরণী পাওয়া যায়। উড়িষ্যার নৃসিংহপুর গ্রামে (বর্তমান নাম কানপুর) শ্যামানন্দ চৈতন্য-দেবের দারু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন (প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' গ্রন্থ, পৃঃ ৬২, দ্রষ্টব্য)।

॥ ৯ ॥ চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবপদাবলী

'যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' (ভাগবত ১১।৫।৩১)—চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতে হরিকীর্তনকে অর্থাৎ নামযজ্ঞকে 'কলৌ পরম উপায়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নামসঙ্কীর্তনের প্রসঙ্গে পদাবলী-কীর্তনের কথা আসিয়া পড়ে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিলগ্নে শ্রীখণ্ডে পদাবলী-কীর্তন বিধিবদ্ধ এবং সাধনভজনের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে কৃষ্ণকথা লইয়া পদরচনা করিয়া-ছিলেন, এমন তিনজন কবির নাম করা যায়—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এর (মধ্যখণ্ড। ১৪ অধ্যায়) অত্রোদ্ধৃত দুইটি গানও কৃষ্ণকথা অবলম্বনে রচিত—(ক) 'সুরুচিরহেমলতামবলম্ব্য তরুণতরুভগবন্তম্। জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনু-কলয়তি সা তু ভবন্তম্॥' অর্থাৎ, সুচারু হেমলতাকে অবলম্বন করিয়া সে (=রাধা) জগদবলম্বন তরুণতরু-সদৃশ ভগবান (কৃষ্ণ) তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অপেক্ষমানা। (খ) 'রসিকেশ কেশব হে। রসসরসীমিব মামুপযোজয়, রসমিব রস নিবহে॥' অর্থাৎ—হে রসরাজ কেশব, আমাকে রসস্নাননিমিত্ত রসসরসীর মত অঙ্গীকার কর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা পঞ্চদশ শতকের উড়িষ্যার কপিলেন্দ্র দেবের গীতিনাট্য 'পরশুরামবিজয়' এবং ষোড়শ শতকের রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' গীতিনাট্য ও রূপগোস্বামীর 'গীতাবলী'। চৈতন্যমিলনের পূব হইতেই রামানন্দ রাগমার্গ-সাধনার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যায়। তাঁহার নাটকের অনেকগুলি শ্লোক 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ উদ্ধৃত হইয়াছে। নাটকটি গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রীতিকামনায় রচিত এবং ইহা অভিনীতও হইয়াছিল ('চৈতন্যচরিতামৃত', ৩।৫ দ্রষ্টব্য)। বঙ্গদেশে ষোড়শ শতকের শেষে গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধব' নাটকও সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু অধুনা নাটকটি দুষ্প্রাপ্য।

চৈতন্যদেবের হৃদয়ের আকূতি চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের রচনাবলীকে নবরূপ দা করিয়াছিল, রাধাকৃষ্ণলীলা-সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার সুরস্পর্শ দিয়াছিল। ব্রজে প্রেমিক বলিতে চৈতন্যপূর্বযুগে কৃষ্ণকেই বুঝাইত, গোপীরা উপলক্ষ্য মাত্র। 'সুভাষিত-রত্নকোশ'-এর 'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে—' ইত্যাদি শ্লোকে যে-কৃষ্ণ, তিনি যাদব কৃষ্ণ। চৈতন্যভাবনায় এই কৃষ্ণই নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইলেন এব তাঁহার জন্যই সম্ভবতঃ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধা, কৃষ্ণের পরিবর্তে মুখ স্থান অধিকার করে।

বাঙ্গালী পদকর্তাদের অন্যতম আদর্শ ছিলেন মৈথিল কবি বিদ্যাপতি। মিথিলা কীর্তন রচনায় ও প্রসারে বিদ্যাপতি এবং রাজা শিবসিংহের নাম স্মরণীয়; অবশ্য এ বিষয়ে শিবসিংহের সভাগায়ক 'জয়ত'-এর নামও উপেক্ষণীয় নহে—'তদ্‌গানার্থ বিদ্যাপতি-কবিকৃতিনা কল্পিতাস্ত ধ্রুবা যাঃ। তাসামেকোঽগ্রগাতাভবদিহ জয়ত সংসদি শ্রীনৃপস্য ॥'—লোচনদাস (রাগতরঙ্গিণী)। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাস্বাদ করিতেন বলিয়াই 'পঞ্চোপাসক' মৈথিল বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর নিকট 'মহাজন' আখ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রেরণায় নবদ্বীপে, শান্তিপুরে ও নীলাচলে র বৈষ্ণব-পদ রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে এবং কৃষ্ণদা কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে কয়েকটি ধুয়া গানও পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবে নিমিত্তই জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় পরিবেষিত শৃঙ্গাররস মধু রসে রূপায়িত এবং সেইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতার মধুর রস মানবি শৃঙ্গার-রসের অহেতুক-আত্মনিবেদনে উত্তরণ, মানবরস এবং অধ্যাত্মরসের আশ্চ সম্মিলন—ইহাও চৈতন্য-আবির্ভাবের ফল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার কালাগ্নি পরিণতি, অসামান্য বাক্‌পরিমিতি এবং অনন্য ভাষানৈপুণ্য বৈষ্ণবপদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই পদাবলী কেবল রাধাকৃষ্ণলীলারই বর্ণনা করে নাই, বাৎসল্যাদি অপরাপর ব্রজ কাহিনীকেও আত্মসাৎ করিয়াছে। 'রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহই বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রাণ'। সংস্কৃত-সাহিত্যে পুরুষের বিরহের কথা আছে (যথা—ঋগ্‌বেদে পুরুরবা রামায়ণে রামের, মেঘদূতে যক্ষের) কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই বিরহ নারীর এ একমাত্র রাধার। চৈতন্য-আবির্ভাবের পর গৌরবিষয়ক পদাবলীও বৈষ্ণব-কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণলীলা এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবকে লইয়া চৈতন্যদেবের আ অনুচরবর্গ, তাঁহার জীবনীকারগণ এবং চৈতন্যভক্তগণ যে-অসংখ্য পদ রচনা করিয়া ছিলেন, প্রদর্শনী হিসাবে তাঁহাদের কয়েকটি পদাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মুরারি গুপ্ত ঃ মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের আদি অনুচর। ইনি দামোদর পণ্ডিতের অনুরোধে সঙ্গীত-রচনা ত্যাগ করিয়া কড়চা-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বাংলায় ও ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ তাঁহার নামে প্রচলিত। গানগুলি সুলিখিত—

(ক) 'না জানিয়া মূঢ়লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়ে শ্রবণ গোচরে। স্রোত-বিথার জলে, এ তনু ভাসাইয়াছি, কি করিবে কুলের কুকুরে॥' (কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি); (খ) 'ঘৃত দিয়া একরতি, জ্বালি আইলা যুগবাতি, সে কেমনে রহে অযোগানে। তাহে সে পবন পুন, নিভাইল বাসোঁ হেন, ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥' (চৈতন্যের প্রতি কবির উক্তি)।

মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত ঃ শ্রীচৈতন্যের সমাধ্যায়ী মুকুন্দ দত্ত ও তাঁহার অগ্রজ বাসুদেব দত্তের আদি নিবাস চট্টগ্রাম। মুকুন্দ সঙ্গীতে এবং বাসুদেব নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। মুকুন্দ ও বাসুদেব-রচিত যথানুক্রমিক গৌরবিষয়ক দুইটি পদাংশ—

(ক) 'ঞিহা গুণ সোঙরি, রোয়ত শান্তিপুর-নাথ, যব পহুঁ নীলাচলে যাই। হেরইতে প্রেম-অঙ্গ, মুকুন্দমন ভুলল, লগাওত লোক বুঝাই॥' (চৈতন্যের পুরী-গমনকালে অদ্বৈতের বিলাপ); (খ) 'করিবর-কর জিনি, বাহুর সুবলনি, দোসরি গজমোতি হারা। সুমেরু-শিখরে, যৈছন ঝাঁপিয়া, বহই সুরধুনি-ধারা॥' ('ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)।

নরহরি দাস (সরকার) ঃ শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের নরহরি দাস (সরকার) বিরচিত পদের দৃষ্টান্ত—

(ক) 'দুহুঁ মুখ হেরই, অথির ভেল দুহুঁ তনু, পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ। নরহরি-হৃদিমাঝে, অপরূপ জাগল, জলধর বিধুবর ঝাঁপ॥' [রাধাকৃষ্ণের বিরহান্তিক মিলনের তীব্রতা। ('রসকল্পবল্লী' হইতে উদ্ধৃত)]; (খ) 'সই কত না সহিব ইহা। আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া॥' [সখীর প্রতি রাধার উক্তি। ('সঙ্কীর্তনামৃত' হইতে উদ্ধৃত)]; (গ) 'গৌর-গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন। সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন॥' [গৌর-গদাধর বিষয়ক পদ। (জগবন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংগৃহীত এই পদটির অকৃত্রিমতা নিঃসংশয়িত নহে)]।

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ঃ গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব তিনজনেই চৈতন্যদেবের লীলাসঙ্গী ছিলেন (চৈতন্য-চরিতামৃত, ১।১১ ; ২।৫)। ইঁহাদের আদি নিবাস শ্রীহট্ট (মাতৃকুল)-চট্টগ্রাম (পিতৃকুল), পরে কুমারহট্ট ও তৎপরে নবদ্বীপ। গোবিন্দ ও মাধব ঘোষের পদের দুইটি অনুক্রমিক নমুনা—

(ক) 'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥' (গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ); (খ) 'নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুন পুন, দুহুঁ দোহাঁ বদন নেহারি। অন্তরে উথল, প্রেম-পয়োনিধি, নয়নে গলয়ে ঘন বারি॥' (রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক উৎকণ্ঠা)।

বাসুদেব ঘোষ রচিত গৌর-পদগুলিকে আদি গৌরচন্দ্রিকা বলা যায়—'গৌরচন্দ্র-জননাদিসমস্তলীলাবিস্তারিতানি ভুবি সর্বরসানি সন্তি। শ্রীবাসুদেবঘোষরচিতানি পদ্যানি যানি তান্যেব গায়তঃ বুধাঃ কিল কীর্তনাদৌ॥' বাসুদেব কৃষ্ণলীলা এবং গৌরাঙ্গ-লীলায় সাদৃশ্যে যে-পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উচ্চাঙ্গের নহে। কিন্তু যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়াছেন, সেই খানেই তিনি সার্থক হইয়াছেন। যথা,—

(ক) 'কত কত চাঁদ জিনি নয়ন কমল। রমণীর চিত্ত হরে নয়ন যুগল॥' (গৌররূপ-দর্শনে নদীয়া-নাগরীদের মনোভাব।); (খ) 'শচীর আঙিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥' (গৌরপদ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ চৈতন্যসন্ন্যাসবিষয়ক গাথা জাতীয় কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাসুদেব ঘোষের নামাঙ্কিত। কিন্তু ইহার প্রামাণিকতা বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে।

বংশীবদন চট্ট : ইনি চৈতন্যের প্রতিবেশী ও ভক্ত ছিলেন। ইহার রচিত গৌরপদাবলীতে প্রত্যক্ষ-দর্শনের প্রত্যয় বিদ্যমান। যথা,—

(ক) 'আলো সই কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা। মো মেনে আপনা খাইলুঁ, কেনে বা যমুনা গেলুঁ, শয়নে স্বপনে দেখোঁ আলা॥' (যমুনার তীরে রাধিকার কৃষ্ণ দর্শন। তুলনীয় : জ্ঞানদাস); (খ) 'কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌর রায়। শাশুড়ী-বধূর, রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥' (চৈতন্য-সন্ন্যাসে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ)।

রামানন্দ বসু : কুলীন-গ্রামবাসী রামানন্দ বসু মালাধর বসুর পুত্র ও সত্যরাজ খানের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি বাৎসল্য ও গৌর-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। স্বপ্ন-সমাগম বিষয়ক পদ-রচনায় রামানন্দ, বংশীবদন এবং জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের রচিত যথাক্রমিক তিনটি সদৃশ পদাংশ—

(ক) 'শাঙন মাসের যে, রিমি ঝিমি বরিষে, নিন্দে তনু নাহিক বসন। শ্যামল বরণ এক, পুরুষ আসিয়া মো, মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥'; (খ) 'কি পেখনু নিশির

স্বপনে। এক পুরুষবর, তনু নব জলধর, হাসিয়া করয়ে আলিঙ্গনে॥' (গ) রজনী শ্রাবণ ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে। পালঙ্কে শয়নরঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিন্দ যাই মনের হরিষে॥' তুলনীয়ঃ ['ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং,নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত। ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিত-বাহুবন্ধনা॥'—কালিদাস (কুমারসম্ভব)]।

গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ গুপ্তঃ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অনেক ভক্ত পদকর্তার রচনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হারাইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। 'রসকল্পবল্লী'-তে গোবিন্দ আচার্যের একটি পদ পাওয়া যায়— 'ঘন মেঘ বরিষয়ে বিজুরি ললপে। তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে॥ ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলাজ মুরারি। লাজ নাহি তোর অঙ্গে হাম পরনারী॥' (রাধিকার উক্তি)।

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ('পরমানন্দগুপ্ত যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী') এবং চৈতন্যচরিতামৃতে (২।২৫) কীর্তনীয়া পরমানন্দের নাম পাওয়া যায়। 'পদকল্পতরু'-তে ইহার নামে কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে (৩।২) অপর একটি করুণ চরিত্রের কথা আছে—প্রভুর কীর্তনীয়া ছোট হরিদাস। ইনি স্বয়ং পদরচনা করিতেন কিংবা অপরের রচিত পদ গান করিতেন, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

চৈতন্যজীবনীকারগণ তাঁহাদের কাব্যগুলির মধ্যে স্থানে-স্থানে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংযুক্ত করিয়াছেন। যথা,—

বৃন্দাবন দাসঃ বঙ্গভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনী-কাব্য বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এর দুইটি পদাংশ—(ক) 'চারি-বেদ-শির,-মুকুট চৈতন্য, পামর মূঢ় নাহি জানে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস (তছুপদে) গানে॥' (১।২); (খ) 'মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ-ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরি নাম রে। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ, চান্দ প্রভু জান, বৃন্দাবন দাস রসগান রে॥' (১।১)।

লোচন (লোচনানন্দ) দাসঃ ইনি অধিকাংশই রূপানুরাগের পদ রচনা করিয়াছিলেন। লোচনের ভাব সরল, ভাষা গ্রাম্য, ছন্দ লৌকিক। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

(ক) 'জয় জয় অদ্বৈত আচার্য দয়াময়। যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥'; (খ) 'আর শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা। কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা॥'

জয়ানন্দ : জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর দুইটি পদাংশ (যথাক্রমে, আদি।৬; প্রকাশ।১৫)—(ক) 'মহাভাগবত সঙ্গে, হরিসঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে, বিষ্ণু-যজ্ঞে যজিব সংসার। হরিনাম চিন্তামণি, সভারে দিবেন জানি, কলিগ্রহ এই প্রতিকার॥ শুনিয়া আকাশ বাণী, চলিলা অমর মণি, ধরণী চলিয়া প্রেমানন্দে। চৈতন্যমঙ্গলগীত, ত্রিজগৎ আনন্দিত, জয়ানন্দ রচে নানা ছন্দে॥' ; (খ) 'কৃষ্ণের ভজন ভিন্ন সভে নাঞি জানি। জে জেমন তারে তেমন দেব চক্রপাণি। জাহার কটাক্ষে কোটি ব্রহ্মা হএ পাত। জাহারে ভজিলে জীব হএ জগন্নাথ॥ চৈতন্য-মঙ্গল গীত গাএ জয়ানন্দে। মন রহু কৃষ্ণ পদাম্বুজমকরন্দে॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'যথা রাগঃ' বলিয়া কয়েকটি স্বরচিত পদ সংযুক্ত করিয়াছেন। যেমন (যথাক্রমে, ১।১৩; ৩।২০),—

(ক) 'পাইয়া অমৃত ধনী, পিয়ে বিষগর্ত পানি, জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল? শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস। ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥' ; (খ) 'কান্তা সেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদ সেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী॥ এই বাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর, মন দেহ ধরণ না যায়॥ ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম, আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ। সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে, পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ॥'

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং গদাধর—এই তিন প্রধান চৈতন্যপরিকরের প্রভাবও পদকর্তাদের উপর পড়িয়াছিল। পদাবলীতে সখ্যভাবের ধারা নিত্যানন্দের প্রভাবেই আসিয়াছিল ['নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা। শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখি পাখা॥'—(চৈতন্যচরিতামৃত ১।১১)]। বাসুদেব ঘোষও নিত্যানন্দের সঙ্গী ছিলেন।

বলরাম দাস : বাসুদেবের পর বাৎসল্যরসের পদকার নিত্যানন্দভক্ত বলরাম দাস ['বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী। নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥' (চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১১)] 'হাটপত্তন' রূপকেরও ইনি পথিকৃৎ। বলরাম দাস রচিত পদের দৃষ্টান্ত—

(ক) 'বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী, মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। চরণের

বাধা লইয়া, দিব মোরা যোগাইয়া, তোমার আগে কহিল নিশ্চয় ॥' [বাৎসল্যরসের পদ]; (খ) 'কিশোর বয়স কত বৈদগধি ধাম। মূরতি মরকত অভিনব কাম॥ প্রতি-অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥' [রূপানুরাগের পদ]; (গ) 'হাট করি পরিবন্ধ, রাজা হৈল নিত্যানন্দ, পাষণ্ডদলন বীরবানা। পসারী শ্রীবিশ্বম্ভর, সঙ্গে লয়্যা গদাধর, আচার্য চত্বরে বিকে-কিনে।' ['হাটপত্তন' রূপকের পদ]।

জ্ঞানদাস : জ্ঞানদাস (নিত্যানন্দের গণভুক্ত হইলেও) জাহ্নবা দেবীর অনুচর ছিলেন। পদাবলী রচনায় চণ্ডীদাসের পরেই ইঁহার খ্যাতি। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগ বিষয়ক কয়েকটি অবিস্মরণীয় পদ্যাংশ—

(ক) 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥'; (খ) 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥'; (গ) 'কালার কপালে চাঁদ, চন্দনের ঝিকিমিকি, কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়া। বকুতের পাতে কেবা, কালিন্দী পূজিয়াছে, জবা কুসুম তাহে দিয়া॥'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চণ্ডীদাসের নামে আর একটি প্রচলিত পদের ('সজনি কে গো মণ্ডলী বাজায়'—ইত্যাদি) শেষাংশে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' চৈতন্যদেবের প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট — 'আজু কেন দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে॥' (বৈষ্ণবপদাবলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিত্যানন্দ-ভক্ত কিংবা তাঁহার কৃপাধন্য একাধিক পদকর্তার পদ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদকল্পতরু' ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে, কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। কুমারহট্টবাসী সদাশিব কবিরাজ ও তৎপুত্র পুরুষোত্তম উভয়েই নিত্যানন্দের অনুচর ছিলেন। পুরুষোত্তম 'হরিভক্তিতত্ত্বসংগ্রহ' সঙ্কলন ('নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্বমকরন্দমধুব্রতাঃ। তেষাং দাসানুদাসোঽসৌ পুরুষোত্তমশর্মকঃ॥') করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চৈতন্য অথবা নিত্যানন্দ বিষয়ক একটি পদও রচনা করেন নাই। পুরুষোত্তমের পুত্র দেবকীনন্দনের প্রসিদ্ধি বৈষ্ণব-বন্দনার জন্য। ইঁহার রচিত অধিকাংশ পদই চৈতন্য-বিষয়ক। মল্লভূমবাসী পরমেশ্বর দাসের পদ চণ্ডীদাসকে স্মরণ করায় ('পরমেশ্বর দাসে কয় শুন রসবতী। বাঁশির কোন দোষ নাঞি কালিয়ার কুগতি॥')। অপরাপর নিত্যানন্দ-বন্দনার কবি—আত্মারাম দাস, আচার্য চন্দ্র, দ্বিজ গঙ্গারাম, চন্দ্রশেখর দাস প্রভৃতি।

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্যদ্বয় (অনন্ত দাস ও অনন্ত আচার্য) উভয়েই বাংলা এবং

ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। যথা,—(ক) কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলি শির পর শোভে শিখি-চাঁদকি ছাঁদে। অনন্তদাস পহুঁ অপরূপ-লাবণি সকল যুবতি-মন পড়ি গেও ফাঁদে॥'; (খ) 'কে জানে কিসের দান, কি বোল বলিলে কাহ্ন, অন্য হৈতে আমি ভাল জানি। যদি বল আন বোল, মাথায় ঢালিব ঘোল, হাসিলা অনন্ত পহুঁ শুনি॥' (পদটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রেশ শোনা যায়)। অদ্বৈতাচার্যের অপর শিষ্য শ্যামদাস আচার্য রচিত অদ্বৈতবন্দনা-পদ পাওয়া যায়। গদাধর পণ্ডিতের দুই প্রধান শিষ্য, নয়নানন্দ ও শিবানন্দ চৈতন্য-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। 'অভিনব সংকবি' জগন্নাথ দাসের পদে চৈতন্য-সাক্ষাৎ সম্পর্কের চিহ্ন বিদ্যমান—'ব্রহ্ম-পুরন্দর দিনমণি-শঙ্কর, যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর। সো হরি কৌতুক, ব্রজবালক সাথে, গোপনাগরী অভিলাষা রে॥'

শ্রীখণ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি বিশিষ্ট রীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট, তাঁহারা সকলেই শ্রীখণ্ডবাসী অথবা শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ভুক্ত। যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন (ছোট বিদ্যাপতি), কবিশেখর (১৬ শতকের শেষার্ধ), রায়শেখর (১৭ শতক) প্রভৃতি পদকর্তাগণ সকলেই শ্রীখণ্ডের অধিবাসী।

পদাবলী-কীর্তনরীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে 'কৃষ্ণমঙ্গল'[৩০] পাঁচালীর জনপ্রিয়তা সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। অবশ্য, কৃষ্ণলীলার অনুসরণে পদকীর্তনেও ধারাবাহিকতা আসিল। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং অধ্যাত্মভাবনা—পদাবলীতে এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছে। পদকীর্তনকে বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পে উন্নীত করিয়াছিলেন শ্রীখণ্ডের নরোত্তম এবং তদীয় মার্দঙ্গিক দেবীদাস। প্রথম দিকের পদাবলী-বিধানে পদকর্তার ভূমিকা ছিল রাধার সখী অথবা কৃষ্ণের দূতী। পরবর্তীকালের পদকর্তাগণ 'মঞ্জরী' এবং ইঁহারা মুখ্যতঃ তিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—শ্রীনিবাস-সম্প্রদায়, নরোত্তম-সম্প্রদায় এবং গদাধর পণ্ডিত-সম্প্রদায়। শ্রীনিবাস-সম্প্রদায়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হইলেন—গোবিন্দদাস (সেন) কবিরাজ, তদীয় অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহ; গোবিন্দদাস চক্রবর্তী (বীর হাম্বীর ও ধাড়ী হাম্বীরের নামে প্রচলিত পদগুলির রচয়িতা বলিয়া অনুমিত); গতিগোবিন্দ (শ্রীনিবাসের পুত্র); যদুনন্দন দাস প্রভৃতি। 'রসনারোচনশ্রবণবিলাস রুচির পদ'-কর্তা জীব গোস্বামীর অনুগ্রহভাজন 'কবিরাজ', বিদ্যাপতির 'রসপুর'-ক গোবিন্দদাস বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(ক) অর্ধনারীশ্বর-বন্দনা (বৃন্দাবন দাসের 'রসনির্যাস'-নামক পদসংগ্রহে সঙ্কলিত। পদটি কবির বৈষ্ণব হইবার পূর্বে রচিত।); (খ) সঙ্গীতমাধব

নাটকের গান (পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত ॥) ; (গ) রাম-বন্দনা (ভক্তি-রত্নাকরে উদ্ধৃত। বৈষ্ণবপদসংগ্রহে এই জাতীয় বন্দনা বিরল।) ; (ঘ) বিবিধ বন্দনা-পদ (জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি বিষয়ক।) ; (ঙ) অষ্ট-কালীয় লীলা (রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ-সেবাপদ্ধতি অনুসারে বিস্তারিত।) । নরোত্তম-সম্প্রদায়ের পদকর্তা বসন্ত রায় (গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু), শিবরাম দাস, রায় চম্পতি [৩১] প্রভৃতি। গদাধর পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের পদকর্তা নয়নানন্দ মিশ্র, অনন্ত দাস, রায় অনন্ত প্রভৃতি।[৩২]

॥ ১০ ॥ চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যজীবনী অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই অধিক। চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূল তত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব হইল—(ক) ঈশ্বরের সহিত মানুষের আত্মীয়তা স্থাপন ; (খ) ঔদার্য ; (গ) ভজনাঙ্গের সহজ-সাধ্যতা ও উপাদেয়তা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা এবং মথুরা-লীলায় ঐশ্বর্যভাবই প্রকটিত ; বৃন্দাবন-লীলায় অবিমিশ্র মাধুর্য ভাব। চৈতন্যদেব যে-ঈশ্বর ধারণা প্রকটিত করিলেন, তাহা হইল ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের অভিনব সম্মিলন। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরও বটেন এবং আত্মীয়ও বটেন। ঐশ্বর্যভাবের মধ্যে যে-দূরত্ব, মাধুর্যভাবের সম্মিলনে তাহা অপসৃত হইয়া নৈকট্য ও ঈশ্বর-ধারণার সম্পূর্ণতা বিহিত হইল—'ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ আমারে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (১।৪) ['যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ, সর্বশঃ ॥'—গীতা (৪।১১)]। চৈতন্যদেব যে- ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইল—প্রেম-ভক্তি ধর্ম। ঈশ্বরভক্তির ঐশ্বর্য ও ঈশ্বর-প্রেমের মাধুর্য উভয়ই এই ধর্মে বিদ্যমান। সেই ভক্তিযুক্ত 'উন্নত-উজ্জ্বল-রস' সমর্পণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥'—বিদগ্ধমাধব (১।২)। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য মিশ্রিত এই অপূর্ব করুণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য। বৃন্দাবনের রাগাত্মিকার অনুসরণে গৌড়ের রাগানুগাভক্তি—এই সাধারণ ধারণায় মনে হয় যে, চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম অনুকৃত ধর্ম মাত্র. কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। রাগাত্মিকায় ঐশ্বর্যের লেশ নাই কিন্তু রাগানুগায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের যুগপৎ অবস্থিতি। ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মে রাগানুগা ভক্তি হইল চৈতন্যের বিশিষ্ট অবদান।

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার উদারতা। যদিও বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মের একটি সাম্প্রদায়িক শাখা মাত্র, তথাপি, এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই—'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥', অপিচ, 'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (২।– ; ৩।৪)। বৈষ্ণব আচার্যগণ কোন সাধন-পন্থার (জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি) নিষ্ফলতার কীর্তন করেন নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য স্বরূপকেও উপেক্ষা করেন নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ বলিয়া কাহাকেও সর্বোচ্চ আসন দেয় নাই, শ্বপচ বলিয়া কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখে নাই, হরিনাম-মহাযজ্ঞে সকলেরই নিমন্ত্রণ আছে। হরিভক্তি-পরায়ণ শ্বপচ হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ হইতেও গরীয়ান্।[৩৩]

মহাপ্রভু যে-ভজনাঙ্গের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে অবলম্বনীয় এবং সহজ-সাধ্য। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তে উদ্ধৃত চৈতন্যদেবের 'শিক্ষাষ্টক'-ই ইহার প্রমাণ—(ক) নাম-সঙ্কীর্তন হইতে কৃষ্ণপ্রেমোদগম, চিত্তশুদ্ধি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি এবং সেবামৃত লাভ। 'চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥'; (খ) কৃষ্ণনামে কৃষ্ণশক্তি নিহিত। নামযজ্ঞে দেশকালের নিয়ম নাই। 'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'; (গ) বৈষ্ণব-লক্ষণ চতুষ্টয়। নামযজ্ঞাধিকারের যোগ্যতা। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'; (ঘ) বৈষ্ণবদিগের কাম্য শুদ্ধা ভক্তি। 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥'; (ঙ) আপনাকে নিত্যদাস-জ্ঞান ও সেবার অধিকার-প্রার্থনা। 'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥'; (চ) কৃষ্ণপ্রেম-প্রার্থনা। 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥'; (ছ) কৃষ্ণবিরহে উদ্বেগাদি ব্যভিচারী ভাব। 'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥'; (জ) ভক্ত

কৃষ্ণৈকগতি। কৃষ্ণসুখেই ভক্তের সুখ, কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগই ভক্তি। 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (৩।২০)।

চৈতন্যদেবের উপদেশগুলির সহজবোধ্যতা এবং পালন-সৌকর্য উল্লিখিত শ্লোক-গুলিতে বিদ্যমান। তিনি মানুষকে পবিত্র জীবনযাপনের একটি সহজ ও সরল পথ দেখাইয়াছিলেন, যে-পথে শাস্ত্র বিধি-বিচারের জটিলতা নাই, আছে আন্তর পবিত্রতার প্রয়াস। অন্তর পবিত্র হইলে ঈশ্বর-সাধনাও সহজ হইয়া উঠে—ইহাও সর্বধর্মেরই মূল কথা। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় বটে, তবে, ইহা উপেয় নহে, উপায় মাত্র। এই প্রসঙ্গে জগাই-মাধাইয়ের চিত্তসংস্কার, কাজীর মানসিক পরিবর্তন এবং জাতিভ্রষ্ট সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ স্মরণীয়। রঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও তিনি এই সহজ উপদেশ দিয়াছিলেন—'গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (৩।৬)। নববিধা সাধনভক্তির (শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পরিচর্যা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন) মধ্যেও বিষ্ণু-স্মরণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে তপন মিশ্রকে চৈতন্যদেব সাধ্যসাধন-বিষয়ক যে-উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহার চরম কথাটি হইল—'শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহা-ভাগ্য ॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল ॥'—চৈতন্যভাগ-বত (১।১০)। সংসারীজনের প্রতিও তাঁহার উপদেশ সরল ছিল। গোপীনাথ পট্টনায়ককে মৃত্যুদণ্ড হইতে উদ্ধার প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর উপদেশ ছিল,— '...এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন। ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥ রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়। সেই ধন করিহ নানা ধর্মকর্মে ব্যয় ॥ অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুই লোক যায়।'—চৈতন্যচরিতামৃত (৩।৯)।

চৈতন্যদেব স্বয়ং কোন বৈষ্ণব-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। ভক্তি-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-স্মৃতি ইত্যাদি রচনা করিবার ভার তিনি রূপ এবং সনাতন গোস্বামীকে দিয়াছিলেন। ভাগবতের ভিত্তি-ভূমির উপরেই রূপ, সনাতন এবং উত্তরকালে জীবগোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর, রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', সনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' এবং জীবগোস্বামীর 'ষট্সন্দর্ভ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব-সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্ম : পরমাত্মা : ভগবান : শ্রীকৃষ্ণ : 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানম দ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥' —ভাগবত (১।২।১১)। এই শ্লোকাবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরতত্ত্ব নির্ণয় করিলেন—'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা, য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ

ভগবান্ স স্বয়ময়ং, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (১।২)। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই হইতেছে পরতত্ত্ব। এই পরতত্ত্ব জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম, যোগমার্গে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গে ভগবান বলিয়া অভিহিত হন। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইল শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব। পৃথক্‌ভাবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা ভগবান বলিলে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ বলা হয় না। এই পূর্ণ স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিকীর্তিত।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥' —ব্রহ্মসংহিতা (৫।১)। 'বৃংহ' ধাতু হইতে জাত 'ব্রহ্ম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে বৃহৎ বস্তু, যিনি স্বয়ং বৃহৎ এবং যিনি বড় করেন—'বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম ॥ বৃংহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।' —(বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৫৭)। ব্রহ্ম বিবিধ পরাশক্তির আধার ('পরাশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)। তিনি অনন্ত, তাঁহার অনন্তত্বের প্রকাশ স্বরূপে, স্বশক্তিতে ও স্বশক্তির প্রকাশ-বৈচিত্র্যে। ব্রহ্মের অভিব্যক্তি দ্বিবিধ—মূর্ত ও অমূর্ত ('দ্বাবেব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ।' —বৃহদারণ্যক, ২।৩।১)। মূর্ত অভিব্যক্তিতে তিনি অনন্তরূপ ('একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।' —গোপালতাপনী শ্রুতি)। যুক্তিতর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০; কঠ, ১।২।২০)। অর্থাৎ, একই ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপে বিরাজিত, পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় (যুগপৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ)। তবে, গুরু-লঘু ভেদে ব্রহ্মের শক্তি-বিকাশের তারতম্য আছে। ব্রহ্ম অমূর্ত অভিব্যক্তিতে নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ এবং অব্যক্ত-শক্তিক (নিঃশক্তিক নহেন), কিন্তু মূর্ত অভিব্যক্তিতে ব্রহ্ম সাকার, সগুণ, সবিশেষ এবং ব্যক্ত-শক্তিক। সেইহেতু, শ্রুতিতে তিনি নিরাকার ও সাকার উভয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন ('যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥'—চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৬।৬৭)। ব্রহ্ম রস-স্বরূপ ('রসো বৈ সঃ।'—তৈত্তিরীয়, ২।৭; রস্যতে রসয়তি ইতি রসঃ।), অর্থাৎ, ব্রহ্ম আস্বাদ্য এবং আস্বাদক উভয়ই। রস-স্বরূপের শক্তির বিকাশ হইতেছে তাঁহার ঐশ্বর্যের বিকাশ, ভগবত্তার বিকাশ। ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার বিকাশে তিনি ঈশ্বর বা ভগবান্। শঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণের 'বৃংহতি' শব্দটি লইয়াছেন কিন্তু 'বৃংহয়তি' শব্দটি গ্রহণ করেন নাই। সেইহেতু শঙ্করভাষ্যে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক। পরতত্ত্ব-নির্ণয়ে ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের সিদ্ধান্ত হইতেছে—প্রকৃতি (সাংখ্যদর্শন মতে); পুরুষ (পাতঞ্জল-দর্শন মতে); পরমাণু (ন্যায়দর্শন মতে); পদার্থ (বৈশেষিক-দর্শন মতে); ঈশ্বর বা সগুণ-

সাকার ব্রহ্ম (পূর্বমীমাংসা মতে) ; নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম (উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত মতে)। পাতঞ্জল-দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না। পাতঞ্জল-মতে পরতত্ত্ব হইল—আত্মা অন্তর্যামী পুরুষ। ভক্তিবাদে পরতত্ত্ব হইল ভগবান। এই ভগবান রসস্বরূপ, স্বমাধুর্যে সর্বাকর্ষক বলিয়া তিনি 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত—'কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥' —(মহাভারত, ৪।৭১)। এই কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্বকারণের কারণ, স্বয়ং ভগবান্। শক্তি বা গুণের তারতম্যে তিনি অংশ কিংবা কলারূপে প্রকাশিত—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' —(ভাগবত, ১।৩।২৮)। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-রহিত, সর্বাশ্রয়, সর্বধাম, সর্ববিশ্বের বিশ্রাম। এই পরমদেবতা কৃষ্ণের লীলা অনন্ত ('লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'—বেদান্তসূত্র, ২।১।৩৩)। নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বেরই অন্তর্গত এবং এই শ্রীকৃষ্ণই সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই। শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম, যোগমার্গে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গে ভগবান। ঈদৃশ পরতত্ত্বকে নিরাকার, নির্গুণ বলা বিধেয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত দেহী, কৃষ্ণ-দেহ প্রাকৃতসত্তার বিকার নহে। নিরাকার ও নির্গুণ বলিলে কৃষ্ণের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করা হয়।

বেদান্ত সূত্র—শঙ্কর-ভাষ্য ও ভাগবত ঃ ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন। ঈশ্বর-বচনে ভ্রম (=অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান), প্রমাদ (=অসাবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (=বঞ্চনেচ্ছা), করণাপাটব (=ইন্দ্রিয়ের অপটুতাহেতু ভ্রান্তি) ইত্যাদি দোষ নাই। উপনিষদের সূত্রগুলির মুখ্যার্থ বা প্রধানার্থই গ্রহীতব্য, গৌণার্থ বা অপ্রধানার্থ নহে। শঙ্করাচার্য সূত্রগুলির গৌণার্থ করিয়া উহাদিগের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিত করিয়াছেন। অবশ্য, শঙ্কর-কৃত এই কার্য ঈশ্বর-নির্দেশিত। পদ্মপুরাণে (৬২।৩৪) শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন—'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।' সৃষ্টি-পরিবর্ধনের জন্যই কল্পিত তন্ত্রের দ্বারা জনগণকে পরতত্ত্ব-বিমুখ করার প্রয়োজন। সেইহেতু, পদ্মপুরাণে (২৫।৭) পার্বতীকে মহাদেব বলিলেন—'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥' মহেশ্বরের এই ব্রাহ্মণ-মূর্তিই হইলেন মায়াবাদী শঙ্করাচায। শঙ্কর-কৃত বেদান্তভাষ্য বিবর্তবাদাশ্রয়ী, কারণ, ব্রহ্মের ভগবত্তা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

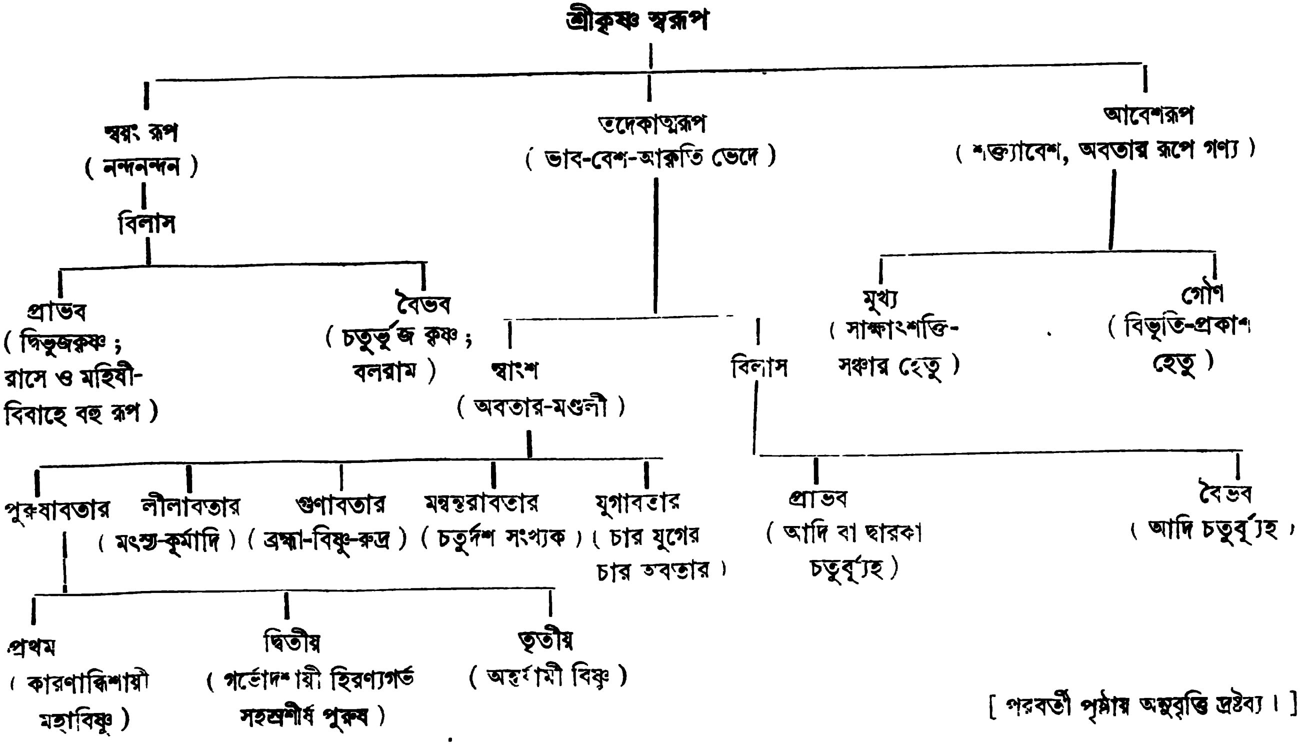
আত্মপ্রণীত বেদান্ত সূত্রের মুখ্যার্থদ্যোতক ভাষ্য রচনা করেন স্বয়ং ব্যাসদেব।

এই ভাষ্য হইল—শ্রীমদ্‌ভাগবত। 'অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥' (—হরিভক্তি-বিলাস। ১০।২৮৩ ধৃত গারুড় বচন)। মহাবাক্য প্রণব-(ওঁ)-এর যে-অর্থ গায়ত্রীতে বিধৃত, সেই অর্থ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট নারদ এবং নারদের নিকট ব্যাসদেব ইহা শ্রবণ করেন। ইহাই ব্যাসের ভাগবত রচনার প্রেরণা। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঋক্। ঐতরেয় আরণ্যক), 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' (যজুঃ। বৃহদারণ্যক), 'তত্ত্বমসি' (সাম। ছান্দোগ্য), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (অথর্ব)—এইগুলি পরতত্ত্বের একদেশিক ব্যাখ্যা মাত্র, মহাবাক্য নহে। ব্যাসদেব ষড়্‌দর্শনের বিবিধ সিদ্ধান্ত (সাঙ্খ্য : প্রকৃতি ; পাতঞ্জল : পুরুষ ; ন্যায় : পরমাণু ; বৈশেষিক : পদার্থ ; পূর্বমীমাংসা : সগুণ ব্রহ্ম ; উত্তরমীমাংসা : নির্গুণ ব্রহ্ম) পর্যালোচনা করিয়া তদীয় বেদান্ত সূত্রের ঋক্-অনুসারী ভাষ্য করিয়াছেন শ্রীমদ্‌ভাগবতে। গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ ভাগবতে সকল বেদার্থের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২৫)। ভাগবতে পরিণামবাদ সমর্থিত হইয়াছে, বিবর্তবাদ নহে।

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ : বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম। পরিবর্তিত না হইয়া বস্তুর অবস্থান্তরবৎ প্রকাশের নাম বিবর্ত। শঙ্করাচার্যের মতে নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্বিকার ব্রহ্ম জীব ও জগতে পরিবর্তিত হন না ; মায়ার জন্যই ব্রহ্ম পরিবর্তিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সেই হেতু জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জ্ঞানোদয়ে এই মায়া অপনোদিত হয়। ভাগবতবাদীরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য মায়াশক্তির প্রভাবে জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হন এবং পরিণত হইয়াও তিনি স্বয়ং অবিকারী থাকেন।

দশবিধ প্রমাণের (প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শব্দ-অর্থাপত্তি-অনুপলব্ধি-অভাব-সম্ভব-ঐতিহ্য-চেষ্টা) মধ্যে স্বতঃপ্রামাণ্য শ্রুতিই হইল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতি অপৌরুষেয় এবং শ্রুতি-মতে ব্রহ্ম সবিশেষ, সবিগ্রহ। এই বিগ্রহ অপ্রাকৃত—'অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'। ব্রহ্মের স্বাভাবিক তিন শক্তি (পরা, অপরা, ক্ষেত্রজ্ঞা), তিনি ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান এবং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ : শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশ ত্রিবিধ—ব্রহ্ম (জ্ঞানমার্গে), পরমাত্মা (যোগমার্গে), ভগবান (ভক্তিমার্গে)। ব্রহ্ম কৃষ্ণের নির্বিশেষ প্রকাশ, পরমাত্মা তাঁহার আংশিক প্রকাশ এবং ভগবান তাঁহার পূ প্রকাশ। অপ্রাকৃত-বিগ্রহ কৃষ্ণ এক কিন্তু অনন্তলীলার নিমিত্তে তিনি অনন্তরূপে প্রকাশিত হন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অংশী এবং অংশ অথবা কলা-রূপে তাঁহার প্রাভব ও বৈভব প্রকাশ অনন্ত।



[পরবর্তী পৃষ্ঠায় অনুবৃত্তি দ্রষ্টব্য ।]

বিলাস (অনুবৃত্তি)

- প্রাভব
  - ১ বাসুদেব (শপচগ) — মূর্তি ভেদে
    - ৫ কেশব (পশচগ) (অগ্রহায়ণ)
    - ৬ নারায়ণ (শপগচ) (পৌষ)
    - ৭ মাধব (গচশপ) (মাঘ)
  - ২ সঙ্কর্ষণ (গশপচ) — মূর্তি ভেদে
    - ৮ গোবিন্দ (চগপশ) (ফাল্গুন)
    - ৯ বিষ্ণু (শগপচ) (চৈত্র)
    - ১০ মধুসূদন (চশগপ) (বৈশাখ)
  - ৩ প্রদ্যুম্ন (শচগপ) — মূর্তি ভেদে
    - ১১ ত্রিবিক্রম (পগচশ) (জ্যৈষ্ঠ)
    - ১২ বামন (শচগপ) (আষাঢ়)
    - ১৩ শ্রীধর (পচগশ) (শ্রাবণ)
  - ৪ অনিরুদ্ধ (চগশপ) — মূর্তি ভেদে
    - ১৪ হৃষিকেশ (গচপশ) (ভাদ্র)
    - ১৫ পদ্মনাভ (শপচগ) (আশ্বিন)
    - ১৬ দামোদর (পচগশ) (কার্তিক)
- বৈভব
  - বাসুদেব
    - ১৭ অধোক্ষজ (পগশচ)
    - ১৮ পুরুষোত্তম (চপশগ)
  - সঙ্কর্ষণ
    - ১৯ উপেন্দ্র (শগচপ)
    - ২০ অচ্যুত (গপশচ)
  - প্রদ্যুম্ন
    - ২১ নৃসিংহ (চপগশ)
    - ২২ জনার্দন (পচগশ)
  - অনিরুদ্ধ
    - ২৩ হরি (শচপগ)
    - ২৪ কৃষ্ণ (শগপচ)

চৈতন্যচরিতামৃত- ২।২০)-অনুসারে প্রস্তুত এই তালিকায় ব্যবহৃত সঙ্কেত :—
[শ=শঙ্খ ; চ=চক্র ; গ=গদা ; প=পদ্ম] ।

কৃষ্ণ-স্বরূপ দ্বিবিধ — (ক) স্বয়ংরূপ (নন্দনন্দন); (খ) তদেকাত্মরূপ (ভাব-বেশ-কৃতিভেদে); (গ) আবেশরূপ (শক্ত্যাবেশ ; অবতাররূপে গণ্য)। স্বয়ংরূপের লাস দ্বিবিধ—প্রাভব (দ্বিভুজ কৃষ্ণ ; রাসে এবং মহিষী-বিবাহে বহুরূপ-কৃষ্ণ), ভব (চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ; বলরাম [৩৪])। তদেকাত্মরূপ দুই প্রকার — স্বাংশ অবতার-মণ্ডলী) এবং বিলাস। স্বাংশ-তদেকাত্মরূপ অর্থাৎ অবতার-মণ্ডলী নরায় পঞ্চ অবতারে (পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার ও াবতার) বিভক্ত। পুরুষাবতার আবার ত্রিবিধ—প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু); দ্বিতীয় পুরুষাবতার (গর্ভোদশায়ী হিরণ্যগর্ভ সহস্রশীর্ষ রুষ) এবং তৃতীয় পুরুষাবতার (অন্তর্যামী বিষ্ণু)। তদেকাত্মরূপের বিলাস দ্বিবিধ -প্রাভব ও বৈভব। প্রাভব বিলাসের আদি চতুর্ব্যূহ — (অ) বাসুদেব; (আ) সঙ্কর্ষণ;) প্রদ্যুম্ন ; (ঈ) অনিরুদ্ধ। এই আদি চতুর্ব্যূহের পুনরায় বিবিধ (প্রতি াভব-বিলাসে তিনটি করিয়া) মূর্তিভেদ বর্তমান। যথা, বাসুদেবের মূর্তিভেদ—শব, নারায়ণ ও মাধব ; সঙ্কর্ষণের মূর্তিভেদ — গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন ; প্রদ্যুম্নের র্তিভেদ—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ; এবং অনিরুদ্ধের মূর্তিভেদ—হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, মোদর। আদি চতুর্ব্যূহের প্রতি দেবতার বৈভবও দুইটি করিয়া। বাসুদেবের ভব — অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম ; সঙ্কর্ষণের বৈভব—উপেন্দ্র ও অচ্যুত। দ্যুম্নের বৈভব—নৃসিংহ ও জনার্দন। অনিরুদ্ধের বৈভব — হরি ও কৃষ্ণ। আবেশরূপ বিধ—সাক্ষাৎসঞ্চার-হেতু আবেশরূপকে মুখ্য আবেশরূপ এবং বিভূতিপ্রকাশ-নিমিত্ত াবেশরূপকে গৌণ আবেশরূপ বলে।

দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ দেবতা আদি চতুর্ব্যূহের বিভিন্ন মূর্তিভেদ মাত্র। যথা,—শাখ (মধুসূদন), জ্যৈষ্ঠ (ত্রিবিক্রম), আষাঢ় (বামন), শ্রাবণ (শ্রীধর), ভাদ্র হৃষিকেশ), আশ্বিন (পদ্মনাভ), কার্তিক (দামোদর), অগ্রহায়ণ (কেশব), পৌষ ারায়ণ), মাঘ (মাধব), ফাল্গুন (গোবিন্দ) ও চৈত্র (বিষ্ণু)।

নামভেদ ও অস্ত্রভেদ হেতু আদি চতুর্ব্যূহ ও তত্তৎ বিলাসের মোট সংখ্যা িদ্ধার্থসংহিতা'-র মতে চব্বিশটি ('হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র'-এর মতে ষোলটি)। প্রদত্ত লিকাটিতে অস্ত্রগুলির সঙ্কেতসহ (শ=শঙ্খ ; চ=চক্র ; গ=গদা ; প=পদ্ম) ই চতুর্বিংশতি বিলাস প্রদর্শিত হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতের (৫।১৭৫) অভিমতে চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ। হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি বাদিতাঃ ॥') কায়ব্যূহ নয়টি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ সিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা। আবেশরূপকে অবতারমণ্ডলীর অন্তর্গত ধরিলে

অবতারের মোট সংখ্যা হয় ছয়টি—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাব-
তার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবতার।

অবতারতত্ত্ব ঃ সাঙ্খ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা। কিন্তু প্রকৃত
পক্ষে জড়প্রকৃতি সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ হইতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রকৃ
কারণ রূপে গণ্য হয়। জড় প্রকৃতি গৌণ উপাদান কারণ, ঈশ্বরই সৃষ্টির মূ
(নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই) কারণ। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শ
প্রধান—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। স্বরূপে স্থিত বলিয়া এবং অন্তর
লীলা-বিলাসের সহায়ক বলিয়া চিৎশক্তি স্বরূপশক্তি ও অন্তরঙ্গা শক্তি না
অভিহিত হয়। মায়াশক্তির দুই বৃত্তি—গুণমায়া, অর্থাৎ, ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব, রজ
তমঃ) প্রকৃতি—সৃষ্টির গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া, অর্থাৎ, মায়া
জীবশক্তি—সৃষ্টির গৌণ নিমিত্ত-কারণ।

ভাগবতে (২।৫।২০-৩২ ; ৩।২০।১৪-১৫ ; ৩।২৬।৫০) বর্ণিত ..ষ্টিতত্ত্বটি হই
এইরূপ ঃ সৃষ্টি ত্রিবিধ—(ক) প্রাকৃত বা মায়িক সৃষ্টি (ব্রহ্মাণ্ডাদি), (খ) অপ্রাকৃ
বা চিন্ময়ী সৃষ্টি (বৈকুণ্ঠাদি) এবং (গ) জীবসৃষ্টি। কাল, কর্ম, মায়া বা প্রকৃ
জীব (=চিৎকণ) এবং ঈশ্বর (=চিৎবস্তু),—এই পাঁচটি হইল আদি বা প্র
পুরুষের (=কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু) বিভূতি। মহাবিষ্ণু প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করি
প্রকৃতি সৃষ্টিশীলা হইল। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারে
সৃষ্টি। অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কারে
বিকার হইল,—মন এবং দশেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দশদেবতা। রাজসিক অহঙ্কারের বিক
হইল,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। তামসিক অহঙ্কারের বিক
হইল,—পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এবং পঞ্চ মহাভূত (ব্যো
মরুৎ, তেজ, অপ্, ক্ষিতি)। মহাবিষ্ণু স্বীয় সংহতি-শক্তির প্রভাবে মহত
বিকারগুলিকে সংহত করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর, তি
স্বীয় স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্ধ সমূহকে পূর্ণ করিয়া ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ভ দ্বিতীয় পুরুষরূ
অবস্থান করিলেন। তৎপরে, শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মা (সৃজনার্থ), বিষ্ণু (পালনার্থ) ও
(সংহারার্থ),—এই ত্রিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিলেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হই
শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পুরুষ বা অন্তর্যামীরূপে প্রতি জীবের মধ্যে অবস্থান করিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব-আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপের স্বাংশভূত অবতারমণ্ডলীর ক
আসিয়া পড়ে। এই অবতারমণ্ডলী সংখ্যায় পাঁচটি—

(ক) **পুরুষাবতার**—অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ নিজ চিচ্ছক্তির

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় (যদিও চিচ্ছক্তি নিত্য এবং অসৃজ্য) গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সৃষ্টি করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি বলরাম ; বলরামের এক স্বরূপ হইল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ বা কলা হইল কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু। জড়প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ নহে। সৃষ্টির জন্য পরব্যোমস্থিত সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির প্রতি অবলোকন করেন। তিনিই প্রথম পুরুষ ; এই পুরুষ জগৎকারণ, বিরজা-বা-কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু নামে আখ্যাত। এই কারণ-সমুদ্রের একপারে মায়ার নিত্য অধিকার, অপর পারে পরব্যোম—সেখানে মায়ার কোন অধিকার নাই। এই পরব্যোমেরও উপরিস্থিত হইল কৃষ্ণলোক। সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব, অর্থাৎ, আধার-শক্তিধামরূপে অভিহিত কৃষ্ণস্বরূপের ধামের নাম—কৃষ্ণলোক। অভিব্যক্তি অনুসারে কৃষ্ণলোক ত্রিবিধ (দ্বারকা, মথুরা, গোকুল) হইলেও গোকুল বা বৃন্দাবন তন্মধ্যে মাধুর্য-প্রধান বলিয়া শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে স্বয়ংরূপে অর্থাৎ নন্দনন্দন-রূপে স্থিত। কৃষ্ণলোকের নিম্নে পরব্যোম —ইহার অধীশ্বর নারায়ণ। এই পরব্যোমের অন্তর্গত জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক নামক এক ধামে শঙ্করাচার্য-প্রোক্ত অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মের স্থিতি—ইহাই ব্রহ্মলোক। পরব্যোম বিরজা-(=কারণ-সমুদ্র)-দ্বারা বেষ্টিত। বিরজার অপর পারে মায়া-শক্তির প্রকাশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বসৃষ্টির প্রধান উপাদান মায়া। কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু কৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার ; দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইল ক্ষীরোদশায়ী সহস্রশীর্ষ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষাবতার হইল জীবান্তর্যামী বিষ্ণু।

(খ) **লীলাবতার**—শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার অসংখ্য। তন্মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি দশটি প্রধান অবতার।

(গ) **গুণাবতার**—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার তিনটি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের রজোগুণান্বিত সৃষ্টিকারী রূপ। ভক্তিযুক্ত কোন যোগ্য ব্যক্তিকে রজোগুণ-প্রভাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্মা' করেন, তদভাবে তিনি স্বয়ং আপন-অংশে ব্রহ্মা-রূপী হন। পালনার্থে শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বগুণাশ্রয়ী রূপ বিষ্ণু। এই বিষ্ণু অংশ, শ্রীকৃষ্ণ অংশী। শ্রীকৃষ্ণই তমোগুণান্বিত হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করেন। একাদশ রুদ্র স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন না হইলেও বিভিন্ন রূপক্রমে পৃথক্। রুদ্র শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত এবং গুণাতীত। সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক-এই ত্রিবিধ প্রাকৃত-অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শিব—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণ-বিশিষ্ট। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির প্রভু, সর্বদ্রষ্টা, সর্বসাক্ষী।

(ঘ) **মন্বন্তরাবতার**—মন্বন্তরাবতার অসংখ্য। ব্রহ্মার ১ দিন=১৪ মন্বন্তর ; প্রতি মন্বন্তরে ১টি অবতার ; ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বৎসর। এই হিসাবে ১টি ব্রহ্মাণ্ডে

১×১৪×৩০×১২×১০০=৫০৪০০০ অবতার। এইরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অবতারের সংখ্যাও অসংখ্য। চতুর্দশ মন্বন্তরের (অত্র বন্ধনীর মধ্যে লিখিত) চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার হইল, যথাক্রমে—যজ্ঞ (স্বায়ম্ভুব), বিভু (স্বারোচিষ), সত্যসেন (ঔত্তম), হরি (তামস), বৈকুণ্ঠ (রৈবত), অজিত (চাক্ষুষ), বামন (বৈবস্বত), সার্বভৌম (সাবর্ণ), ঋষভ (দক্ষসাবর্ণ), বিষ্বক্‌সেন (ব্রহ্মসাবর্ণ), ধর্মসেতু (ধর্মসাবর্ণ), সুধাম (রুদ্রসাবর্ণ), যোগেশ্বর (দেবসাবর্ণ), বৃহদ্ভানু (ইন্দ্রসাবর্ণ)।

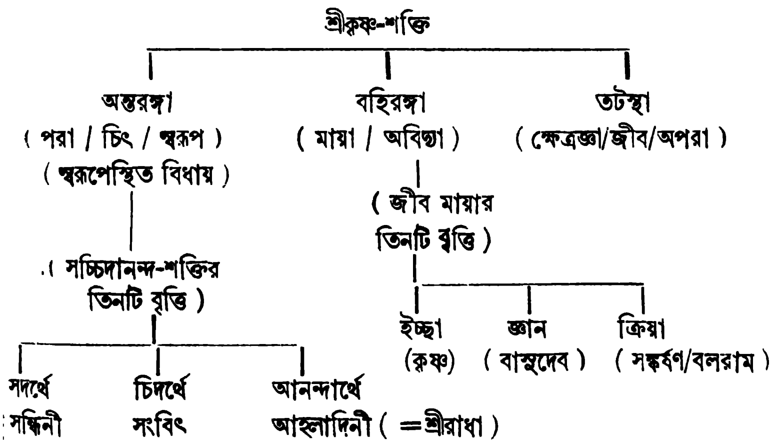
(ঙ) **যুগাবতার**—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন এবং চারি যুগের যুগধর্ম বিভিন্ন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিজন স্বরূপ ও তাঁহার লক্ষণ বিচার করিয়া অবতার-নির্ণয় করেন। সত্য যুগে ভগবান শুক্লমূর্তি, চতুর্হস্ত, জটিল, বল্কলাম্বর, কৃষ্ণাজিন-উপবীত-রুদ্রাক্ষমালা-দণ্ড-কমণ্ডলুধারী; সত্যযুগের যুগধর্ম ধ্যান বা তপস্যা। ত্রেতায় ভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্হস্ত, ত্রিমেখলাধারী, পিঙ্গলকেশ, বেদত্রয় (ঋক্-যজুঃ-সাম)-ময় দেহ, মাল্য ও যজ্ঞের পাত্রধারী; ত্রেতায় যুগধর্ম—যাগযজ্ঞ। দ্বাপরে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রধারী, কৌস্তুভাদি চিহ্নযুক্ত; দ্বাপরে যুগধর্ম—পরিচর্যা, কৃষ্ণার্চন। কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণ; যুগধর্ম—নামযজ্ঞ। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥'—ভাগবত (১০।৮।১৩; ১২।৩।৫২)।

শক্ত্যাবতার—উপরিলিখিত পাঁচটি অবতার শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ অবতারমণ্ডলীর অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের আবেশরূপকে (শক্ত্যাবেশ) এই অবতারমণ্ডলীর অন্তর্গত ধরিলে অবতারের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবতার। নিজশক্তির অংশ লইয়া ভগবান যে-জীবের মধ্যে আবিষ্ট হন, সেই শ্রেষ্ঠ জীবকে আবেশ-অবতার বলে। আবেশ-অবতার দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ-শক্তি সঞ্চার করিয়া তিনি আবির্ভূত হন, তাঁহারা মুখ্য আবেশ-অবতার [যথা, সনক (জ্ঞানশক্তি), ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি), নারদ (ভক্তিশক্তি) প্রভৃতি]। যাঁহাদের মধ্যে ভগবানের শক্তি বিভূতি-রূপে প্রকাশিত, তাঁহারা গৌণ আবেশ-অবতার।

স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন নন্দনন্দন। বাল্য-পৌগণ্ডাদি নানা বয়স সত্ত্বেও ভগবান কৃষ্ণকিশোর রূপেই বৃন্দাবনে নিত্যলীলায় বিভোর। 'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥' —(পদ্যাবলী, ৮২; চৈতন্যচরিতামৃত-(২।১৯)-ধৃত মহাপ্রভুর প্রতি ত্রিহুতী পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়

উক্তি)। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত। তৎসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডও অনন্ত। এই লীলা নিত্য, লীলার আনন্দেই সৃষ্টি ('সৃষ্টাদিকং হরিনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্তনম্।' —গোবিন্দভাষ্য (২।১।৩৩) এবং সৃষ্টিলীলাতে বহির্মুখ জীবের প্রতি তাঁহার করুণা প্রকাশিত। গ্রহাদিগণ যেমন স্ব-স্ব অক্ষপথে নিত্য ঘূর্ণায়মান, শ্রীকৃষ্ণলীলাও তেমনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-লীলামণ্ডলে নিত্য ঘটমান। গোলোকে তাঁহার নিত্য বিহার, ব্রহ্মাণ্ড সমূহে প্রাকট্য বিহার এবং দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে যথাক্রমে তাঁহার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ।[৩৬]

কৃষ্ণশক্তিতত্ত্বঃ অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের তিনটি প্রধান শক্তি—(ক) অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি বা পরা শক্তি, (খ) বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া শক্তি বা অবিদ্যা শক্তি, (গ) তটস্থা শক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি বা জীবশক্তি বা অপরা শক্তি। সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ-শক্তির তিনটি বৃত্তি—সদর্থে সন্ধিনী, চিদর্থে সংবিৎ এবং আনন্দার্থে আহ্লাদিনী। শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি বৃত্তি-অনুসারে ত্রিবিধ—ইচ্ছা (অধিকর্তা—কৃষ্ণ), জ্ঞান (অধিকর্তা—বাসুদেব) এবং ক্রিয়া (অধিকর্তা—সঙ্কর্ষণ / বলরাম)।



অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি স্বপ্রকাশ। যে-বৃত্তির দ্বারা আহ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিতাত্মিকা চিৎশক্তির অধিষ্ঠাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অথবা কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত হন, সেই বৃত্তি বিশেষকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে। এই শুদ্ধসত্ত্ব-বৃত্তি মায়ারহিত এবং সন্ধিনী, সংবিৎ ও আহ্লাদিনী শক্তির অনুক্রমিক প্রাধান্য অনুসারে আধারশক্তি, আত্মবিদ্যা (জ্ঞান ও তৎ-প্রবর্তক) এবং গুহ্যবিদ্যা (ভক্তি ও তৎপ্রবর্তক) নামে অভিহিত হয়। এই তিন শক্তি সমভাবে স্থিত হইলে অমূর্ত অবস্থায় শুদ্ধসত্ত্ব এবং মূর্ত অবস্থায় ভগবদ্বিগ্রহ রূপে

প্রকাশিত হয়। শ্রীরাধিকা আহ্লাদিনী শক্তির মূর্তবিগ্রহ। চিৎশক্তির অপর মূর্তবিগ্রহের নাম যোগমায়া, ইনি প্রকট লীলা-সহায়িকা। শ্রীকৃষ্ণের অপরা বা মায়া শক্তির দুইটি বৃত্তি—গুণমায়া এবং জীবমায়া। যোগমায়া কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। জীবমায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি। যোগমায়া চিন্ময় ভগবদ্ধামে লীলা পরিপুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরিকর-গণের মুগ্ধতা জন্মায়। পক্ষান্তরে জীবমায়া প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়াশীলা, প্রকৃতির বাহিরে তাহার কোন অধিকার নাই (ভগবৎসন্দর্ভ)। বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের এই তিন শক্তিকে যথাক্রমে পরা, অপরা এবং জীব শক্তি বলা হইয়াছে। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ প্রকৃতির উল্লেখ আছে, পরা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি এবং অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি। 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥'—বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১) ; 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥'—গীতা (৭।৫)। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্বাশ্রয়, সুখদুঃখাদি গুণবর্জিত। তিনি সন্ধিনী-সংবিৎ-আহ্লাদিনী-আত্মক স্বরূপশক্তির আধার। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, জীব মায়াবৃত হইয়া দুঃখসমূহকে ভোগ করে। 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরা মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥'—বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯) ; 'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥'—ভগবৎসন্দর্ভে ভাবার্থদীপিকা-ধৃত বিষ্ণুস্বামীবচন (১।৭।৬)।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ॥ জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ ঃ শঙ্করাচার্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৩।১৪) 'ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বীশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়, সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়', 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি'। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, জীবসত্তা মায়িক। বিবর্তবাদী শঙ্করাচার্য সমগ্র সৃষ্টি তত্ত্বকে মায়িক বা প্রাতিভাসিক সত্তা বলিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। শঙ্করাচার্য 'অহম্ ব্রহ্ম অস্মি' (যজুঃ। বৃহদারণ্যক) এই মহা-বাক্যে বিশ্বাসী কিন্তু চৈতন্যদেব শঙ্করাচার্যের এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলেন। তাঁহার মতে জীবে কৃষ্ণের ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি প্রকাশিত। কারণ, সৃষ্টি কৃষ্ণের অবিদ্যা বা মায়া শক্তির প্রকাশ। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস ('জীবশক্তি-বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশ'। —পরমাত্মসন্দর্ভ, ৩৯)। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের অংশ বলিয়া চিৎকণিকা স্বরূপ ('জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।'—ভাগবত (১০।৮৭।৩০)। স্বরূপত্বের দিক হইতে বিচার করিলে জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক

ন্নাভিন্ন ('কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।'—চৈতন্যচরিতামৃত (২।২০)।
ই ভিন্নাভিন্নত্ব অচিন্ত্য। দেহাত্মবোধের জন্যই জীব ও ব্রহ্মে অভিন্নতা-জ্ঞান হয়।
ীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, অদ্বৈতবাদীদের এই মত ভাগবতে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত
ইয়াছে। জীব যদি নিত্য, অপরিমিত ও সর্বব্যাপী হয়, তবে সে নিজেই নিজের
ভু হয়, তাহার আর কেহ কর্তা থাকে না। 'অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি
্গতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব! নেতরথা। অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য
ন্তৃ ভবেৎ, সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥'—ভাগবত (১০।৮৭।৩০)।

জীবের দেহাত্মবুদ্ধি দৈবীমায়া-সঞ্জাত। এই মায়া দূর হয় না, 'দৈবী হ্যেষা
ণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'—গীতা
৭।১৪)। জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। কারণ, জীব কৃষ্ণমুখী হইলে কৃষ্ণের
ন্তরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বহির্মুখী হইলে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির নিয়ন্ত্রণে
াসে। জীব স্বভাবতঃই বহির্মুখী, অন্তর্মুখী হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন।
ঙ্করাচার্য যজুর্বেদীয় একটি বাক্যকে মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও যথার্থ
হে। বেদের কোন একদেশিক বাক্য মহাবাক্য হইতে পারে না। ভাগবতে
প্রণব' (ওঁ) মহাবাক্য বলিয়া পরিগৃহীত। বেদান্তসূত্রকার স্বয়ং ব্যাসদেব পরিণাম-
াদকে (ঈশ্বরের জীবে পরিণতি) সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত
লিয়া যে-বিবর্তবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বৈষ্ণব আচার্যগণ তাহা স্বীকার করেন
া। তাঁহাদের মতে স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির পরিণাম, জীবেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ
রমাত্মারূপে পরিণত। 'ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে
ুলিঙ্গের কণ॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (১।৭)। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক স্বরূপ নহে,
ংশ স্বরূপমাত্র। জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান। স্বতঃপ্রমাণ বেদের অভিধা-
ত্তি (মুখ্যার্থ প্রকাশক) পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-বৃত্তি (গৌণার্থ প্রকাশক) গ্রহণই
ঙ্করাচার্যের বিপত্তির কারণ। ব্রহ্ম কেবল বৃহৎবস্তু নহে ('বৃংহতি'), তিনি বৃহৎও
রেন ('বৃংহয়তি')। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অমূর্ত, অব্যক্তশক্তিক ; শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত, ব্যক্তশক্তিক
বং পূর্ণ ভগবান। 'বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
রূপ ঐশ্বর্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান সম্বন্ধ। তারে নির্বিশেষ
হি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥'—চৈতন্যচরিতামৃত
১।৭)। বৈষ্ণবাচার্যগণ বেদান্তসূত্রব্যাখ্যানে পরিণামবাদকে সমর্থন করেন।[৩৭]

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপের সম্পর্ক : 'ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ
ভগবান্ স স্বয়ময়ম্'—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ ভগবান। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য, তাঁহার বৈভবও অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ ত্র্যধীশ্বর, অর্থাৎ, তি
গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা—এই তিনধামের অধীশ্বর। প্রকৃতি ও পরব্যো
মধ্যবাহিনী বিরজার পারস্থিত কৃষ্ণলোকে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাগের তিনভাগ ঐ
বর্তমান। সেই পরমধামের ব্যাপকতাও যেমনি, শোভাও তেমনি অনন্ত। শ্রী
এই পরমধামে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ রূপে বিরাজমান।—'প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥ তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্
সনাতনমমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥'—লঘুভাগবতামৃত (৫।২৪৭।২৪৮
শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের চারিভাগের একভাগ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত। শ্রীকৃষ্ণের আবাস
তিন—গোলোক-বৃন্দাবন (উত্তম), পরব্যোম (মধ্যম) এবং দেবীধাম বা মা
ব্রহ্মাণ্ড (বাহ্য)। গোলোক-বৃন্দাবন অর্থে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই ত্রিধামকে
বোঝায়। গোকুলের (=বৃন্দাবন) বৈভব-বিশেষ গোলোক বলিয়া গোলোক-বৃন্দা
বলা হইয়াছে। আপন যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলীল
উপযোগী যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার যেমনি ঐশ্বর্য, তেমনি মাধুর্য
'যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য
সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥'—ভাগবত (৩।২।১২)। এই মাধুর্যে লক্ষ্মী
মহিষীগণ এবং ব্রজগোপীগণ আকৃষ্ট হইলেন। 'কর্ম জপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপোধ্যা
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ। কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, তারে কৃষ্ণ-মা
সুলভ॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (২।২১)। কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ ('ওঁ কামদেবায় বিদ্ম
পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ') কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য মধুর হইতেও সুমধুর
'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মৃদুস্মি
মেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥'—কৃষ্ণকর্ণামৃত (৯২) [তুলনীয়— 'ম
তোমার শেষ যে না পাই।'—রবীন্দ্রনাথ]।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সবিগ্রহ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বিশ্ব
করেন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে 'স্বয়ংরূপ'। বৃন্দাবনে
মাধুর্যলীলা এবং মথুরা ও দ্বারাবতীতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-প্রধান লীলা প্রকটিত
কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ বিধিমার্গে লভ্য, তাঁহার মাধুর্য রাগমার্গলভ্য। ব্রজভা
রাগাত্মিকা। কিন্তু চৈতন্যভাবনায় কৃষ্ণ যুগপৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত। রাগানু
ভাবনায় বৃন্দাবনের অবিমিশ্র মাধুর্যের অনুসরণ আছে বটে, তবে, রাগানুগার বৈশি
হইল ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের নিত্য-সম্বন্ধ। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমভক্তি-ধর্মের ইহাই
কথা। 'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি' একথাও যেমনি সত্য 'ঐ
শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত'—একথাও তেমনি সত্য।[৩৮]

॥ সম্বন্ধ ঃ অভিধেয় ঃ প্রেম-প্রয়োজন ॥

সম্বন্ধ (ঐশ্বর্য ও মাধুর্য) ঃ সমগ্র বেদান্তসূত্রের প্রতিপাদিত বিষয় হইল তিনটি—(ক) শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ; (খ) অভিধেয় বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি ; (গ) প্রেম-প্রয়োজন। সম্বন্ধতত্ত্ব বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের এবং জীব ও কৃষ্ণের সম্পর্ককে বুঝায়। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ, বিশ্বরূপ (গীতার বিশ্বরূপদর্শন-যোগে ব্যাখ্যাত), বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়, সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, পরমপুরুষ 'ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে,' 'মহাবিশ্বে, মহাকাশে' আপন ঐশ্বর্যে নিত্য প্রকাশিত। ব্রহ্মা, রুদ্র, লোকপালাদি সকলেই তাঁহার অংশ বা কলা, যোগমায়া তাঁহার লীলাসহায়িকা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্যরূপও অপার অমৃতের সিন্ধু। তাঁহার ঐশ্বর্য-মূর্তির সম্যক্ ধারণা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। মাধুর্যময় প্রেমের দ্বারাই তাহাকে কিঞ্চিৎ বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য নিত্য-সম্বন্ধিত এবং তাঁহাতে পূর্ণতম ভাবে বিরাজিত ; তথাপি, উভয়ের মধ্যে মাধুর্য-ভাবেরই প্রাধান্য। ঐশ্বর্যভাবও মাধুর্যভাবকে অনুসরণ করে। বৈষ্ণবসাধনা মাধুর্যভাবেরই সাধনা।

সম্বন্ধ (জীব ও কৃষ্ণ) ঃ জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধিত, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়, জীব চিৎকণ। স্বরূপত্বের দিক হইতে জীব ও কৃষ্ণের সম্পর্ক যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। জীব দুই শ্রেণীর — নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীব সদা কৃষ্ণোন্মুখ কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীব বহির্মুখ, ত্রিতাপজারিত। সমগ্র সৃষ্টি (চিন্ময়ী, মায়িক ও জৈব), স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ। অন্তর্যামীরূপে সর্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন—'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিত-রতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ। তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥'—ভাগবত (১।১।১)।

শ্রীকৃষ্ণ স্রষ্টা অথচ সৃষ্টি হইতে পৃথক। তিনি অদ্বিতীয়, অথচ, সমগ্র চরাচর তাঁহার মধ্যে বিধৃত—'নাতঃপরং পরমযদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ। পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি' ॥—ভাগবত (৩।৯।৩)।

অপ্রাকৃতদেহী (সবিগ্রহ) জ্ঞানবিজ্ঞান-সমন্বিত ষড়ৈশ্বর্যশক্তিময় ভগবত্তত্ত্ব যেমন পরমরহস্যময়, সৃষ্টিতত্ত্বও তেমনি নিগূঢ়—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥'—গীতা (৯।১১)। 'ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥'—ভাগবত (৩।৫।২৩)। মায়াধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়াধীন জীবের নিত্য-সম্বন্ধ।

অভিধেয় তত্ত্ব : শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণই একশরণ। শ্রীকৃষ্ণের অংশ-ভূত মায়াবদ্ধজীব এই তিনটি উপায়ে মায়ামুক্ত হইতে পারে,—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে ভক্তি, 'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান'। অভিধেয় অর্থে শাস্ত্রের বাচ্য—'অভিধীয়তে অনেন ইতি'। কর্ম, যোগ, জ্ঞান সমস্তই ভক্তির অধীন ; অর্থাৎ কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের স্বতঃসার্থকতা নাই, ভক্তিশুদ্ধ না হইলে ইহারা সার্থকতা লাভ করে না। 'ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্মযোগজ্ঞান'। অপিচ, 'নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥'—ভাগবত (১।৫।১২)।

ভক্তি ব্যতীত মায়াস্পর্শশূন্য-ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। অথচ, ভক্তি জ্ঞান-ব্যতিরেকেই মুক্তিদান করে। বর্ণাশ্রম-ধর্মও সার্থকতার নিমিত্ত ভক্তির অপেক্ষা করে। জ্ঞানমার্গের উপাস্য—নির্বিশেষ অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম, লক্ষ্য—সাযুজ্য মুক্তি (ব্রহ্ম-সাযুজ্য অথবা ঈশ্বর-সাযুজ্য)। এই সাযুজ্য মুক্তিও ভক্তির অপেক্ষা রাখে। কারণ, সাযুজ্যে ব্রহ্ম-ঐক্য হয়, যাহা সেব্য-সেবকত্বভাবের প্রতিকূল ('সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাহে ব্রহ্ম ঐক্য')। যোগমার্গের উপাস্য—অন্তর্যামী পরমাত্মা, লক্ষ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ-সাধন। ইহাও সেব্য-সেবকভাবের পরিপন্থী। ভক্তিমার্গই সেব্য-সেবকভাবের অনুকূল এবং অন্যাপেক্ষী নহে বলিয়া শ্রেষ্ঠ—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'।—ভাগবত (১১।১৪।২১)। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥'—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (১।১।৯)। ভক্তি অর্থে কৃষ্ণ-নির্ভরতা—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥'—গীতা (১৮।৬৫)।

শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তি ('পূজ্যেষু অনুরাগঃ ভক্তিঃ') জন্মে না। এই শ্রদ্ধার তার-তম্যে ভক্তও ত্রিবিধ (ভাগবত, ১১।৪৫-৪৭ দ্রষ্টব্য)—উত্তম (যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠিত), মধ্যম (শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, অথচ, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান), প্রাকৃত (যাহার শ্রদ্ধা দৃঢ় নহে)। অভিধেয় অর্থাৎ ভক্তির লক্ষণ হইল—কৃষ্ণে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, শরণগ্রহণ ও আত্মনিবেদন ('সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ')। ভক্তি দ্বিবিধ—বিধিভক্তি ও রাগভক্তি। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রবল, রাগভক্তিতে মাধুর্য। শাস্ত্রশাসিত বৈধীভক্তিতে 'ব্রজভাব' নাই, রাগভক্তির ব্রজভাবই প্রাণ। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল মানসিকতায়।

বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণপ্রেম হইল সাধ্যভক্তি। এই সাধ্যভক্তির নিমিত্ত যে-সাধনা,

তাহা হইল সাধনভক্তি। সাধনভক্তির দুইটি লক্ষণ—স্বরূপ (শ্রবণ-কীর্তনাদি ক্রিয়া) এবং তটস্থ (প্রেমভক্তি)। ভক্তির দ্বিবিধ বিভাগ অনুসারে সাধনও দ্বিবিধ—বৈধী-ভক্তি-সাধন ও রাগময়ী ভক্তি-সাধন। বৈধী সাধনভক্তির ৬৪টি অঙ্গ—গুরু-পদাশ্রয়াদি দশটি গ্রহণাত্মক, নামাপরাধাদি দশটি বর্জনাত্মক এবং শ্রবণকীর্তনাদি চুয়াল্লিশটি উন্মেষক।[৩৯] বিধিমার্গে ভজনার ফল হইল বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

রাগময়ী ভক্তি মাধুর্যপ্রধান এবং ব্রজভাবই ইহার লক্ষ্য। সাধ্যসাধনতত্ত্ব-নির্ণয়ে (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮) এই ভক্তির অনুক্রম-অনুসারে (স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে ফলার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি এবং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবাশ্রয়ী প্রেমভক্তি)।[৪০] কান্তা প্রেমকে 'সর্বসাধ্যসার' এবং রাধাপ্রেমকে 'সাধ্য শিরোমণি' বলা হইয়াছে। দ্বৈতবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধনভক্তি-বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধনভক্তি হইল —স্বধর্মনিষ্ঠা, কৃষ্ণে কর্মার্পণ এবং পরিণতি হইল মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সাধ্য হইল—কৃষ্ণপ্রেম। সাধনভক্তি হইল নববিধ (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। ভাগবত, ৭।৫।২৩-২৪)। ইহাদের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্তির সশ্রদ্ধ সেবা—এই পঞ্চাঙ্গই প্রধান এবং ইহাদের যে-কোন একটির দ্বারাই কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণই হইল ভক্তির লক্ষণ এবং মূল লক্ষ্য হইল 'পঞ্চম-পুরুষার্থ' কৃষ্ণপ্রেম। মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাসী কিন্তু জ্ঞান ও কর্মবাদী। (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৯-এ শৃঙ্গেরি মঠে মাধ্ব-সম্প্রদায়ীগণের সহিত চৈতন্যদেবের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। রাগময়ী ভক্তি-সাধন দ্বিবিধ—বাহ্য সাধন (শ্রবণ-কীর্তনাদি) এবং অন্তরঙ্গ সাধন (কৃষ্ণের মানস-সেবা)। রাগময়ী ভক্তি দ্বিধা বিভক্ত—রাগাত্মিকা ও রাগানুগা। অভীষ্ট বস্তুতে আবিষ্টতাজাত যে-ভক্তি, তাহা রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকার স্বরূপ লক্ষণ—ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা এবং তটস্থ লক্ষণ—ইষ্টে আবিষ্টতা ('ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।'—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।২।১৩১)। রাগা-ত্মিকার অনুসারী 'সভক্তিশ্রিয় উন্নতোজ্জ্বলরস'-যুক্ত যে-ভক্তি তাহা রাগানুগা-ভক্তি ('রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে'। —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।২।১৩০) স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই, আনুগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার। সিদ্ধদেহ ব্যতীত সাক্ষাৎ সেবা হয় না, জড়দেহী জীব গুরুর উপদেশ-অনুসারে মানস-সিদ্ধ দেহে কৃষ্ণসেবা করে। রাগানুগা ভক্তি-সাধনে এই মানস-সেবাই মুখ্য। রাগানুগা ভক্তির সাধনাঙ্গ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আন্তর। ভক্ত ব্রজ-

বাসীদের অনুসরণে সাধকরূপে নিজদেহের দ্বারা (বাহ্য সাধন) এবং সিদ্ধরূপে মানসে (আন্তর সাধন) কৃষ্ণসেবা করে। রাগানুগা ভক্তি-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি রতি ও দাস্য-সখ্যাদি ভাবযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে তাবৎ বিধির সার হইল কৃষ্ণ-স্মৃতি এবং সকল নিষেধের সার হইল কৃষ্ণ-বিস্মৃতি—'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্তব্যো ন জাতু চিৎ। সর্বে বিধি নিষেধাঃ স্যুয়েতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥'—পদ্মপুরাণ (৭২।১০০)। অনাসঙ্গ, অর্থাৎ, সাক্ষাৎসেবার প্রবৃত্তি ব্যতীত ভজনে যেমন ভক্তির উদয় না, তেমনি ভুক্তি, সিদ্ধি এবং মুক্তির কামনা থাকিলেও হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হয় না—'ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥' —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৫)। হরিভক্তি-বিলাসেও (৫।৩৪) বলা হইয়াছে—'ভূতশুদ্ধি', অর্থাৎ, নিজ-নিজ ভাবানুসারে আসঙ্গ-ভজন ব্যতীত জপ-হোমাদি ক্রিয়াও ব্যর্থ হইয়া যায়।[৪১]

ভক্তি ও মুক্তি : ভক্তি সর্বজন-দেশ-কালাতিশয়ী। ভক্ত নিখিলের মধ্যে কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণের মধ্যে নিখিলকে অনুভব করে। আত্মারাম মুনিগণ শ্রীভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি নিবেদন করেন[৪২] এবং মুক্ত পুরুষেরাও ভক্তিবলে স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত-দেহ হইয়া ভক্তরূপে কৃষ্ণভজনা করেন। ভক্ত বর্গশ্রেষ্ঠ মুক্তিপদপ্রার্থী নহে। রূঢ় বৃত্তিতে[৪৩] 'মুক্তি' শব্দ (মুক্তি পদে যাঁহার) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও ভক্ত 'মুক্তি' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উহা পরিত্যাগ করে। পঞ্চবিধ মুক্তি (সারূপ্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সালোক্য-সাযুজ্য) ভক্তের নিকট 'কৈতবপ্রধান, যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান'। 'সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥'—ভাগবত (৩।২।১৩)। ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইল—কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেমই 'পঞ্চম পুরুষার্থ'। গুরু-কৃপালব্ধ আত্মজ্ঞানের দ্বারা মায়া অপাবৃত হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। গুরু হইলেন সাধনভক্তি-পথের প্রদর্শক। চৈতন্য-চরিতামৃতে (২।২৪) মহাপ্রভু সনাতনকে বৈষ্ণবস্মৃতি-রচনা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা দিয়াছিলেন—'সর্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ। সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র-বিচারণ ॥ মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্র সিদ্ধ্যাদি-শোধন। দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদিবন্দন। গুরুসেবা ঊর্ধ্বপুণ্ড্রচক্রাদি ধারণ ॥ গোপীচন্দন, মালাধৃতি, তুলসী আহরণ। বস্ত্রপীঠ, গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন। পঞ্চকাল পূজা আরতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন ॥ শ্রীমূর্তি-লক্ষণ আর শালগ্রাম-লক্ষণ। কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্তি-দরশন ॥ নাম-মহিমা, নামাপরাধ, দূরেতে বর্জন।

বৈষ্ণব-লক্ষণ সেবা-অপরাধ খণ্ডন ॥ শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ। জপ, স্তুতি পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ পুরশ্চরণ-বিধি কৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন। অনিবেদ্য-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি বর্জন। সাধুলক্ষণ-সাধুসঙ্গ-সাধুর সেবন। অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ। মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥ একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন-দ্বাদশী। শ্রীরাম-নবমী আর নৃসিংহ-চতুর্দশী ॥ এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধাকরণ। অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলম্ভন ॥ সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন। শ্রীমূর্তি বিষ্ণুমন্দির-করণ লক্ষণ ॥ সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব-আচার। কর্তব্যাকর্তব্য সব স্মার্ত ব্যবহার ।। এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।'

মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই হিসাবে তাঁহাকে সনাতনের 'শিক্ষাগুরু' বলা যায়। বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে কৃষ্ণ গুরুশক্তির মূল আশ্রয়। কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবকে শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ধারণা হইতেই গুরুবাদের (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু) প্রচলন হয়। ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই মহাভাগবত ব্রাহ্মণ,গুরু ও ভগবান অভিন্ন—'মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্'। —হরিভক্তিবিলাস; 'প্রভোর্য প্রিয়ঃ।'—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (গুর্বাষ্টক); 'শুদ্ধ-ভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।' —ভক্তিসন্দর্ভ। এই প্রসঙ্গে অযোগ্য, শাস্ত্রবিরুদ্ধবাদী এবং উন্মার্গী গুরুকে পরিত্যাগের কথাও বলা হইয়াছে—'যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে' ॥—ভক্তিসন্দর্ভ (২৩৮)।

ধর্ম দ্বিবিধ—আত্মধর্ম ও অনাত্মধর্ম। বেদধর্ম, লোকধর্ম, দেহধর্মাদি অনাত্মধর্ম। অবস্থা বিশেষে আত্মসুখ তাৎপর্যময় এই অনাত্মধর্ম বর্জনীয়। কিন্তু সামান্য সদাচার ও বৈষ্ণবাচার পালনীয়, নতুবা, আত্মধর্ম পালন করা যায় না। বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রণয়নে সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর এই উপদেশ ছিল।

প্রেম-প্রয়োজন : চৈতন্যদেব রূপগোস্বামীকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৯,২৩), যাহার ফলশ্রুতি হইল 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ-প্রণয়ন। ভক্তি স্বরূপতঃ আহ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। ভক্তি স্বতঃস্বাদ্য। শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তির সার হইল ভাব। ভাবের স্বরূপ লক্ষণ হইল—শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা এবং তটস্থ লক্ষণ হইল—রুচির দ্বারা চিত্তমার্জনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে যথাক্রমে জন্মলাভ

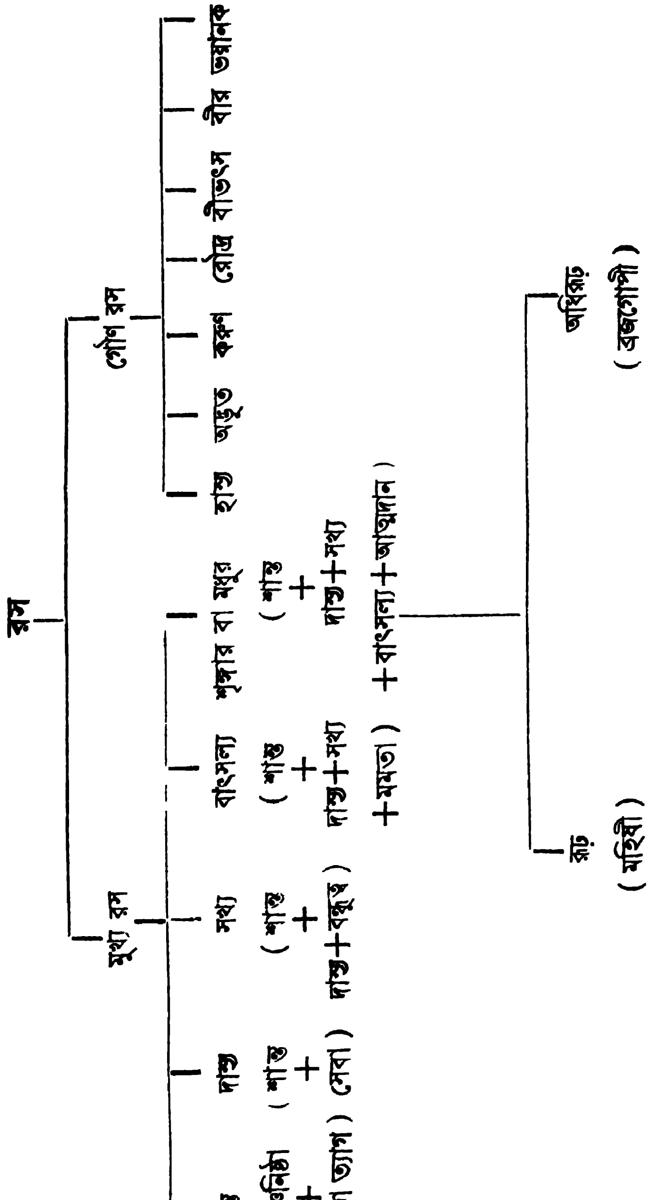
করে—সাধুসঙ্গ,ভজন,বিঘ্ননাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম। এইগুলিই হইল প্রেম-প্রয়োজনের ক্রম—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া, ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি, সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥'—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১১)। সাধুসঙ্গ, অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্ত (=কৃষ্ণভাবভাবিত ব্যক্তি) ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি জন্মায় না। ভগবৎকৃপা ভক্তসাপেক্ষ। কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ—সিদ্ধ (কৃষ্ণকর্ম ও প্রেমাস্বাদন-পরায়ণ) এবং সাধক (কৃষ্ণবিষয়ে জাত-রতি ও কৃষ্ণদর্শনের যোগ্য)—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৪৪-৪৬)।

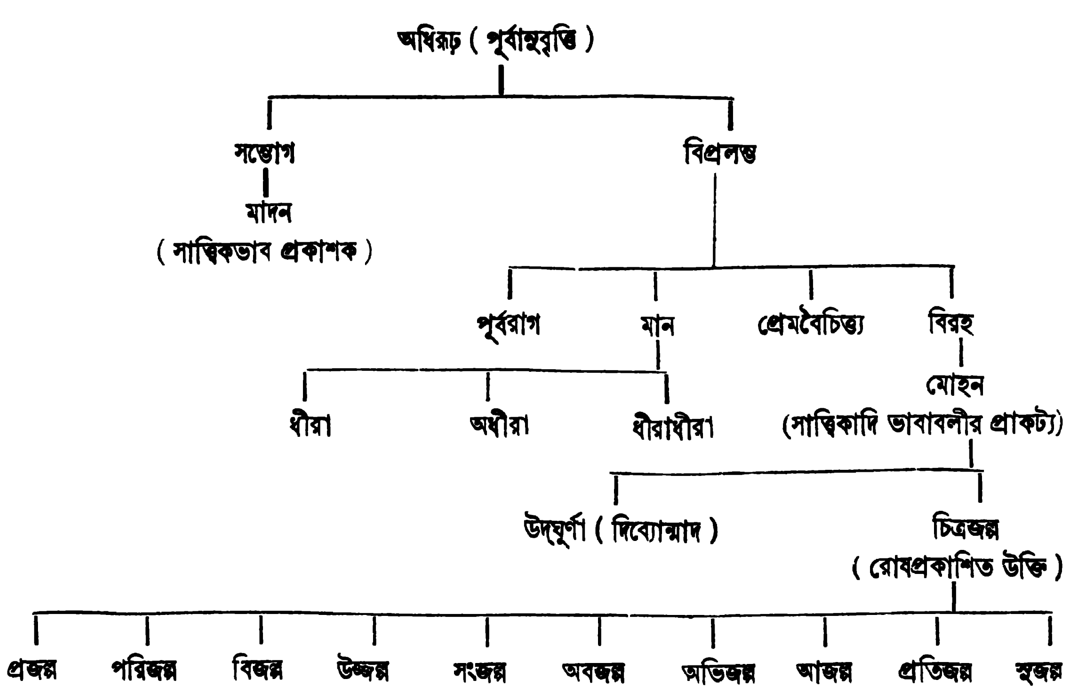
কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়ীভাব হইল—প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণে গাঢ় রতি। এই কৃষ্ণ-রতি দ্বিবিধ—ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্র বিধিভক্তি (মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ) এবং কেবলারতি রাগময়ী ভক্তি (গোকুল)। এই কৃষ্ণ-রতির শারীরিক ও মানসিক নব লক্ষণাবলী হইল—ক্ষমাশীলতা, কৃষ্ণগুণ-কীর্তন, সংসারে অনাসক্তি, মানহীনতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা, তজ্জনিত উৎকণ্ঠা, নামে রুচি, কৃষ্ণগুণানুরাগ এবং কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি।—'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥'—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।১১)।

কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন—বাক্য,ক্রিয়া ও চেষ্টার দুর্বোধ্যতা। 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥'—ভাগবত (১১।২।৪৯)। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় বর্ণিত মহাপ্রভুর শেষজীবনের দিব্যোন্মাদ-দশা ইহার প্রমাণ। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব (মোদন ও মাদন) অনুসারে কৃষ্ণপ্রেমের অনুক্রমিক বৃদ্ধি ও পরিণতি হয়। রত্যাধিক্যে স্বাদাধিক্য হয় এবং শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ও-মধুর নামক পঞ্চভাব হইতে পঞ্চরসের উৎপত্তি হয়। এই রসগুলির মধ্যে শৃঙ্গার বা মধুর রসের নানা বিভেদ আছে। ভক্তের হৃদয়ে অতীত ও বর্তমান জীবনের অনুভূতিগুলি সংস্কার রূপে বর্তমান থাকে। এই সংস্কারই আনন্দ-স্বরূপ রতি (=স্থায়ীভাব)। এই রতিই রসে পরিণত হইবার উপলক্ষ্যে বিবিধ বিভাব (আলম্বন, উদ্দীপনাদি), অনুভাব (অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও তাহার পঞ্চবিকার), সাত্ত্বিক ভাব (স্তম্ভ-স্বেদাদি) এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব (নির্বেদাদি) অবলম্বন করে।[৪৪]

- স্থায়ীভাব (রতি)
  - বিভাব
    - আলম্বন (রাধা-কৃষ্ণ)
      - বিষয় (কৃষ্ণ)
      - আশ্রয় (ভক্ত)
    - উদ্দীপন (বংশীধ্বনি)
  - অনুভাব
    - (স্মিত, নৃত্যগীত, অষ্ট সাত্ত্বিকভাব এবং তাহার পঞ্চবিকার —ধূমায়িতা, জ্বলিতা, দীপ্তা, উদ্দীপ্তা, সুদ্দীপ্তা)
  - সঞ্চারী বা ব্যভিচারী
    - (নির্বেদ-হর্ষাদি ৩৩টি)

রতি অনুসারে রস দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পঞ্চবিধ (শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর) এবং গৌণ রস সপ্তবিধ (হাস্য-অদ্ভুত-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-বীর-ভয়ানক)।[৪৫] সমস্ত রসেরই আবার নানাবিধ বৈচিত্র্য আছে। শান্তাদি পঞ্চ মুখ্য রস ক্রমবর্ধমান লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ পূর্ববর্তী রসের লক্ষণ পরবর্তী রসে সঞ্চারিত হয়। যথা,—শান্ত (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ), দাস্য (শান্ত ও সেবা), সখ্য (শান্ত, দাস্য ও মৈত্রী), বাৎসল্য (শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মমত্ব), শৃঙ্গার বা মধুর (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও আত্মদান)। গুণাধিক্যে রসের স্বাদাধিক্য হইলেও সকল রসের অধিকারী সকলে নহে—'যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি। রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥'—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২২)। মধুররস দ্বিবিধ—রূঢ় (আধার—মহিষীগণ। স্বকীয়া) এবং অধিরূঢ় (আধার—ব্রজগোপীগণ। পরকীয়া)। অধিরূঢ় মধুররস দ্বিবিধ—সম্ভোগ (মাদন অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাব-প্রকাশক) এবং বিপ্রলম্ভ (পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও বিরহ)। বিরহে সাত্ত্বিকাদি ভাবাবলীর প্রাকট্য লক্ষিত হয় এবং ইহা উদ্‌ঘূর্ণা (দিব্যোন্মাদ) ও চিত্রজল্প—এই দুই ভাগে বিভক্ত। চিত্রজল্প (রূঢ়রস-প্রকাশিত উক্তি) পুনশ্চ প্রজল্প-পরিজল্পাদি দশবিধ উপবিভাগে বিভক্ত।


রস
মুখ্য রস
গৌণ রস
শান্ত (কৃষ্ণনিষ্ঠা + তৃষ্ণা ত্যাগ)
দাস্য (শান্ত + সেবা)
সখ্য (শান্ত + দাস্য + বন্ধুত্ব)
বাৎসল্য (শান্ত + দাস্য + সখ্য + মমতা)
শৃঙ্গার বা মধুর (শান্ত + দাস্য + সখ্য + বাৎসল্য + আত্মদান)
হাস্য
অদ্ভুত
করুণ
রৌদ্র
বীভৎস
বীর
ভয়ানক
রূঢ় (মহিষী)
অধিরূঢ় (ব্রজগোপী)



অধিরূঢ় (পূর্বানুবৃত্তি)
সম্ভোগ
মাদন
(সাত্ত্বিকভাব প্রকাশক)
বিপ্রলম্ভ
পূর্বরাগ
মান
প্রেমবৈচিত্ত্য
বিরহ
ধীরা
অধীরা
ধীরাধীরা
মোহন
(সাত্ত্বিকাদি ভাবাবলীর প্রাকট্য)
উদ্ঘূর্ণা (দিব্যোন্মাদ)
চিত্রজল্প
(রোষপ্রকাশিত উক্তি)
প্রজল্প
পরিজল্প
বিজল্প
উজ্জল্প
সংজল্প
অবজল্প
অভিজল্প
আজল্প
প্রতিজল্প
সুজল্প

ভক্তিরসাস্বাদনে ভক্তিবাসনার প্রয়োজন। ভক্তিপ্রভাবে যাঁহারা অতিক্রান্ত-দোষ, প্রসন্নাত্মা, ভক্তসঙ্গী ও অন্তরঙ্গ-সাধনে নিরত, তাঁহারাই কৃষ্ণরতিহৃদয় এবং সেই রতি বিভাবাদির দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধা ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়। এই প্রেম বৈষ্ণবদিগের পঞ্চম-পুরুষার্থ। ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-বাসনাত্যাগ, জ্ঞান-নির্বেদ, যথাকালে স্মৃতিনির্দিষ্ট নৈমিত্তিকাদি কর্মত্যাগ ও সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন—এই গুলিই হইল শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ। আত্যন্তিক ভক্তিযোগের দ্বারাই সংসার-মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণ, সাকুল্যে এই দ্বাদশবিধ ভক্তিরসের আধার হইল পঞ্চবিধ ভক্ত। ভক্তের লক্ষণ—যোগযুক্ত-চিত্ততা ও বৈরাগ্য। কৃষ্ণসম্বন্ধহীনতা হইল শুষ্ক বৈরাগ্য; অনাসক্ত চিত্তে বিষয়-ভোগ এবং তৎসহ কৃষ্ণরতি হইল যুক্ত-বৈরাগ্য। 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥' —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১২৫)।

কৃষ্ণ-পরিকররূপে আনুগত্যময়ী সেবাতেই কৃষ্ণসেবক জীবের অধিকার। বৈষ্ণবদের অভীষ্ট বা সাধ্যবস্তু হইল আত্মসুখবাসনাহীনা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী কৃষ্ণসেবা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারি ভাবের আনুগত্যে জীবের কৃষ্ণসেবাই সাধ্যবস্তু। অবশ্য, যেমন সকল ভাবের অধিকারী সকলে নহে, তেমনি সকল ভগবৎ-স্বরূপের (ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্) উপলব্ধিও সমান আনন্দদায়ক নহে। কৃষ্ণানুভবই আনন্দের পরাকাষ্ঠা এবং 'সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন'-ই ভক্তহৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব : বৈষ্ণবমতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইল কৃষ্ণতত্ত্ব। কিন্তু বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী তথা, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে পরমতত্ত্ব হইল রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির আনন্দবৃত্তি হইল আহ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং, রাধা 'কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি'।[৪৬] পূর্ণতমা আহ্লাদিনী শক্তি রাধার সহিত পূর্ণতম শক্তিমান কৃষ্ণের মিলনই হইল রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। রসের দিক হইতেও বলা যায়, 'অখণ্ডরসবল্লভা' রাধার সহিত 'অখিলরসামৃতমূর্তি' কৃষ্ণের মিলনই রসস্বরূপত্বের তথা পরমস্বরূপত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা যে-সৃষ্টিলীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়, তাহারও পর্যবসান ঘটে রসস্বরূপত্বে। শুধু সৃষ্টিলীলা কেন, সমস্ত কিছুরই নিদান হইল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্ব। অতএব, যুগলিত রাধা-কৃষ্ণই পরম স্বরূপ। আহ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সারাৎসার মাদনাখ্য মহাভাবস্বরূপিণী কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সর্বলক্ষ্মী-সর্বকান্তা-সর্বমহিষীরূপিণী শ্রীরাধিকা। 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী

পরা ॥' —বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র ; অপিচ, 'তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈবতিববীয়সী ॥—উজ্জ্বলনীলমণি। লীলার নিমিত্তই কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তির সর্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তি হইলেন শ্রীরাধা। রাধা কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র না হইলেও লীলার কারণেই তিনি স্বতন্ত্রমূর্তি ধরিয়াছিলেন—'একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ'। শ্রীরাধাতেই কৃষ্ণ প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সেই হেতু, রাধাপ্রেম কৃষ্ণের মাধুর্যবিকাশক—'রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥'—গোবিন্দলীলামৃত। 'রসো বৈ সঃ' কৃষ্ণের যেমন অনন্ত গুণের মধ্যে ৬৪টি প্রধান [মূল গুণ ৫০ (বৈদগ্ধ্য, রুচি ইত্যাদি)+ অদ্ভুত গুণ ৪ (লীলা-প্রেম-প্রিয়তা-রূপমাধুর্য)+শিবাদিতে নিহিত ৫ (নিত্য-রূপত্বাদি)+নারায়ণাদিতে নিহিত ৫ (শক্তি, সর্বাকর্ষকত্ব ইত্যাদি)], তেমনি, মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার অনন্ত গুণের মধ্যে ২৫টি প্রধান (মাধুর্য, কৈশোর, সৌভাগ্যাদি)[৪৭]। বৃন্দাবনলীলায় রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ কথাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অবলম্বন।

গোপীতত্ত্ব: বৃন্দাবনলীলা-প্রসঙ্গে গোপীদের ভূমিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই গোপীরা রাধাকৃষ্ণের সখী। ভাগবতে (১০।৩০।২৮) রাধার নামোল্লেখ নাই, কেবল, একবার মাত্র রাসলীলা-প্রসঙ্গে একটি বিশেষ সখীর কথা বলা হইয়াছে যাহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥' আকার ও স্বভাবভেদে কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ রাধার কায়ব্যূহরূপা। কৃষ্ণকান্তা ত্রিবিধ—লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজাঙ্গনা। সকলেই রাধার বৈভব-বিলাসের অংশরূপা। তাঁহারা মহাভাবরক্ষাকারিণী, লীলা-সহায়িকা। মহাভাগবতী গোপীদের প্রেম কৃষ্ণসুখ-পরায়ণ, আত্মসুখ-বিষয়ে উদাসীন। গোপী-প্রেম প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে, আহ্লাদিনী শক্তিরই বিলাসবৈচিত্র্য। 'দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া' (উজ্জ্বলনীমণি) যে-সম্ভোগ, তাহাতে 'আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ' (উজ্জ্বলনীলমণির জীব-গোস্বামীকৃত টীকা), অর্থাৎ, তাহাতে প্রাকৃত কামময়তা নাই ('প্রাকৃতঃ কামময়োঽপি সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ'—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)। কাম প্রাকৃত মনের বৃত্তি কিন্তু প্রেম আহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি। গোপীপ্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য। গোপীদের মধুরা রতি ত্রিবিধা—সাধারণী (যথা, কুব্জা), সমঞ্জসা (যথা, মহিষীগণ) এবং সমর্থা (যথা, ব্রজগোপীগণ)। সাধারণী রতি সাক্ষাৎদর্শন-সঞ্জাতা এবং সম্ভোগেচ্ছাতেই কিংবা সম্ভোগেই তাহার পরিণতি। অনুরাগান্তা সমঞ্জসা রতিতে পত্নীত্বের অভিমান আছে

এবং ইহাতে কচিৎ সম্ভোগেচ্ছা জন্মে। সমর্থা রতি স্বতোদ্ভূতা কৃষ্ণসুখেচ্ছাময়ী সর্বধর্মবর্জিতা, একনিষ্ঠাবতী এবং মহাভাবান্তা।[৪৮]

ব্রজগোপীগণ দুই শ্রেণীভুক্তা—নিত্যসিদ্ধা (অর্থাৎ, যাহারা স্বরূপতঃ আহ্লাদিনী শক্তি) এবং সাধনসিদ্ধা (অর্থাৎ, যাহারা সাধন-প্রভাবে ব্রজগোপীত্ব লাভ করিয়াছে) সেবার প্রকারভেদে গোপীরা সখী ও মঞ্জরী নামে আখ্যাত। ললিতাদি সখীরা রাধার সমজাতীয়া অর্থাৎ, সকলেই স্বরূপশক্তি। মঞ্জরীগণ রাধাকৃষ্ণের সেবার আনুকূল বিধান করে, ইহারা শ্রীরাধার কিঙ্করী।[৪৯] সখীগণ নিত্যসিদ্ধা কিন্তু মঞ্জরীগণ সাধন সিদ্ধা গোপী। রাধাই কৃষ্ণপ্রেমের মূল উৎস, সখী ও মঞ্জরীগণ সেই প্রেমের পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। রাধা ব্যতীত কেবল সখী ও মঞ্জরীদের দ্বারা রাস-রসলীলা স্ফূর্তি হয় না।

কৃষ্ণ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়, গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার প্রেমও তেমনি বিরুদ্ধধর্মময় রাধিকা প্রেমের আশ্রয়, কৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। এই প্রেমের পরিপুষ্টি-সাধনে সহায়িকা হইল গোপীপ্রেম। 'গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি। মাধুর্য বাঢ়া প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাঞ্ছা সম্বন্ধ ॥ সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমের সর্বাধিকা রাধাসহ ক্রীডারস বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ কৃষ্ণের বল্লভ রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন। তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥'—চৈতন্যচরিতামৃ (১।৪); অপিচ, 'সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা'—পদ্মপুরাণ।

চৈতন্যতত্ত্ব : বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-(চৈতন্যভাগবত)-এ চৈতন্যদেবকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। চৈতন্যাবির্ভাবের কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বলে —'কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে। অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্বপরিকরে ॥' চৈতন্য মঙ্গলের কোথাও রাধা-প্রসঙ্গ নাই। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মত অনুসরণ করি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যজন্মের দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন—একটি সামা অপরটি বিশেষ। চৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ হইল, সাধারণ্যে 'অনর্পিতচরী 'সভক্তিশ্রিয় উন্নত-উজ্জ্বলরস' বিতরণ। এই কারণ রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' (১। সম্মত। বিশেষ কারণ হিসাবে তিনি স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা হইতে যে-শ্লোক উদ্ধা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বিজাতীয়তা হেতু বৃন্দাবনলীলায় যে-রাধ প্রেমের পূর্ণ আস্বাদন-লাভ কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, সেই রাধাপ্রেমের আস্বাদনে জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমাধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বে

লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (১।১)। বিজাতীয়ভাবে এই রসাস্বাদন সম্ভব নহে বলিয়া কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ একাত্ম হইয়া সজাতীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যে-স্বরূপশক্তি আহ্লাদিনী কৃষ্ণান্তর্ভূক্ত হইয়াও লীলাবশে বৃন্দাবনে স্বতন্ত্র হইলেন, কলিযুগে সেই স্বরূপ-শক্তি আবার অন্যবিধ লীলারই কারণে একদেহীভূত হইলেন। চৈতন্যদেবের জীবৎকালের শেষ অষ্টাদশ বর্ষের দিব্যোন্মাদ দশা লক্ষ্য করিয়া স্বরূপ গোস্বামী বিপ্রলম্ভ বিরহের মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ'। 'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥' —চৈতন্যচরিতামৃত (১।১)। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াই চৈতন্যদেব তদীয় জীবনের শেষ বৎসরগুলি রাধাভাব-সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই অন্তরঙ্গ-সাধন চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইহার সহিত জনসাধারণের কোন সংযোগ নাই। এই অন্তরঙ্গ-সাধনকালে মহাপ্রভুর 'বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা' বিচার করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সেই অবস্থাকে বিপ্রলম্ভ বিরহের 'উদ্ঘূর্ণা' শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন।

কেবল স্বরূপ গোস্বামীই নহেন রামানন্দ রায়ও তাঁহাকে রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ রূপে ('রসরাজ-মহাভাব') স্বীকার করিয়াছিলেন। 'তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য রস করি আস্বাদন॥' —চৈতন্যচরিতামৃত ২।৮)। জীব গোস্বামীর ভাবনাতেও চৈতন্যদেব 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর. 'অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥'—ভাগবতসন্দর্ভ (২)। রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তত্ত্ব অর্থাৎ যুগল-তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব নামে পরিচিত। কৃষ্ণস্বরূপ এবং তদীয় আহ্লাদিনী শক্তি অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন (বৃন্দাবনলীলা), আবার, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন (চৈতন্যলীলা); সেইহেতু, এই চিন্তার অতীত বিষয়টি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নামে অভিহিত।

চৈতন্যসমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদকর্তারা তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়াই (সাক্ষাতে কিংবা ধ্যানে) পদরচনা করিয়াছিলেন। রাধা-বিরহ কিরূপ, চৈতন্যদেবের শেষ জীবন দেখিয়াই তাঁহারা তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। যখন পালাবদ্ধ কীর্তন প্রচলিত হইল, তখন রসপর্যায়ের ভূমিকা হিসাবে যথোপযোগী চৈতন্যবিষয়ক পদ

দিয়াই কীর্তন আরম্ভ করা হইত এবং আজিও তাহা হইয়া থাকে। চৈতন্যদেবের জীবৎ-কালেই তিনি স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা তাঁহাকে রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের চৈতন্যভাবনা ও বৃন্দাবনের চৈতন্যভাবনার মধ্যে পার্থক্য কেবল রাধাকে লইয়াই। নবদ্বীপের ভাবনায় চৈতন্যদেব শুধু কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের ভাবনায় তিনি রাধা-কৃষ্ণ।

স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ : স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ বলিয়া প্রচার করায় এবং কৃষ্ণের সহিত রাধার পরকীয়া সম্পর্ক স্থাপন করায় চৈতন্যতিরোধানের পর বৈষ্ণবতত্ত্বচিন্তায় ও সাধনপদ্ধতিতে বিরোধ দেখা দিয়াছিল। বৈষ্ণব-অধ্যাত্মভাবনায় মতভেদের মূল বিষয় হইল—রাগানুগা-সাধনায় পরকীয়াবাদ। সনাতন, রূপ ও গোপাল ভট্ট তিনজনই ছিলেন বৈধী সাধনার সমর্থক। বৃন্দাবনে রাগানুগা সাধনার প্রধান ভাবুক ছিলেন স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায় এবং রঘুনাথ দাস (কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহ)। বৈধীমার্গীরা স্বকীয়াবাদী এবং রাগানুগাপন্থীরা পরকীয়াবাদী। জীব গোস্বামী তদীয় 'গোপালচম্পূ'-তে মার্গভেদের এই সমস্যার (রাধা, কৃষ্ণের স্বকীয়া কিংবা পরকীয়া) একটি সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং স্বকীয়াবাদকে সমর্থন করিতেন এবং তদনুসারে তাঁহার ব্যাখ্যাত পরকীয়াবাদের সমাধান হইল—রাধা স্বকীয়া হইয়াও লীলাবশে যোগমায়ার প্র ভাবে পরকীয়াবৎ প্রতীয়মানা।

জীব গোস্বামীর মতে স্বকীয়া ও পরকীয়া কান্তাভাব কেবল প্রকট-লীলাতেই আছে ; অপ্রকট-লীলায় নিত্যস্বকীয়ত্ব বর্তমান। প্রকট-লীলার পরকীয়াভাবের বিশেষত্ব হইল স্বকীয়াতে পরকীয়াত্ব আরোপ। ব্রজনারীগণ কৃষ্ণেরই স্বকীয়া শক্তি, প্রকট ব্রজে যোগমায়া-প্রভাবে তাহারাই পরকীয়া রূপে প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ (১৭৭ অনুচ্ছেদ)। 'প্রীতিসন্দর্ভ'-(২৩৮)-তেও একই সিদ্ধান্ত—'বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ।' জীব গোস্বামী অন্যত্রও (উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ প্রকরণে ও মুখ্যসম্ভোগ প্রকরণে এবং ভাগবতের টীকায়) এই মতই পোষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিমতে রূপ গোস্বামীর 'ললিত-মাধব' নাটকেও স্বকীয়াত্বেই গোপীভাবের পর্যবসান ('ললিতমাধবে তথৈব সমাপীতম্')। 'গোপালচম্পূ'-তে (উত্তরচম্পূ, ৩১।৩২ পূরণ) রাধিকাদি গোপীগণ কৃষ্ণের বিবাহিতা স্বকীয়া কান্তা, বিশেষতঃ রাধা যশোদার তনয়-বধূ (চম্পূ। পূরণ ৩।১৩)। জীব গোস্বামীর এই স্বকীয়াভাবাত্মক সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্পিত নহে। ব্রহ্মসংহিতা, গৌতমীয়-তন্ত্র, গোপালতাপনীপ্রভৃতি এবং ভাগবতে ব্রজনারীগণ কৃষ্ণবধূ, কৃষ্ণকান্তা হিসাবে

অভিহিত হইয়াছে।[৫০] কৃষ্ণসন্দর্ভ-(১৭৭)-এর সিদ্ধান্তের উপরেই গোপালচম্পূর লীলা-বর্ণনা ও কান্তাভাবের স্বকীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত—'জারভাবময়ঃ সঙ্গমশ্চ সদৈব সোপদ্রবত্তস্মাদসৌ পর্যবসান পুরুষার্থত্বে তত্তচ্ছাস্ত্রসম্মতো ন স্যাৎ' অর্থাৎ, ঔপপত্য উপদ্রবময় বিধায় উহার পুরুষার্থবস্তু-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তও রসশাস্ত্রসম্মত নহে। পরকীয়াভাব স্বকীয়াভাবেরই বৈচিত্র্যমাত্র। প্রকট-লীলায় রাধার পরকীয়াত্ব তথা কৃষ্ণের ঔপপত্য যোগমায়া-কল্পিত।

জীব গোস্বামীর প্রচেষ্টায় 'স্বকীয়া অপি পরকীয়া' এই তত্ত্বটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মানিয়া লইলেও অন্তঃসলিলা বিতণ্ডা চলিতেই লাগিল। নবদ্বীপের অদ্বৈতচন্দ্র ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যুগপৎ বন্দনা করিয়া এবং মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের পূর্বসূরিত্বকে স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে সদ্ভাবের সেতুবন্ধ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের অনাস্বাদিত রস (বিজাতীয়ভাব হেতু) আস্বাদন করিলেন (সজাতীয়-ভাবে)। শ্রীকৃষ্ণ 'রসরাজ', শ্রীরাধা 'মহাভাব' এবং চৈতন্যদেব যুগপৎ 'রসরাজ-মহাভাব'। নবদ্বীপ-লীলার উদ্দেশ্য যুগপৎ রসাস্বাদন ও রাগমার্গভক্তি প্রচারণ। ব্রজে যে-লীলার সূচনা, নবদ্বীপে তাহারই পূর্ণতা। 'গোপালচম্পূ'-রচনা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ গোপালচম্পূ হইতে কোন উদ্ধৃতি নাই বটে, তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-যে উক্ত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়—'গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপুর॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (২।১)। স্বকীয়া-পরকীয়া ভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—'অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (৩।১)। ইহার সমর্থন 'লঘুভাগবতামৃত'-(পূর্ব খণ্ড)-এ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় (৫।৪৬১) রহিয়াছে—'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥' প্রকটলীলায় যোগমায়াসৃষ্ট পরকীয়াভাব সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতে (১।৪) বলা হইয়াছে—বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥ মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥' চম্পূর মর্ম বুঝিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত নিত্যলীলা ও প্রকট বৃন্দাবন লীলার পরকীয়াত্বের উপস্থাপনা করিয়াছেন।[৫১]

চৈতন্য-তিরোধানের পর কৃষ্ণমূর্তির বামে রাধা-মূর্তির স্থাপনায় স্বকীয়াবাদেরই

সমর্থন করা হইল এবং ইহার দ্বারাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম সমকালীন অপরাপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত ও মর্যাদার অধিকারী হইল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের আবরণে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

সহজিয়া সম্প্রদায় : চৈতন্যদেব জনসাধারণকে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, পবিত্র জীবনযাপনের কথা বলিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচার কিংবা ধর্মস্থাপনা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার উদার, সর্বজনীন অধ্যাত্মবোধ সমাজ ও শাস্ত্রশাসনকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল বটে, তবে সমাজ ও শাস্ত্রশাসনকে তিনি যেমন অবজ্ঞাও করেন নাই, তেমনি উহাদের প্রশ্রয়ও দেন নাই। হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভক্তিমার্গেই তাঁহার অধ্যাত্মচারণা। সার্বভৌম ভটাচার্য যথার্থই বলিয়াছিলেন—'বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥…'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥'—চৈতন্যচরিতামৃত (২।৬)। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর রাগানুগামার্গ ধরিয়াই বৈষ্ণবধর্মে সহজিয়া অসামাজিক তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকের বহু পূর্বেই মহাযানতন্ত্রে ও বিভিন্ন তান্ত্রিক যোগাচারে ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ফলে, মহাযানতন্ত্রে যুগনদ্ধ রূপে হেরুক-যোগিনীকে (বৌদ্ধমতে যাহা নৈরাত্মা) এবং শৈবধর্মে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকে পাওয়া যায়। অবশ্য, বাঙ্গালী বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতীর (১৪ শতক। সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন) 'ভক্তি-শতক'-এর সাক্ষ্যে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের পূর্বেই তান্ত্রিক মহাযান-মতে ভক্তিবাদেরও অস্তিত্ব ছিল। চৈতন্যদেবের সময়েও এই ভ্রষ্ট তন্ত্রাচার-যে অজ্ঞাত ছিল না, তাহার পরিচয় চৈতন্যভাগবতে আছে ('রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে')। অদ্বৈতাচার্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, গুহ্য তন্ত্রাচার সম্ভবতঃ তাঁহারও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তিনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন। নিত্যানন্দ তন্ত্রমন্ত্রে কদাচ বিশ্বাস করিতেন না। যবন হরিদাসের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মে সুফীপ্রভাব পড়িয়াছে কি-না, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, কারণ, সুফীমতে পরতত্ত্ব নারী কিন্তু বৈষ্ণবমতে পরতত্ত্ব হইল কৃষ্ণ অথবা রাধাকৃষ্ণ।[৫২] কিছু 'সহজ'-কথা চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে ('সহজবস্তু করি বিবেচন'—২।২), তবে এই সহজ-সাধনা 'ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা-মানস', কোনক্রমেই ইহা গুহ্য তান্ত্রিক-সহজ-সাধনা নহে। চৈতন্যদেব স্বয়ং নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন, শিষ্ট বৈষ্ণবেরা 'গৌর-নাগর'-ভাবকে কদাপি স্বীকার করিয়া লন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রসিক বৈষ্ণবভক্তের সমুন্নত আদর্শ চৈতন্য-তিরোধানের পর অধোগত হইয়া 'নেড়ানেড়ী'-তে পরিণতি লাভ

করিয়াছিল। অবশ্য, সকল ধর্মেই এই জাতীয় স্খলন দেখা যায়। বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্র, শৈব ইত্যাদি ধর্মে ভ্রষ্টাচার যদি ঘটিয়া থাকে, তবে বৈষ্ণবধর্মেও ঘটিয়াছে। সাধনার মধ্যে ফাঁকির পথ ধরিয়াই ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করে। এই ভ্রষ্ট রাগানুগামার্গী বৈষ্ণবধর্মই হইল সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম যে-ধর্মে তন্ত্রের ন্যায় সাধনসঙ্গিনীর এবং আনুষঙ্গিক করণকারণাদির একান্ত প্রয়োজন। এই সাধনসঙ্গিনীটি আবার পরকীয়া রমণী হওয়া চাই! সহজিয়া চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর প্রচলিত কাহিনী প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য। ষোড়শ শতক শেষ হইবার পূর্বেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যোগী-তান্ত্রিক-সূফীদের আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল। পরবর্তী সপ্তদশ শতকে কোন-কোন সাধক সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্মের বাহ্যিক অনুসরণে রাগানুগামার্গী হইয়াছিল। পরবর্তী দুইটি শতকে ইহারই ফল স্বরূপ আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই-কর্তাভজা ইত্যাদি বিভিন্ন বিচিত্র সম্প্রদায়গুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তথাকথিত সহজিয়া নিবন্ধগুলি অতি ক্ষুদ্র রচনা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কামসূত্রের অনুগামী। দুই-একটি ভাল রচনাও অবশ্য পাওয়া যায়, যথা, রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র মনোহর দাসের 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' এবং অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাস'।

সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণলীলা ও পদাবলী উভয়বিধ রচনাই পাওয়া যায়। পদাবলী সঙ্কলনের প্রচেষ্টাও এই শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল ('ক্ষণদাগীতচিন্তামণি')। সপ্তদশ শতকীয় কৃষ্ণলীলা তিনশ্রেণীর—আখ্যান-প্রধান (প্রধানতঃ ভাগবতের অনুসৃতি), গীত-প্রধান (বৃন্দাবনী চিন্তাধারা ও প্রেমভক্তির সুর-সমৃদ্ধ) এবং লৌকিক (ভক্তিমিশ্র আদিরস ও কৌতুকরস প্রধান)। জয়গোপাল দাসের (১৬ শতক) শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস', ঘনশ্যামদাসের 'হরিবংশ' ওরফে 'ভাগবত' ওরফে 'ব্রহ্মবৈবর্ত', যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস', ভবানন্দের 'হরিবংশ' (গ্রন্থটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও বৃন্দাবনী 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণের প্রভাব আছে —'শরীরে রাখিমু রাধা এহি যুক্তি সার') প্রভৃতি এই তিন শ্রেণীর রচনার উদাহরণ।

॥ ১১ ॥ প্রত্যন্ত রাজসভাগুলির সাহিত্যচর্চায় বৈষ্ণবপ্রভাব

পদাবলীর পুষ্টি রাজসভায়—লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা, গৌড়-ত্রিহুত-ত্রিপুরা-নেপাল-মল্লভূম রাজসভা। চৈতন্যভক্তবৃন্দের দ্বারা পদাবলী অসাধারণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীখণ্ড ও খেতুরীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্তন-মহোৎসবের এবং শ্রীনিবাস আচার্য ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অষ্টপ্রহর' ও 'চব্বিশপ্রহর' নাম-কীর্তনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে এবং প্রসারে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস (দত্ত) ও শ্যামানন্দ দাস (মণ্ডল), এই তিন ব্যক্তির নাম স্মরণীয়। ইঁহারা ও ইঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায় কর্তৃক বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে বৃন্দাবনীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের চারিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজসভাগুলির সাহিত্যচর্চায় বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি হইল, যথাক্রমে —(ক) উত্তর-পূর্বে কোচবিহার (কাঙুর-কামতা), (খ) উত্তর-পশ্চিমে নেপাল, (গ) দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান (চাটিগাঁ। রোসাঙ্গ), (ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিমে মল্লভূম (বিষ্ণুপুর)।

(ক) কোচবিহার (কাঙুর-কামতা) রাজসভায় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সাহিত্যচর্চার একটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। কামরূপ-সাহিত্যের গোষ্ঠীপতি সাধক শঙ্করদেব স্বয়ং একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সাহিত্যমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অসমীয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ / রচনা ব্যতীত ব্রজবুলি ভাষাতে তিনি পদ রচনারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। রাজা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়) পৃষ্ঠপোষকতায় অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতী রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

(খ) নেপালের সহিত ত্রিহুত (মিথিলা) ও বঙ্গদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তুর্কী-আক্রমণের পর বহু বৌদ্ধ ও মৈথিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মিথিলায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের জয়স্থিতি মল্লের রাজ্যকাল হইতে অষ্টাদশ শতকের রণজিৎ মল্লের সময় পর্যন্ত নেপাল রাজসভায় সংস্কৃত-প্রাকৃত-লৌকিক (বাংলা, মৈথিলী, নেবারি) ভাষায় নাট্য রচনার প্রয়াস দেখা যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষে নেপাল ত্রিধা বিভক্ত হইয়া যায়—উত্তর নেপাল (রাজধানী কাঠমাণ্ডু), দক্ষিণ নেপাল (রাজধানী ভাতগাঁও) এবং ললিতাপুর। নেপাল-রাজগণ কেবল কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ কবিযশঃপ্রার্থীও ছিলেন। নেপালের সাহিত্য-সর্জনায় নাটকের দিকেই প্রবণতা সমধিক। নাটকগুলির উপর জয়দেব ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। নেপালে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নাটক হইতেছে জয়মল্লার্জুনের রাজ্যকালে (১৪ শতক) রচিত বাঙ্গালী কবি ধর্মগুপ্তের 'রামাঙ্ক' নাটিকা (লিপিকাল ১৩৬০ খ্রীঃ)। জয়মল্ল-পুত্র জয়স্থিতি মল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মণিক 'অভিনব রাঘব' নাটক লিখিয়াছিলেন। ভাতগাঁও-রাজ ত্রৈলোক্য মল্লের রাজ্যকালে (১৬-১৭ শতক) রচিত একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক পাওয়া যায়। ত্রৈলোক্য-পুত্র জগজ্জ্যোতি মল্লের নামে প্রচলিত 'হরগৌরী' নাটক এবং জগজ্জ্যোতির পুত্র জিত্রাজিৎ মল্লের 'মদালসাহরণ' ও 'গোপীচন্দ্র নাটক

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। নাট্যরচনার তুলনায় নেপালে পদাবলী রচনা অনেক কম। জিত্রাজিৎ মল্লের পুত্র ভূপতীন্দ্র মল্ল ব্রজবুলি ভাষায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। লোচনদাসের 'রাগতরঙ্গিণী'-তে ললিতাপুরের সিদ্ধি-নরসিংহের পুত্র শ্রীনিবাস মল্ল রচিত একটি মাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায় ('উপমিঅ আনন, নীরজ পঙ্কজ, শশধর দিবস মলীনে—' ইত্যাদি)।

(গ) আরাকান (রোসাঙ্গ) রাজসভা সপ্তদশ শতকে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের আমল হইতেই রোসাঙ্গ রাজসভার সহিত গৌড়রাজ-সভার যোগ ছিল। আরাকানের তিন জন কবির (দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল ও সৈয়দ সুলতান) রচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'-র প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠপোষক আসরফ খানের বন্দনায় জয়দেবের ছন্দের অনুসরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে পদরচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব ও ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের কয়েকটি পদ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের অনুসরণে রচিত। সৈয়দ সুলতানও কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(ঘ) বিষ্ণুপুর বা মল্ল রাজসভা কোচবিহার, আরাকান ও নেপাল এই তিন রাজসভার সাহিত্যচর্চায় বৃন্দাবনী প্রভাব বিরল। কিন্তু মল্লরাজসভার সাহিত্যচর্চায় ও মল্লভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের মূলে ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য ও রামচন্দ্র কবিরাজ। মল্লভূমির রাজধানীর (বিষ্ণুপুর) নামকরণ করিয়াছিলেন শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ। বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পরিচয় রহিয়াছে সঙ্গীতে, চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে। অসম্ভব নহে, সঙ্গীতে বিষ্ণুপুরী ঘরানার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত কীর্তনগানের ধারা হইতেই হইয়া থাকিতে পারে। বিষ্ণুপুরের মন্দির-স্থাপত্য-পরিকল্পনায় ও মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রভাব অভিব্যক্ত। বীর হাম্বীর ও তৎপুত্র ধাড়ী হাম্বীর এবং বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা চৈতন্য সিংহের নামে কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের সভাকবি কবীন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ পাঁচালী (বিষ্ণুপুরী রামায়ণ), সংক্ষিপ্ত ভারত পাঁচালী, ভাগবতামৃত বা গোবিন্দ মঙ্গল (কাব্যটিতে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের বৃত্তান্ত আছে) রচনা করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরের সাক্ষ্যে বলা যায় যে, শিখর-ভূম্যধিকারীগণের (ইহারা রামভক্ত ছিলেন) দরবারেও পদাবলী রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় গোবিন্দদাস কবিরাজ রচিত

একটি 'রামবন্দনা' পদে। শিখর-ভূমির অনেক পদকর্তাও শ্রীনিবাস আচার্য এবং তৎপুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজের পুত্র দিব্য সিংহ (ইনি শ্রীনিবাসের শিষ্য) এবং গোবিন্দ দাসের পৌত্র ঘনশ্যামের[৫৩] (গতিগোবিন্দের শিষ্য) রচিত কয়েকটি পদ সঙ্কীর্তনামৃতে পাওয়া যায়। পদকর্তা গোকুলানন্দ, বংশীদাস, শ্যামদাস, রাধাবল্লভ দাস প্রভৃতি শ্রীনিবাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীনিবাস-পুত্র গতিগোবিন্দ ও তৎপুত্র সুবলচন্দ্রের নামেও 'পদকল্পতরু'-তে কয়েকটি পদ আছে।

রসিক ভক্ত নরোত্তম-শিষ্য রাজা নরসিংহ 'সিংহ ভূপতি' ভণিতায় পদ লিখিতেন। পদকর্তা শিবরাম এবং রাঘবেন্দ্র রায়ও নরোত্তমের শিষ্য। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের পুত্র রাধানন্দ গীতগোবিন্দের অনুসরণে 'রাধাগোবিন্দ' কাব্য লিখিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল—রামায়ণ পাঁচালী-গানও কীর্তন-গানের শৈলীতে গাওয়া হইত। কৃষ্ণলীলার অনুসরণে রামলীলার পদও এই শতকে রচিত হইতে থাকে। এই পদ রচনায় বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষারই ব্যবহার দেখা যায়।

॥ ১২ ॥ মধ্যযুগের ধর্মসাধনা, সাহিত্য ও চৈতন্যদেব

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যযুগীয় প্রধান-প্রধান ধর্মমতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। 'ভক্তিধর্ম'-এর মৌলিক অর্থ হইল 'ভাগবত ধর্ম' অর্থাৎ ভগবান্-সম্পর্কিত ধর্ম। এই ভক্তিধর্মের নানা রূপভেদ ভারতের বিভিন্ন ভূখণ্ডে লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর ভারত : মধ্যযুগে উত্তর ভারতের ভক্তিধর্ম দ্বিবিধ—নির্গুণ ভক্তি ও সগুণ ভক্তি এবং এই যুগের দুই প্রধান উপাস্য দেবতা—রাম ও বিষ্ণু। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ ১৫।১৬ শতকে যে-ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার উপাস্য হইলেন বিষ্ণুর মানবাবতার রামচন্দ্র। নব-বৈষ্ণবতার প্রবক্তা রামানন্দের দুই প্রধান শিষ্য ছিলেন—কবীর এবং তুলসীদাস। কবীর জ্ঞানাত্মিকাভক্তির সাধক, তাঁহার নির্গুণ নিরাকারাত্মক উপাসনার সহিত নাথ-পন্থার (শৈব গোরক্ষনাথ) ঈষৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কবীর নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের সাধক হইলেও তাঁহার সাধনা শুষ্ক বৈরাগ্যেই স্থিত ছিল না, প্রেম এবং ভক্তির পথেও তাঁহার পদচারণা ছিল। কবীরের দোহাবলীতে জ্ঞান ও প্রেমভক্তি উভয় ধারারই পরিচয় বিদ্যমান। কবীরের ধর্মধারণায় দুইটি বিভাগ দেখা যায়—ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের

প্রেমভক্তি এবং সুফী ধর্মের 'ইশ্‌ক্'। রাম ও বিষ্ণু, এই দুই দেবতার উপাসনার মূলে আছে দুই মহা গ্রন্থ—রামায়ণ ও ভাগবত। উত্তর ভারতে রামভক্তি-ধর্মের ধারক ও বাহক যেমন রামানন্দ, তেমনি কৃষ্ণভক্তি-ধর্মের ধারক ও বাহক বল্লভাচার্য [এবং বঙ্গদেশে (উত্তর-পূর্ব ভারতে) চৈতন্যদেব]। তুলসীদাস এবং সুরদাস বল্লভাচার্যের আটজন ('অষ্টছাপ') শিষ্যের মধ্যে প্রধান। ইঁহারা সগুণ ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। তুলসীদাসের উপাস্য রামচন্দ্র, রচনা 'রামচরিতমানস' নির্ভর রামায়ণ এবং সুরদাসের উপাস্য কৃষ্ণ, রচনা পদাবলী, নির্ভর ভাগবত। তুলসীদাস ও সুরদাস উভয়েই অদ্যাপি জনমানসে অবিস্মৃত। রামচরিতমানস ব্যতীত তুলসীদাসের অপর উল্লেখযোগ্য রচনা হইল 'বিনয় পত্রিকা' বা প্রার্থনা-বিষয়ক পদাবলী। তুলসীদাসের অন্যতম প্রধান উত্তর-সূরী হইলেন 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রণেতা নাভাজী দাস। কৃষ্ণভক্তি-ধারার অপর একজন সাধিকা হইলেন রাজস্থানের মীরাবাঈ (১৫০৩-৪৬)। তাঁহার ভজন-সঙ্গীতগুলিতে সাকার ভজনা ও প্রেমভক্তির লক্ষণ বিদ্যমান। ষোড়শ শতকের অপর উল্লেখযোগ্য কবি দাদু দয়াল (১৫৪৪-১৬০৩)। ইনি কবীর-সম্প্রদায়ভুক্ত নির্গুণ নিরাকারের উপাসক হইলেও ইঁহার দোহাঁগুলিতে ভক্তির সুরলালিত্য অনুপস্থিত নহে। [দ্রষ্টব্য: প্রবোধচন্দ্র সেন—রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি; ক্ষিতি-মোহন সেন—মধ্যযুগে সাধনার ধারা, দাদু]।

গুজরাট: গুজরাটের মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনায় ও সাহিত্য-চিন্তায় উত্তর ভারতের বল্লভাচার্য (পুষ্টিমার্গ), সন্ত কবি কবীর ও সুরদাস, রাজস্থানের মীরা বাঈ, কর্ণাটকের বিষ্ণুস্বামী এবং মহারাষ্ট্রের জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের (১৪৫০-১৮০০) গুজরাটী সাহিত্যে ভক্তিবাদের উপস্থাপনা করেন নর-সিংহ মেহতা (১৪১৫-৮১)। জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির অনুগামী নরসিংহ মহারাষ্ট্রের জ্ঞানদেব ও নামদেবের (১৩।১৪ শতক) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁহার গীতি-কাব্যে কর্ণাটকের বিষ্ণুস্বামীর ভাবধারা লক্ষিত হয় এবং তিনিই প্রথম গুজরাটী সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবনার সূত্রপাত করেন। অবশ্য চতুর্দশ শতকে এক অজ্ঞাত কবির একটি কাব্য 'বসন্তবিলাস' (জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে) পাওয়া যায়। গুজরাটে মীরার ভজন সঙ্গীতগুলিও অত্যন্ত সমাদৃত। ১৫-১৬ শতকের গুজরাটের জীবন ও সাহিত্য পুষ্টিমার্গী বল্লভাচার্যের প্রভাব পরিপুষ্ট। ১৬ শতকে সুরদাসের সমকালীন কবি ভালন ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ও বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৭-১৮ শতকের তিনজন বিখ্যাত কবি হইলেন—জৈন কবি অক্ষয় দাস (১৬১৫-৭৫), পৌরাণিক আখ্যায়িকার কবি প্রেমানন্দ ভট্ট (১৬৩৬-

১৭৩৪) এবং পুরাণ-কাহিনীর কবি শ্যামলদাস ভট্ট (১৮ শতক)। এই পর্যায়ের অপর একজন বড় বৈষ্ণব কবি বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের দয়াশঙ্কর (১৭৬৭-১৮৫২)। গুজরাটী সাহিত্যে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। রঘুনাথ প্রভৃতির রচনায় ভক্তিবাদ প্রধান ; প্রীতম্, ধীরো ইত্যাদির রচনায় জ্ঞানবাদের প্রাধান্য।

পাঞ্জাব : কবীরের সমমতাবলম্বী জ্ঞানমার্গ ও নির্গুণ ভক্তিবাদের প্রচারক ছিলেন শিখ ধর্মগুরু নানক (১৪৫৯-১৫৩৮)। ১৭ শতকে শিখ পঞ্চম-গুরু অর্জুন কর্তৃক 'গ্রন্থসাহিব' সঙ্কলিত হয়। এই বেদতুল্য ধর্মসাহিত্যে নানক, কবীর, রায়-দাস প্রভৃতি বহু ভক্ত-কবির রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল নির্গুণ, নিরাকার উপাসনামূলক রচনা নহে, গ্রন্থটির মধ্যে রণচণ্ডিকা মহামাতৃকা পার্বতীর প্রশস্তিও ('চণ্ডী-দী-বার') অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৬ ও ১৮ শতকে নানকের জীবনী-কাব্য রচনা করেন তিনজন কবি—বালা ও সেবা সিং (১৬ শতক) এবং মণি সিং (১৮ শতক)। মধ্যযুগের কয়েকজন কবি ও তাঁহাদের রচনাবলী—চন্দ্রভান্ (১৭ শতক। সূফী কবিতাবলী), আলি হায়দার (১৭ শতক। 'সী হরফীস্' ত্রিশ অক্ষরের বর্ণানুক্রমিক কবিতা, বঙ্গীয় সাহিত্যে চৌতিশার সমগোত্রীয়), যশোদানন্দন (১৭ শতক। 'লবকুশ-দিয়া পুরিয়া' রামায়ণানুসরণে লবকুশের যুদ্ধ)। ১৭ শতকে পাঞ্জাবের সাহিত্য-ভাবনায় সূফী-প্রভাব পড়িয়াছিল।

কাশ্মীর : কাশ্মীরের শৈবতান্ত্রিক দর্শনের সহিত তামিল শৈবসিদ্ধান্তদর্শনের দূরগত সম্পর্ক বিদ্যমান। অভিনবগুপ্তের তন্ত্রসার (১০।১১শতক) শৈবতান্ত্রিকদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ শিতিকণ্ঠ আচার্যের মহানয়-প্রকাশ (১৩ শতকের পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমিত)। মধ্যযুগের (১৫০০-১৮০০) কাশ্মীরে মুসলমান-প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় সংস্কৃত ভাষা অপসারিত হইলেও হিন্দু এবং সূফী ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। মধ্যযুগে কাশ্মীরের তিনজন স্মরণীয় নারী কবি হইলেন,—লাল দিদি (১৪শতক। শিবস্তোত্র-গীতি); হব্‌বা খাতুন্ (১৬ শতক) এবং অরণীমাল (১৮ শতক)। এই যুগের অপর কয়েকজন কবির নাম—মুসলমান সন্ত্, শাহ্, নুরুদ্দীন বা নন্দঋষি (১৪ শতক। 'নূরনামা'—ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক 'শ্রুক' বা পদ্যাবলী); মুল্লা আহ্‌মদ (১৫ শতক। মহাভারতের অনুবাদ); হিন্দু কবি সাহিব কাউল (১৮ শতক। 'কৃষ্ণ-অবতার', 'জনমচরিত'—পুরাণ অনুসরণে); দিবাকর প্রকাশ ভট্ (১৮ শতক। 'রামাবতার চরিত', 'লবকুশযুদ্ধ' —রামায়ণ অবলম্বনে) প্রভৃতি।

দক্ষিণভারত : দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হিন্দুধর্মের তিন প্রধান দেবতা

হইলেন—শিব, রাম ও কৃষ্ণ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ দেশের ধর্মমত গড়িয়া উঠিয়াছে। কেবল ধর্মমত নহে, সাহিত্যেও তাহার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবিতভাবে পড়িয়াছে।

মহারাষ্ট্র: ত্রয়োদশ শতকে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য মতের দুইটি সম্প্রদায় দেখা যায়—মহানুভাব সম্প্রদায় ও বারাকরী সম্প্রদায়। মহানুভাব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুজরাটী ব্রাহ্মণ হরিপাল দেব (ওরফে চক্রধর)। ইনি নিরাকার কৃষ্ণ ও দেবর্ষি দত্তাত্রেয়ের উপাসক বিধায় নির্গুণ ভক্তি ও বিগ্রহ পূজার বিরোধী ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি রচনাবলী—আচার্যসূত্র, সিদ্ধান্ত সূত্রপাঠ, লীলাচরিত (চক্রধর-শিষ্য মহীন্দ্র রচিত চক্রধরের জীবনী), চক্রধরের অপর শিষ্য ভাস্করাচার্য প্রণীত শিশুপাল বধ (মহাভারত অবলম্বনে)। বারাকরী সম্প্রদায় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিমার্গের সাধক এবং জ্ঞানবাদী শৈবমত (নাথপন্থ) হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতে যোগাচার ও শৈব-দর্শনের উপাদান বিদ্যমান। বারাকরী সম্প্রদায়ের উপাস্য বিষ্ণু (=বিঠ্ঠল), ইনি কৃষ্ণও বটেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন—মুকুন্দরাজ ও জ্ঞানেশ্বর। মুকুন্দরাজের রচনা—বিবেকসিন্ধু ও পরমামৃত। জ্ঞানেশ্বরের প্রখ্যাত রচনা—ভগবদ্গীতার টীকা 'ভাবার্থদীপিকা (১২৯০)। [দ্রষ্টব্য: গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত 'জ্ঞানেশ্বরী গীতা' (সাহিত্য অকাদেমী)।]। জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী নামদেব (মৃত্যু ১৩৫০) কয়েকটি গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, দুইটি শিখ গুরু-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আলাউদ্দীন খিলজীর আক্রমণের ফলে মহানুভাব সম্প্রদায়ের লোকপ্রিয়তা কিয়দংশে বর্ধিত হয়। ক্রমশঃ মহানুভাব সম্প্রদায়ের দত্তাত্রেয়োপাসনা বারাকরী সম্প্রদায়ীরাও গ্রহণ করে। নরসিংহ সরস্বতী এবং জনার্দন স্বামী (একনাথের গুরু) উভয়েরই বারাকরী পন্থী ছিলেন। মধ্যযুগে (১৫৫০-১৮০০) মহারাষ্ট্রের সন্ত জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের পর উল্লেখ্য তিন জন হইলেন—একনাথ (১৫৪৮-৯৯), তুকারাম (১৫৮৮-১৬৪৯) এবং শিবাজীর গুরু-সমর্থ রামদাস (১৬০৮-৮২)। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরুত্থান-প্রয়াসে একনাথ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ইনি জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। একনাথের রচনাবলী—চতুঃশ্লোক ভাগবত, একনাথী ভাগবত (১১ স্কন্ধ অবলম্বনে), ভাবার্থ রামায়ণ, রুক্মিণী স্বয়ম্বর প্রভৃতি। একনাথের দৌহিত্র মুক্তেশ্বরও রামায়ণ-মহাভারতের করিয়াছিলেন। এই পর্যায়ের অপর তিনজন কবি হইলেন—দাসো পন্থ (গীতার্ণব), শিবকল্যাণ (কৃষ্ণ ও গোপীদের প্রেমমূলক কাব্য), লোলিম্বরাজ (কৃষ্ণের বাল্যলীলা)। ১৭ শতকের দুই দিকপাল—তুকারাম ও রামদাস। রামদাসের রচনায় ('দাস

বোধ') উত্তর-ভারতের তুলসীদাসের ভগবদ্‌বিশ্বাসের প্রভাব থাকিতে পারে। ১৭-১৮ শতকে মহারাষ্ট্রের সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা ও হরিবংশের অনুবাদ/অনুসরণ লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ এই কালসীমার কয়েকজন কবি ও তাঁহাদের রচনাবলীর উল্লেখ করা যাইতেছে—বামন পণ্ডিত [১৬১৫-৭৮। সমশ্লোকী গীতা, যথার্থ দীপিকা (গীতার টীকা), নিগমসার], রঘুনাথ পণ্ডিত (১৬৫০। নলদময়ন্তী-স্বয়ম্বর), শ্রীধর (১৬৭৮-১৭২৮। পাণ্ডবপ্রতাপ, রামবিজয়, হরিবিজয় —ভাগবত অবলম্বনে), অমৃত রায় (১৬৯৮-১৭৫৩। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ, ধ্রুবচরিত্র), মহীপতি (১৭১৫-৯০। ভক্তবিজয়, সন্তবিজয়, ভক্তলীলামৃত, সন্তলীলামৃত। এইগুলি জীবনচরিত কাব্য), ময়ূর পণ্ডিত (১৭২৯-৯৪। ভাগবত ও হরিবংশ অবলম্বনে কাব্য ও মহাভারতের অনুবাদ)।[৫৪]

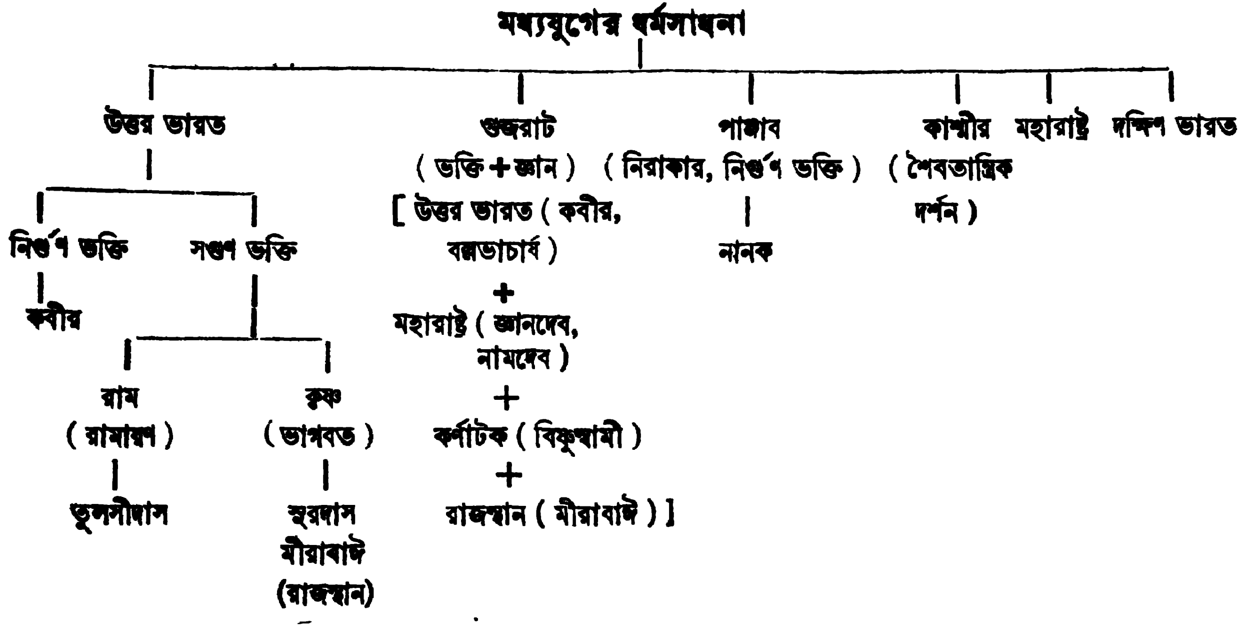
অন্ধ্র: দ্বাদশ শতকে দক্ষিণভারতে হিন্দু ধর্মের দুই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়—তমিল খণ্ডে বৈষ্ণব রামানুজসম্প্রদায় এবং কর্ণাটকের শৈব লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়। তেলেগু ধর্মচিন্তায় ও সাহিত্যে উভয় সম্প্রদায়েরই প্রভাব বর্তমান। তেলেগু সাহিত্যের মধ্যযুগ বলিতে ১৩-১৮ শতক পর্যন্ত বোঝায়। এই যুগের রচনায় মহাভারত, জৈমিনী ভারত, রামায়ণ, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ, কয়েকজন কবি ও তাঁহাদের রচনার আকর গ্রন্থগুলির নাম প্রদত্ত হইল—নন্নয় ভট্ট (মহাভারতের আদি, সভা ও বন পর্বের অনুবাদ); এর্রন প্রগড় (মহাভারতের বনপর্ব, রামায়ণ, হরিবংশ ও নৃসিংহপুরাণ); রঙ্গনাথ (রামায়ণ); মরন্নই (মার্কণ্ডেয় পুরাণ); নচন্ন সোম (হরিবংশ), বম্মের পোতন (ভাগবত পুরাণ); ভক্তরুদ্র্য্য (জৈমিনীভারত); 'অন্ধ্র কবিতা-পিতামহড়ু' অল্লসানি পেড্ডানা (স্বরোচিশমনুচরিত—মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে) তেন্নালি রামকৃষ্ণ (পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্য—মহাভারত অবলম্বনে); কনকান্তি পাপারাজ (উত্তর রামায়ণ) প্রভৃতি। ১৮-১৯ শতকে কর্ণাটকী সঙ্গীতের প্রবক্তা ত্যাগ রাজ রামমহিমাজ্ঞাপক কয়েকটি ভজন ('ধ্রুপদকীর্তনম্‌') রচনা করিয়াছিলেন।

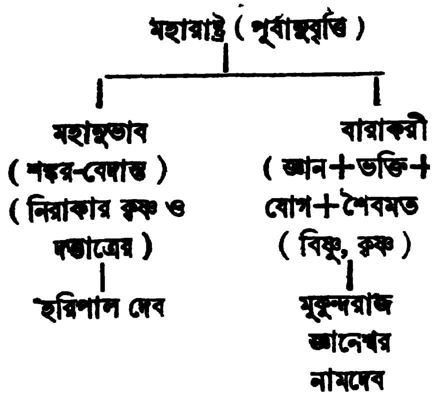
কর্ণাটক: কর্ণাটকে দ্বাদশ শতকে জৈনধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিস্পর্ধী রূপে দেখা যায়—বাসব-প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী শৈব লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের কয়েকজন কবি হইলেন—হরিহর (শিবগণদর গলে); রাঘবাঙ্ক (হরিশ্চন্দ্র কাব্য); কুমার পদ্মরস (স্কন্দপুরাণ অবলম্বনে সানন্দচরিত্র); ব্রাহ্মণ রুদ্রভট্ট (বিষ্ণু পুরাণ অবলম্বনে জগন্নাথ-বিজয়); কুমুদেন্দু (রামায়ণ)। ১৫ শতকের প্রথম দিকে কর্ণাটকে উত্তর ভারতের রামানন্দ ও দক্ষিণ ভারতের রামানুজের প্রভাব লক্ষিত হয়

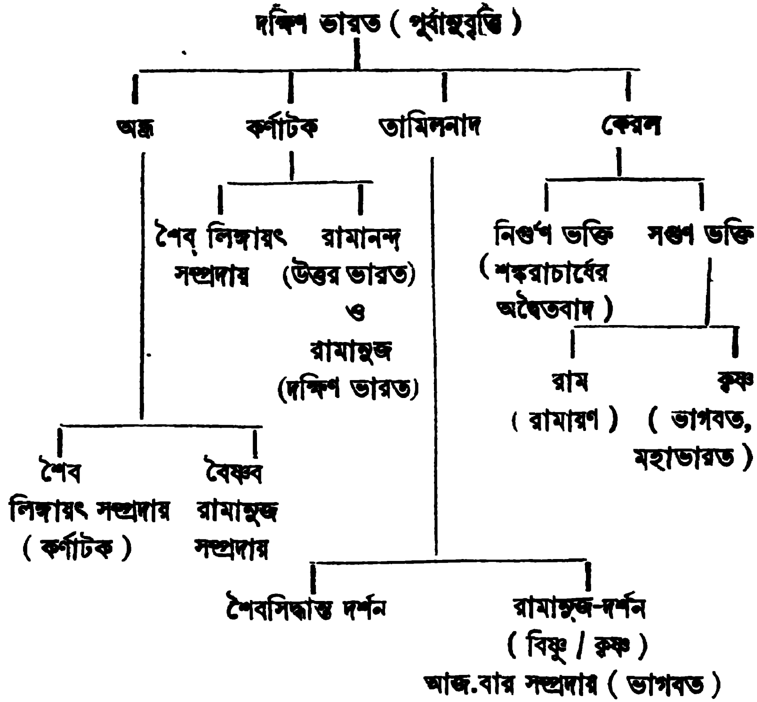
রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত পুরাণের নূতন করিয়া অনুবাদ কার্য আরম্ভ হয়। এই সময় 'দাস' নামে আখ্যাত একদল বৈষ্ণব সাধুর (পুরন্দর দাস, কনক দাস প্রভৃতি) উদ্ভব হইয়াছিল। ইহারা পদরচনা করিতেন এবং 'দাসর 'পদ গলু' গ্রন্থে [রেভাঃ ডঃ 'মোয়েগ্‌লিঙ্‌ (Moegling) কর্তৃক সম্পাদিত, ১৮৫৩] ইহাদের ৪০২টি গান সঙ্কলিত হইয়াছে।

তামিলনাদ: ভারতীয় ধর্মসাধনায় ও সাহিত্যসৃষ্টিতে তামিলনাদের শৈব ও বৈষ্ণব সাধু-সন্তদের রচিত ধর্মীয় পদগুলির অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ ব্যতীত ১১-১৪ শতকে তামিল সাহিত্যে শিবভক্তির ধারা লক্ষিত হয়। এই শিবভক্তি শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। মেকণ্ঠ তেবর (মৃত্যু: ১২২৩) প্রণীত 'চিব-কিনান-পোতম্‌' (=শিবজ্ঞানবোধম্‌), বিল্লিপুত্তুরুরের মহাভারতের অনুবাদ, পরাঞ্জ্যোতির 'বেদারণ্যপুরাণম্‌' (শিবলীলা-বিষয়ক কাব্য) প্রভৃতি তামিল সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী। শিবোপাসনার পাশাপাশি তামিলনাদে বিষ্ণুর উপাসনাও দেখা যায়। ১১ শতকে বৈষ্ণব সন্ত শ্রীনাথমুনি (ইনি শিবস্তোত্রগ্রন্থ 'শৈব তিরুমুরই'-র সংগ্রাহক নম্পি-ই-আম্বর নাম্পির তুল্য) ১৮ জন আজ্‌বার (*Āz. Vār*) রচিত ৪০০০ স্তোত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন ('নাল আঈর-প্‌-পরিপন্তম্‌' *Nāl-Āyira-P-Paripantam*)। এই স্তোত্র-সংগ্রহটি তামিল বৈষ্ণবদিগের নিকট বেদতুল্য। শিবস্তোত্র-সংগ্রহ ('শৈব তিরুমুরই') এবং বিষ্ণুস্তোত্র-সংগ্রহ ('নাল-আঈর-প্‌-পরিপন্তম্‌')—উভয় গ্রন্থেই ভগবান্‌-(শিব / বিষ্ণু)-এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের উল্লেখ আছে। তামিল বৈষ্ণব-সাধিকা 'আন্তাল' ঈশ্বরকে কৃষ্ণরূপে দেখিয়াছিলেন। ইহার রচিত 'তিরুপ্‌পবই' নামক ত্রিশ শ্লোকাত্মক রচনায় প্রাকৃত নরনারীর প্রেমকে কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। প্রাকৃত প্রেমের ভগবৎপ্রেমে রূপান্তর উত্তর ভারতের কৃষ্ণভক্তি-ধর্মেরও বৈশিষ্ট্য।

কেরল: বেদান্ত-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কেরলের অধিবাসী ছিলেন। মলয়ালম্‌ সাহিত্যে ও ধর্মে তামিল ঐতিহ্য এবং তীব্র সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান। ১৫ শতকের চেরুশ্‌শেরি নাম্পুতিরি প্রণীত কৃষ্ণগাথা ('কৃষ্ণপ্‌পাততু') এবং পুনম্‌ রচিত 'রামায়ণ চম্পূ' (১৫৫০) হইতে বোঝা যায় যে, অদ্বৈত-বেদান্তের প্রভাব ব্যতীত কৃষ্ণ এবং রামভাবনাও কেরলে ছিল। ১৮ শতকের খ্যাতনামা কবি নাম্বার্‌ তুনচত্তু রামানুজ এজ্‌হুত্তচ্ছন্‌ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের ভাষানুবাদ করিয়াছিলেন।


মধ্যযুগের ধর্মসাধনা
উত্তর ভারত
গুজরাট
(ভক্তি + জ্ঞান)
[উত্তর ভারত (কবীর, বল্লভাচার্য)
+
মহারাষ্ট্র (জ্ঞানদেব, নামদেব)
+
কর্ণাটক (বিষ্ণুস্বামী)
+
রাজস্থান (মীরাবাঈ)]
পাঞ্জাব
(নিরাকার, নির্গুণ ভক্তি)
নানক
কাশ্মীর
(শৈবতান্ত্রিক দর্শন)
মহারাষ্ট্র
দক্ষিণ ভারত
নির্গুণ ভক্তি
কবীর
সগুণ ভক্তি
রাম
(রামায়ণ)
তুলসীদাস
কৃষ্ণ
(ভাগবত)
সুরদাস
মীরাবাঈ
(রাজস্থান)


মহারাষ্ট্র (পূর্বানুবৃত্তি)
মহানুভাব
(শঙ্কর-বেদান্ত)
(নিরাকার কৃষ্ণ ও দত্তাত্রেয়)
হরিপাল দেব
বারাকরী
(জ্ঞান+ভক্তি+ যোগ+শৈবমত
(বিষ্ণু, কৃষ্ণ)
মুকুন্দরাজ
জ্ঞানেশ্বর
নামদেব


দক্ষিণ ভারত (পূর্বানুবৃত্তি)
অন্ধ্র
কর্ণাটক
তামিলনাদ
কেরল
শৈব লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়
রামানন্দ (উত্তর ভারত)
ও
রামানুজ (দক্ষিণ ভারত)
নির্গুণ ভক্তি (শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ)
সগুণ ভক্তি
রাম
(রামায়ণ)
কৃষ্ণ
(ভাগবত, মহাভারত)
শৈব
লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়
(কর্ণাটক)
বৈষ্ণব
রামানুজ
সম্প্রদায়
শৈবসিদ্ধান্ত দর্শন
রামানুজ-দর্শন
(বিষ্ণু / কৃষ্ণ)
আজ.বার সম্প্রদায় (ভাগবত)

প্রদত্ত তালিকাতে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সংযোগ ছিল, যাহার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তিস্রোত, বিষ্ণু-কৃষ্ণ ও রামোপাসনা পূর্ব ভারতের ধর্মচিন্তার সহিত মিলিত হইয়াছিল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের তথা মিথিলা ও নেপাল-মোরঙ্গের ধর্মচিন্তা এবং সাহিত্যভাবনার সহিত অসমীয়া বৈষ্ণবসাহিত্য এবং সংস্কৃতির যে-যোগাযোগ ছিল, তাহা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন ভূখণ্ডের ধর্মচিন্তায় শৈব-শাক্ত-তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মমত দশম-একাদশ শতক হইতেই লক্ষিত হয়। নির্গুণ-নিরাকার ও সগুণ-সাকার উপাসনা, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিমার্গের কথাও মধ্যযুগে ভারতের নানা প্রদেশে নানা আকারে দেখা গিয়াছে। ভক্তিভাবনায় মধ্যযুগের তিন প্রধান ব্যক্তি হইলেন—উত্তরে বল্লভাচার্য, বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য এবং আসামে শঙ্করদেব। ভক্তি-পথের পথিক হইলেও ইঁহাদের মধ্যে সাধ্য ও সাধনার ভেদ আছে। চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গ রাগময়ী, উপাস্য রাধাকৃষ্ণ। ব্রজমণ্ডলের রাগাত্মিকা ভক্তিমার্গকে অনুসরণ করিয়া তিনি যে-রাগানুগামার্গের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাও অভিনব ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তি-সম্পর্ক বিধানই চৈতন্যপ্রবর্তিত রাগানুগামার্গের বৈশিষ্ট্য। রাগধর্মও নূতন নহে, শাক্তভাবনাতেও তাহা ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে পরিভ্রমণকালে চৈতন্যদেব তাঁহার ঈশ্বরভাবনা ও রাগাশ্রিত সাধনের কথাই তৎকালীন জনগোষ্ঠিকে অবগত করাইয়াছিলেন। ধর্ম চিরপুরাতন, আসমুদ্র-হিমালয় জনমানসে তাহা নানা ভাবে, নানা আকারে উদ্ভাসিত। চৈতন্যদেব সেই চির-পুরাতন ধর্মকেই নূতন করিয়া দেখিয়াছিলেন—উত্তর ও দক্ষিণ দেশের বিভিন্ন পরিবেশে তাঁহার এই সন্দর্শন চলিয়াছিল দীর্ঘ ছয় বৎসর যাবৎ। তাহার পর তাঁহার অষ্টাদশবর্ষব্যাপী আত্মনিমগ্নতা। তিনি কি পাইয়াছিলেন জানি না, তবে কি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দেয় অশান্ত সমুদ্রতীরবর্তী নীলাচল সচল জগন্নাথের শেষ লীলাভূমি অচল জগন্নাথ-ক্ষেত্র উড়িষ্যা।

॥ উড়িষ্যা খণ্ড ॥

চৈতন্যদেবের পূর্বে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, উড়িষ্যায় স্থিতিকালে এবং তিরোধানের পর উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম-বিশ্বাসে, গণমানসে ও সাহিত্য-সর্জনায় তাঁহার মতাদর্শের প্রতিফলন —ইহাই হইল বর্তমান খণ্ডের মূল আলোচ্য বিষয়। কালসীমা প্রধানতঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক।

উড়িষ্যা

॥ ১ ॥ উড়িষ্যা-রাজ্য ও রাজন্যবর্গ

নাম : রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অথবা প্রদেশের আকারেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। বর্তমান উড়িষ্যা বলিতে আমরা ভারতবর্ষের যে-ভূখণ্ডকে বুঝি, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে কিংবা তাহার পূর্বে সেই ভূখণ্ডের আকৃতি আরও অনেক বড় ছিল। আধুনিক উড়িষ্যা 'ওড্র', 'উৎকল' এবং 'কলিঙ্গ', এই তিন নামেই পরিচিত। কিন্তু মধ্যযুগে যে-বিস্তীর্ণ ভূভাগ কলিঙ্গ সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হইত, তাহার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল এইরূপ—দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমে দাক্ষিণাত্য (মাদ্রাজের কিয়দংশ) এবং পূর্বে বঙ্গ ও বিহার। এই বিশাল কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইতস্ততঃ অরণ্য ও পর্বতাকীর্ণ ছিল এবং ইহার বিস্তৃতি ছিল গোদাবরীর মোহানা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন সুহ্ম দেশ (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) পর্যন্ত। দক্ষিণ কোশল ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তীস্থান অর্থাৎ কেওঞ্ঝড় ও ময়ুরভঞ্জ হইতে মহানদীর পশ্চিম পর্যন্ত ভূভাগ 'ওড্রভূমি' বলিয়া পরিচিত এবং ওড্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল উৎকলভূমি বা 'উক্কল' বা 'উচ' (হিউ-এন-সাং-এর বিবরণ অনুযায়ী)।

প্রাচীনকালে কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অভিধা ছিল 'মুডু কলিঙ্গ' (*Mudu Kalinga*)। তামিল ভাষায় 'মুডু' শব্দের অর্থ হইল তিন। ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্য তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—উর্ধ্ব : গোদাবরী-গঞ্জাম ; মধ্য : পুরী-কটক ; নিম্ন : বালেশ্বর। দ্রাবিড় ভাষাভাষী এই ত্রিকলিঙ্গের অধিবাসীদিগকে আর্যেরা বলিত ত্রিকলিঙ্গা (>তেলিঙ্গা >তেলেগু)। 'ওড্র' ও 'উক্কল'[১] শব্দ দুইটিও দ্রাবিড়ীয়। প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষায় 'ওড্র' শব্দের অর্থ পলায়নপর (ধাতু : ওড্রু) এবং তামিল ভাষায় 'উক্কল' শব্দের অর্থ কৃষক।

'ওড্র', 'উক্কল' এবং 'কলিঙ্গ' এই তিনটি উপজাতি ভাষা, জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ইত্যাদিতে পরস্পর হইতে পৃথক ছিল। 'ওড্র' এবং 'উক্কল' এই দুই উপজাতির অনুপ্রবেশের ফলে কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংহতি বিনষ্ট হয়। কালক্রমে উক্কল ও কলিঙ্গ এই দুই উপজাতিরও বিলুপ্তি ঘটে এবং ওড্র উপজাতি অধ্যুষিত এই ভূভাগের নাম হয় 'ওড্রদেশ'। 'ওড়িষা' ওড্রদেশ শব্দের আধুনিক রূপ।

উড়িষ্যা রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত: প্রাচীন ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্য কিরূপে বর্তমান উড়িষ্যায় রূপান্তরিত হইল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রসঙ্গতঃ প্রদত্ত হইল। ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্যের উপর দিয়া খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীঃ সপ্তম শতক পর্যন্ত একাধিক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। সম্রাট অশোকের (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) কলিঙ্গ-বিজয় এবং তাহার পর কলিঙ্গরাজ খরবেলের (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) মগধ আক্রমণ এই রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যার প্রথম পর্যায়। সম্ভবতঃ খ্রীঃ তৃতীয় শতকে কলিঙ্গ দক্ষিণী অন্ধ্রদের করায়ত্ত হয়। ইহার পরেই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংহতি বিনষ্ট হইতে শুরু করে এবং খ্রীঃ সপ্তম শতকে কলিঙ্গের পতন হয়। কলিঙ্গের সিংহাসনে একাধিক বংশের রাজারা বসিয়াছিলেন। খ্রীঃ সপ্তম শতকে বর্তমান পুরী জেলার নাম ছিল কোঙ্গড (কোঙ্গনাড়ু। 'কোঙ্গ' অর্থাৎ যে-দেশের ভূমি কুটিল) এবং ইহা কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। কলিঙ্গের ভাগ্য বিবর্তনের সঙ্গে চোল ও চালুক্যবংশের ইতিহাসও বিশেষভাবে জড়িত। গুপ্ত-শাসনকালে স্বতন্ত্রপ্রদেশ হিসাবে উড়িষ্যার কোন অস্তিত্ব ছিল না; এমন-কি পঞ্চম শতকেও উড়িষ্যার জন্ম হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, উড়িষ্যার ইতিহাসের কোন ধারাবাহিকতা নাই। প্রাচীন কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর 'ওড্র' ও 'উৎকল ভুঁইঞা' এই দুই উপজাতি যথাক্রমে সম্বলপুরের মধ্য দিয়া কলিঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করে। কালক্রমে, ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্য বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশে সীমায়িত হয় এবং ওড্র উপজাতিরা প্রাধান্য লাভ করিয়া বর্তমান 'ওড়িবা' রাজ্যের উদ্ভব ঘটায়।

কোশল-গুপ্ত শাসনকালে উড়িষ্যা বর্তমান ভৌগোলিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং এই রাজগণই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উড়িষ্যার স্রষ্টা। খ্রীঃ নবম শতকের শেষাংশে দক্ষিণ কোশলের (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগ) রাজবংশের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে উক্ত রাজবংশের জনমেজয় মহাভাবগুপ্ত (কিংবা, তাঁহার পিতা মহাশিবগুপ্ত) সম্বলপুর (দক্ষিণ কোশলরাজ্যের অন্তর্গত) অঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণ কোশলের এই রাজকুল 'পরমমহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর সোমকুলতিলক ত্রিকলিঙ্গাধিপতি' বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিতেন। জনমেজয় মহাভাবগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র যযাতি ত্রিকলিঙ্গের শাসক হইয়াছিলেন। যদিও উড়িষ্যার ৮।৯ শতক হইতে চোল রাজাদের বহু অভিযানের কথা পাওয়া যায়, তবুও কোশল-গুপ্ত রাজগণের শাসনকালে তাঁহাদের আধিপত্য শিথিল ছিল। খ্রীঃ নবম শতকের শেষে (১০৭০) চোলগঙ্গবংশীয় রাজরাজ ওরফে রাজকেশরী বর্মণ চোলদেব (রাজেন্দ্র চোল?) উড়িষ্যা অবরোধ করেন এবং

১০৭৬ খ্রীঃ উড়িষ্যায় এই বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোশল-গুপ্ত রাজবংশের রাজা যযাতি মহাশিব গুপ্তই উড়িষ্যা রাজ্যের জনক।[২] ইনি তাঁহার সিন্ধুতীরবর্তী তিনটি রাজ্যের নাম দিয়াছিলেন—উৎকল, কোঙ্গদ (=পুরী) এবং কলিঙ্গ (সম্ভবতঃ বর্তমান গঞ্জাম)। দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে কোশল-গুপ্ত রাজ্যকালের অবসান ঘটে এবং ইহার পর, উড়িষ্যায় চোলগঙ্গ নৃপতিদের শাসনকালের সূত্রপাত হয়। এই বংশের প্রথম নৃপতি চোলগঙ্গদেব পুরীর মন্দির নির্মাণ করেন।[৩]

উড়িষ্যা একক স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয় 'গজপতি' (সূর্যবংশীয়) রাজগণের আমলে। এই বংশের শাসনকাল ১৪৩৫-১৫৪০ খ্রীঃ। সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম ও প্রধান পুরুষ গজপতি কপিলেন্দ্রদেব। ইনি স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে উড়িষ্যায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরবর্তী দুই বিশ্রুত নৃপতি হইলেন—পুরুষোত্তমদেব এবং প্রতাপরুদ্রদেব। প্রতাপরুদ্রদেবের সময়ই চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় পদার্পণ করেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর স্বাধীন উড়িষ্যার গৌরবরবি অস্তাচলগামী হয়। প্রতাপরুদ্রের অন্যতম মন্ত্রী শূদ্র 'ওড চাষা' গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্রের পুত্রদের হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করে (১৫৪২ খ্রীঃ) এবং উড়িষ্যায় 'ভোই' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ভোইবংশের পর উড়িষ্যার নৃপতি হন তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের মৃত্যুর (১৫৬৮ খ্রীঃ) পর উড়িষ্যা মুসলমান-অধিকৃত হয় এবং স্বাধীন উড়িষ্যা রাজ্যের পতন ঘটে।

রাজ-বংশাবলী : প্রাচীন ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন উড়িষ্যার উদ্ভবকাল পর্যন্ত তিনটি রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়—(ক) চন্দ্রবংশীয় কোশল-গুপ্ত রাজবংশ; (খ) চোলগঙ্গ রাজবংশ; (গ) সূর্যবংশীয় গজপতি রাজবংশ। প্রসঙ্গতঃ এই তিনটি রাজবংশের বিভিন্ন নৃপতিবর্গের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল—

(ক) কোশলগুপ্ত রাজবংশ : উদয়ন (৭৩৫ খ্রীঃ) > তৎপুত্র ইন্দ্রবল > তৎপুত্র নন্নদেব > তৎপুত্র তীবর মহাশিব (৮০০-২০ খ্রীঃ) > তৎভ্রাতা হর্ষগুপ্ত > তৎপুত্র বালার্জুন মহাশিব > ?-মহাভাবগুপ্ত > মহাশিবগুপ্ত > জনমেজয় মহাভাবগুপ্ত (৯২৭ খ্রীঃ) > যযাতি মহাশিবগুপ্ত (৯৪৩ খ্রীঃ) > ভীমরথ মহাভাবগুপ্ত (সম্ভবতঃ ৯৬০ খ্রীঃ)।

ভীমরথ মহাভাবগুপ্তের বংশধরদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মাদলাপঞ্জীতে যযাতির পরবর্তী রাজগণের একটি বিরাট তালিকা পাওয়া যায় বটে, তবে তাহা প্রমাণ সিদ্ধ নহে।[৪]

(খ) চোলগঙ্গ রাজবংশ : চোলগঙ্গদেবে ওরফে রাজেন্দ্র চোল ? (১০৭৬-১১৪৭) > কামার্ণব (১১৪৭-৫৬) রাঘব (১১৫৬-৭০) > রাজরাজ ১ম (১১৭০-৯০) > অনিরুদ্ধ ভীম (১১৯০-৯৮) > রাজরাজ ২য় (১১৯৮-১২১১) > অনঙ্গভীম (১২১১-৪৫) > নরসিংহদেব ১ম (১২৪৫-৬৪) > ভানুদেব ১ম (১২৬৪-৭৯) > নৃসিংহদেব ২য় (১২৭৯-১৩০৬) > ভানুদেব ২য় > নৃসিংহ ৩য় > ভানুদেব ৩য় > নৃসিংহ ৪র্থ।[৫]

(গ) সূর্যবংশীয় গজপতি রাজবংশ : কপিলেন্দ্রদেব+পার্বতীদেবী (১৪৩৫-৭০) > পুরুষোত্তমদেব + রূপাম্বিকা বা পদ্মাবতীদেবী (১৪৭০-৯৭) > প্রতাপরুদ্রদেব + গৌরী, পদ্মা, পদ্মালয়া, ইলা, মহিলা, ভানুমতী, বিদ্যুকান্তি (১৪৯৭-১৫৪০) > পুরুষোত্তম বড়জেনা, কালুআদেব, কখাড়ুআদেব, বীরভদ্রদেব, জগন্মোহিনী বা তুক্কা (কন্যা)।

ভোই রাজবংশ : গোবিন্দবিদ্যাধর (১৫৪২-৫৩) > চক্রপ্রতাপ (১৫৫৩-৫৭) > নরসিংহ জেনা (১৫৫৭-৫৯), রঘুরাম জেনা (১৫৫৯-৬০) ...... > মুকুন্দদেব।[৬]

॥ ২ ॥ চৈতন্যপূর্ব উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম, জগন্নাথ ও সমন্বয়বাদ

উড়িষ্যার ধর্ম-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়—আর্য (Aryan), দ্রাবিড় (Dravidian) ও নিষাদ বা শবর (Austric)। অশোকের অনুশাসন (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) এবং খরবেলের হস্তীগুম্ফা গুহালিপি (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) হইতে মনে হয়, উড়িষ্যার আদি শবর অধিবাসীরা আর্যেতর হইলেও সম্ভবতঃ সংস্কৃতিহীন ছিল না। ইহার অন্যতম প্রমাণ, উড়িষ্যার দেবায়তন-শিল্প। বৃহদায়তন এই মন্দিরগুলির গঠনে ও অলঙ্করণে উড়িষ্যার সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিবিম্বিত। ওড়িয়া-সাহিত্য লোকসাহিত্য, এই সাহিত্যের প্রকৃতি সংমিশ্রণাত্মক (Cosmopolitan) এবং ইহা নানা মতাদর্শে (বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, তন্ত্র, বৈষ্ণব) পুষ্ট।

'The national life and culture of Orissa form a highly interesting amalgam, evolved out of Dravido-Aryan-Austric elements....The Symbol of this purely indigenous Indian cultural synthesis is the shrine of Jagannatha. Originally a god of the tribal Savaras, and adopted later successively by the Aryan faiths of Jainism, Buddhism, Tantricism and Vaishnavism,

Jagannatha bears the indelible impress of each of these cults even to-day.'

'It is an additional proof of the proletarian character of this (Odia) literature that, as we proceed from period to period, we find it deeply coloured by the changing religious faiths of the people under successive historic dynasties'.

'Acceptance by the Odras of the Savara-god, Neelamadhaba, as their common tribal deity, has ultimately, revolutionised Hinduism through the evolution of Jagannatha.'[৭]

বৌদ্ধ-সংস্কৃতির চিহ্ন উড়িষ্যার সর্বত্র বিদ্যমান। উড়িষ্যার প্রাচীন অনুশাসন, শিলালিপি, দানপত্র প্রভৃতি (অশোকের অনুশাসন, খরবেলের হস্তীগুম্ফা গুহালিপি, অনন্তবর্মা বজ্রহস্তদেবের অনুশাসন, ভুবনেশ্বরের মন্দিরলিপি ইত্যাদি) সংস্কৃতে অথবা পালিতে রচিত। খ্রীঃ চতুর্থ শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের ফলে বৌদ্ধ ভৌমকর রাজগণও ব্রাহ্মণ্যধর্মানুবর্তী হন। বৌদ্ধ ভৌম রাজবংশের পর হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসী সোমরাজবংশের শাসনকালে রাজা যযাতি কান্যকুব্জ হইতে এক সহস্র ব্রাহ্মণ আনাইয়া উড়িষ্যাতে বসতি করান, এইরূপ জনশ্রুতি। এই ভাবে বঙ্গদেশের ন্যায় উড়িষ্যাতেও যাগযজ্ঞ-প্রধান বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়। খ্রীঃ সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। এই শতকে একটি গ্রন্থের (সম্বলপুরের রাজা ইন্দ্রভূতি রচিত 'জ্ঞানসিদ্ধি') বিষয়বস্তু হইল বজ্রযানতত্ত্ব, অথচ, জগন্নাথ-প্রণাম দিয়া গ্রন্থটির সূত্রপাত হইয়াছে। খ্রীঃ অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য উড়িষ্যাতে আসেন ও মঠস্থাপন (গোবর্ধন মঠ) করেন। শঙ্করাচার্যের আগমন উড়িষ্যায় বেদান্ত-মতবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারণা সূচিত করে। অষ্টম-নবম শতকে উড়িষ্যার পূর্বতন মহাযান বৌদ্ধমতের সহিত শিবশক্তিবাদী তন্ত্রমতের মিশ্রণ ঘটে। পুনশ্চ, বৈদিক ধর্মমত এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকমতের সহিত নাথধর্মের 'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ'-ও সংযুক্ত হয়।[৮] দ্বাদশ শতকের শেষে রামানুজ উড়িষ্যাতে আসেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় উড়িষ্যায় ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বাদশ শতকের শেষে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'বুদ্ধ'-কে ('কেশবধৃত বুদ্ধ-শরীর, জয় জগদীশ হরে') নবমাবতার রূপে স্বীকৃতি ওড়িয়া জনগণের মধ্যে বিষ্ণু-দেববিশ্বাসের (Cult) ধারণাকে দৃঢ়তর করিয়াছিল। আনুমানিক এই শতকেই ভুবনেশ্বরবাসী শৈব অবধূত নারায়ণস্বামী 'রুদ্রসুধানিধি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বিষয় শৈব-

ধর্মসংক্রান্ত, ভাষা ওড়িয়া।[৯] রামানুজের পর উড়িষ্যাতে আসেন নরসিংহমুনি ও ও নরহরিতীর্থ—ইহারা রামানুজের প্রারব্ধকর্মকে আরও অগ্রসর করিয়া দেন।

প্রাক্ চৈতন্যযুগে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মের কোন নিশ্চিত রূপরেখা পরিলক্ষিত হয় না। বৌদ্ধ-জৈন-শৈব-তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্মের সহিত একই সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর কথাও পাওয়া যাইতেছে (যথা—'সোমনাথ ব্রতকথা', 'নাগল চৌঠী' ইত্যাদি)। উড়িষ্যায় চৈতন্যের পদার্পণের পূর্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই ভূখণ্ডে আসিয়াছিলেন, ইহা সত্য বটে কিন্তু তাঁহাদের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ কি ছিল এবং এতদ্‌বিষয়ে তাঁহারা কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি-না. সেই সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে জানিবার সুস্পষ্ট উপায় নাই।

জগন্নাথ-দেববিশ্বাসে (Cult) নানা ধর্মমতের সংমিশ্রণ : উড়িষ্যার যাবতীয় ধর্মের কেন্দ্রমণি হইলেন জগন্নাথদেব। ইনি সমগ্র উড়িষ্যা রাজ্যের অধিদেবতা (State God)। ভারতের অন্যত্র এইরূপ একটি সমগ্র রাজ্যের দেবতার কথা শোনা যায় না। বলরাম দাসের (পঞ্চসখার অন্যতম) নামে প্রচলিত 'বট অবকাশ'-এ দেখা যায় যে, জগন্নাথদেব উড়িষ্যার সকল দেবতাকে লইয়া সভা করিতেছেন। যশোবন্ত দাসের (ইনিও পঞ্চসখার অন্যতম) 'প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা'(৫)-তে বলা হইয়াছে যে, মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারকা হইতেও পুরীর মহিমা অধিক। দিবাকর দাস ('জগন্নাথচরিতামৃত'।১৭) বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথের অংশ মাত্র। তিনি 'দারুব্রহ্ম' ('দারুব্রহ্মগীতা') সর্বাবতার-সমগ্র। বলরাম দাস ('বেদান্তসার-গুপ্তগীতা' ।১৩) এবং অচ্যুতানন্দের ('শূন্যসংহিতা' ।১) অভিমত একই। সুতরাং, এই জগন্নাথ দেবতাটির মধ্যে নানা দেবধারণার (যথা, অলেখ পুরুষ, অনাদি ব্রহ্ম নিরাকার কৃষ্ণ, বুদ্ধ জগন্নাথ) সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

চৈতন্যপূর্ব উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হইল তিনটি—(ক) জগন্নাথে মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ; (খ) নিরাকার পুরুষ ধারণা ; (গ) মন্ত্র ও যন্ত্রে বিশ্বাস। জগন্নাথ দাসের 'বট অবকাশ'-এ শৈব এবং তান্ত্রিক দেবতারাও জগন্নাথে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বলরাম দাসের 'অমরকোষগীতা', যশোবন্ত দাসের 'শিবস্বরোদয়' এবং জগন্নাথ দাসের 'তুলাভিনরাস'—শিববিষয়ক গ্রন্থ হইলেও জগন্নাথকেন্দ্রিক।

অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'-য় (১০) 'নাগান্ত' ও 'যোগান্ত' বিদ্যার উল্লে আছে। এইগুলি নিঃসন্দেহে নাগার্জুনীয় মাধ্যমিক ও বৌদ্ধযোগাচারবাদ-('নাগান্তব এবং 'যোগান্তক')-সম্ভূত এবং তন্ত্রসাধনার সহিত সম্পৃক্ত। নাগান্ত বিদ্যার প্রবর্ত বীরসিংহ বৈষ্ণব ছিলেন, বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক নহেন—'প্রভুঙ্ক শ্রীমুখংহু আজ্ঞা হোই

মাধুরি। নাগাম্ভ, বেদান্ত, যে যোগান্ত আদি করি ॥'—অচ্যুতানন্দ ('শূন্যসংহিতা' ৮, ১১)। তবে এই সকল বিদ্যার দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না।

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভেই গোরক্ষনাথ ঈশ্বরে পরিণত হইয়াছিলেন। সারলা দাসের মহাভারতে (পঞ্চদশ শতক) নকুল তাঁহার নিকট স্তম্ভনাদি বিদ্যা-শিক্ষার্থী হইয়াছেন (সভাপর্ব), শকুনি অক্ষক্রীড়ায় তাঁহার নিকট সাফল্য প্রার্থনা করিতেছেন ('গোরেখ সুমরি নেলে করে পাশাকাঠি'—সভাপর্ব)। যশোবন্ত দাসের 'গোবিন্দ-চন্দ্র টীকা'-তে গোরক্ষনাথ-হাড়িপার কাহিনী বিধৃত হইয়াছে। দীন কৃষ্ণদাস গোরক্ষনাথকে পরম বৈষ্ণব বলিয়াছেন ('নামরত্নগীতা')। চৈতন্যপূর্ব উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে 'শূন্য' বা পরমহংস-সাধনায় প্রাণায়ামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়; নাথধর্মের 'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ' এই সাধনপদ্ধতিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বলরাম দাসের 'বেদান্তসারগুপ্তগীতা' (৮) এবং 'ব্রহ্মাণ্ডভূগোল'-(১৬)-এ দেখা যায়, কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ 'সপ্তযোগসার টীকা'-তে মল্লিকানাথ-(মৎস্যেন্দ্র)-কে যোগশিক্ষা, অর্থাৎ, কি করিয়া দেহস্থিত বায়ুকে দুই চক্ষুর মধ্যস্থ 'ত্রিকূট'-এ উন্নীত করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে নাথধর্মের উপাদানও দুর্নিরীক্ষ্য নহে।

জগন্নাথ-সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিবরণ: পৌরাণিক সাহিত্য ও চৈতন্য-জীবনীবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে উড়িষ্যার পরমতীর্থ হইল পুরী। ইহা শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ('মৎস্য পুরাণ' ও 'বরাহপুরাণ' এবং 'প্রভাসখণ্ড') নামে খ্যাত এবং জগন্নাথদেব নীলমাধব বা পুরুষোত্তম নামে আখ্যাত হইয়াছেন। 'বৈষ্ণবতন্ত্র'-এ বলা হইয়াছে—'মথুরা-দ্বারকা-লীলা যা করোতি চ গোকুলে। নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ ॥'—অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-মথুরা-দ্বারকাদিতে যে-সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, নীলাচলে সেই সমস্ত লীলাই প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্র ভৌমবৈকুণ্ঠ, ভগবান্ বিভিন্ন মূর্তিতে তথায় অধিষ্ঠিত আছেন (চৈতন্য-চরিতামৃত, ২।২০)। জগন্নাথদেব হইলেন দারুব্রহ্ম, ঋগ্বেদে এই দারুব্রহ্মের উল্লেখ আছে—'অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্। তদা লভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥' (১০।১৫৫।৩)। সায়ণাচার্য এই ঋকমন্ত্রের ভাষ্য করিয়াছেন—'আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপুরুষং নির্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্লবতে জলস্যোপরি বর্ততে তদ্দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোতরা লভস্ব, আলম্বস্ব, উপাস্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েণ দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং

বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ ॥'—অর্থাৎ, দূরবর্তীস্থানে বিরাজিত অপৌরুষেয় যে-কাষ্ঠনির্মিত পুরুষোত্তম নামক দেবমূর্তি সমুদ্রতীরে বর্তমান, হে অমর-স্তবকারী! সেই দারুব্রহ্মকে আশ্রয় কর এবং তাঁহার উপাসনার দ্বারা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবলোকে গমন কর (F. Max Muller—*Rige Veda Sanhita* Vol.VI, London 1874,P. 549)। স্কন্দপুরাণ-উৎকলখণ্ডে (২১।৩—বঙ্গবাসী সংস্করণ) পূর্বলিখিত ঋকমন্ত্রটির প্রতিবচনও দেখিতে পাওয়া যায়—'য এব প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমুপাস্ত দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি সুদুর্লভাম্ ॥'

অনেকে (স্টার্লিং, কানিংহাম্, ফার্গুসন প্রভৃতি) পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, এই তিন বিগ্রহকে বৌদ্ধ 'দন্তপীঠ' ও বৌদ্ধ ত্রিরত্নের (বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ) প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন এবং জগন্নাথমন্দির-শীর্ষস্থ সুদর্শনচক্রকে বৌদ্ধ ধর্মচক্র বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহাদের মতের সপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি হইল এই—(ক) জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা যথাক্রমে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ-এর প্রতিরূপ; (খ) জগন্নাথ নবম বুদ্ধাবতার রূপে গৃহীত (তুলনীয় : জয়দেবের গীতগোবিন্দ); (গ) পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বর্ণভেদহীনতা; (ঘ) ত্রিশূল ও চক্র বৌদ্ধধর্মের প্রতীক; (ঙ) রথযাত্রা বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত। কিন্তু এই যুক্তিগুলি সর্বসম্মত নয়,—কারণ, (ক) হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। জগন্নাথ স্বয়ংরূপভগবান, বলরাম স্বয়ং-প্রকাশ এবং সুভদ্রা স্বরূপশক্তিরূপিণী; (খ) প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে দশাবতারের অন্তর্গত বুদ্ধমূর্তি হইল ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, করপদহীন জগন্নাথ-মূর্তি নহে; (গ) উড়িষ্যাতে, বর্ণভেদপ্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত, কেবল মহাপ্রসাদ ভক্ষণে তাহা অনুসৃত হয় না (ঘ) ত্রিশূল এবং চক্র এই দুইটি প্রতীককেও বৌদ্ধধর্মাত্মক বলা যায় না, কারণ, উক্ত দুইটি প্রতীক যথাক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মসম্মত; (ঙ) জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বুদ্ধদেবের রথযাত্রার অনুকরণ নহে, রথের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে।[১০]

খ্রীঃ পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, তাঁহার সময়ে শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল কিন্তু সপ্তম শতকে হিউ-এন-সাঙয়ের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে শ্রীক্ষেত্রে বুদ্ধধর্মপ্রচার বিঘ্নিত এবং বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে। এই ধারণাও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। এই বিষয়ে L. S. S. O' Malley-র অভিমত হইল (*Puri Gazeteers* (1929) Ch. IV. P. 102 & 103)—

'There are weighty reasons for rejecting the theory of

Buddhist origin. The legend of Buddha's tooth is after all only a legend, the historical basis of which has not been proved.'

O' Malley, পুনশ্চ, জগন্নাথ-সম্পর্কিত বুদ্ধের নবমাবতার বিষয়ক ধারণাকে স্থানিক বা আঞ্চলিক বলিয়াছেন—'Jagannath for Buddha as the ninth Avatara is purely local.'

সুতরাং, জগন্নাথ-সম্পৃক্ত বৌদ্ধমতবাদ সর্বজনসম্মত নয়। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী হইতে শ্রীক্ষেত্র ও জগন্নাথদেব সম্বন্ধে যে-ধারণা জন্মে, তাহাও বৌদ্ধমতবাদকে সমর্থন করে না। ঋগ্বেদের সূক্ত ও সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্যকে যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করা না যায়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের বহু পূর্ব হইতেই শ্রীক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ বর্তমান।

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী: নীলমাধব ও দারুব্রহ্ম সম্পর্কে বিবিধ পুরাণে ['স্কন্দপুরাণ' (উত্তরখণ্ড, ১।১৯), 'নারদপুরাণ' (উত্তরখণ্ড, ৫৪।২২।৬৫), 'পদ্মপুরাণ' (পাতালখণ্ড, ৯), নীলাদ্রিমহোদয় (৪র্থ খণ্ড) প্রভৃতি] বিভিন্ন কাহিনীর অনুসন্ধান পাওয়া যায়। 'দেউলতোলা' নামক কবিতা-পুস্তকেও পৌরাণিক কাহিনীর অনুরূপ একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মূল কাহিনীটি সাধারণভাবে হইল এই—

সত্যযুগে সূর্যবংশীয় অবন্তীরাজ বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণের (মতান্তরে বৈষ্ণবের) নিকট নীলমাধবের কথা শুনিয়া তাঁহার সন্ধানার্থে বিভিন্ন দিকে ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজপুরোহিত (মতান্তরে, পুরোহিত-ভ্রাতা) বিদ্যাপতি ব্যতীত সকলেই বিফল মনোরথ হইলেন। বিদ্যাপতি শবরভূমিতে শবর-দলপতি বিশ্বাবসুর আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তাঁহার কন্যা ললিতার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিশ্বাবসুই তাঁহাকে নীলমাধব দর্শন করাইয়াছিলেন। এই নীলমাধবের আকৃতি ছিল কি-না, অথবা, ইহা একখণ্ড নীলবর্ণের (বা কৃষ্ণবর্ণের) প্রস্তরমাত্র, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বিদ্যাপতির মাধ্যমেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের সংবাদ পাইলেন এবং তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য শবরভূমিতে গমন করিলেন। নীলমাধব কিন্তু আসিলেন না এবং রাজা স্বপ্নাদেশ পাইলেন যে, দারুব্রহ্মরূপে তিনি সিন্ধুতটে উপনীত হইবেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চিহ্নিত সেই দারু সিন্ধুতটে আসিলে শবর বিশ্বাবসু ও ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির সহায়তায় উহা ভূমিতে উত্তোলিত হইল। স্বয়ং ভগবান্ (মতান্তরে, ছদ্মবেশী বিশ্বকর্মা) ঐ দারু হইতে তিনটি দেববিগ্রহ নির্মাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালশর্ত ভঙ্গ করায়

(শর্তানুসারে এই কালসীমা ছিল একবিংশ দিবস) বিগ্রহ তিনটি পূর্ণাঙ্গ হইল না পরে, উক্ত বিগ্রহত্রয় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা রূপে শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অপরাপর পুরাণে এই কাহিনীরই রূপভেদ দেখা যায়। 'নারদীয় পুরাণ'- মহাদারু হইতে যে-ত্রিমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল তাহা অপূর্ণাঙ্গ নহে এবং এই পুরা কাহিনীতে শবরের কোন উল্লেখ নাই। 'স্কন্দপুরাণ'-এর কাহিনীতে ইন্দ্রদ্যু নির্দিষ্টকাল অন্তে (পঞ্চদশ দিবস) মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া রত্ন সিংহাসে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শনের দর্শন পাইয়াছিলেন। এই কাহিনীতে শবরে উল্লেখ আছে এবং বিগ্রহগুলিও পূর্ণাঙ্গ। 'কপিলসংহিতা'-র বর্ণনাও প্রায় একই রূপ। 'নীলাদ্রিমহোদয়'-এ জগন্নাথদেবের আবির্ভাবের বিবরণ-প্রসঙ্গে মূল বিষয়বস্তু পার্থক্য না থাকিলেও দেববিগ্রহের সংখ্যা সাতটি বলা হইয়াছে—জগন্নাথ (জনার্দন) বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন, বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ও মাধব। এই দেববিগ্রহগুলি হস্তচর গুপ্ত থাকায় আপাত-অপূর্ণ বোধ হইলেও পূর্ণাঙ্গ ('এবং সপ্তবিধা বিষ্ণোর্দার রূপধরস্য বৈ। প্রকাশমূর্তয়ো বেত্তাং বর্ধকিশ্চ ন বিন্ততে॥')। 'পদ্মপুরাণ'-এর বিবর অনুসারে কাহিনীর নায়ক ইন্দ্রদ্যুম্ন নহেন, কাঞ্চীরাজ রত্নগ্রীব। ইনি জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট নীলপর্বতস্থ পুরুষোত্তমধামের কথা জানিতে পারেন। এই পুরুষোত্তম মূর্তি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণুর এবং এই মূর্তি ভীলগণের দ্বারা পূজিত হইত।

নানা ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ঃ জগন্নাথদেব-সম্পর্কিত কিংবদন্তিমূলক ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিকতার প্রশ্ন না তুলিলে এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, শ্রীক্ষেত্রে এই দেবতাটির মধ্যে নানা মতের সমন্ব হইয়াছে। জগন্নাথ রূপে দারুব্রহ্ম, অরূপে নীলমাধব। জগন্নাথ-মূর্তির অপূর্ণতা অপ্রাকৃত মূর্তির ইঙ্গিত বহন করে। কাহিনীর মধ্যেও আর্য এবং আর্যেতর ধর্মবিশ্বা ও সংস্কৃতির মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে। শবর-পূজিত নীল বা কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড (Totem) এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রতিষ্ঠিত পুরুষোত্তম এক হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণের সহিত শবরীর বিবাহ (ওড্র উপজাতিরা বৃত্তিতে শবর ছিল) সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পরিপোষক। শবরদেবতা নীলমাধব এইভাবে আর্যদেবতা বিষ্ণু-জগন্নাথের সাঙ্গীকৃত হইলেন। জগন্নাথ-মন্দিরের দেবপরিবারের মধ্যেও এই সমন্বয়ের ভাবটি স্পষ্ট— জগন্নাথ কৃষ্ণমূর্তি, বলরাম শুভ্রকান্তি, সুভদ্রা হিরণ্যদ্যুতি এবং সুদর্শন রক্তবর্ণ। এই বর্ণভেদকে অনেকে চাতুর্বর্ণের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র) সহাবস্থিতি বলিয়া মনে করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ব্যাখ্যা অনুসারে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণু-জগন্নাথের তিনটি শক্তি (চিৎ-মায়া-জীব) যথাক্রমে সুদর্শন, সুভদ্রা ও বলরামের মধ্যে

প্রকাশিত। সুভদ্রা কৃষ্ণের সর্বলক্ষ্মীময়ী আহ্লাদিনী শক্তি, যদিচ দ্বারকালীলায় তিনি কৃষ্ণের ভগিনী; আবার অনেকে জগন্নাথের মধ্যে পঞ্চদেবতার (শিব-দুর্গা-গণেশ-বিষ্ণু-সূর্য) সমন্বয় লক্ষ্য করেন। এই সমন্বয়ের অর্থ হইল, শৈব-শাক্ত-গাণপত্য-বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শের মিলন।

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের এই সমন্বয় সাধন শ্রীক্ষেত্রে কিভাবে ও কখন হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। শৈব দৃষ্টিতে 'জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ'; শাক্ত-বিশ্বাসে শ্রীক্ষেত্র-শক্তিপীঠের দেবী বিমলা, ভৈরব পুরুষোত্তম; বৈদান্তিকের নিকট তিনি প্রণবতনুধর; তন্ত্রমতে তিনি হংসতত্ত্ব; বৈষ্ণবধারণায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ; বৌদ্ধমতে তিনি নবমাবতার আদিবুদ্ধ; জৈন বিশ্বাসে তিনি মহাতীর্থঙ্কর সিদ্ধান্তমূর্তি—'যং দারুব্রহ্ম মূর্তিঃ প্রণবতনুধরং সর্ববেদান্তসারং। ভক্তানাং কল্পবৃক্ষঃ ভবজলতরণী সর্বং তথানুসারং। যোগীনাং হংসতত্ত্বং হরিহরনমিত শ্রীপতিঃ বৈষ্ণবানাং। শৈবানাং ভৈরবোঽসৌ পশুপতি পরমং শাক্ততত্ত্বে চ শক্তিকং। বৌদ্ধানাং বুদ্ধসাক্ষাৎ রূপভয়াতিবরো জৈন-সিদ্ধান্তমূর্তিঃ। তং দেবো পাতু নিত্যং কলিকলুষহরঃ নীলশিলাধিনাথঃ॥' মূল-মন্দিরের তোরণ চতুষ্টয়ও চতুর্বর্গের প্রতীক—পূর্ব (ধর্মঃ সিংহ), পশ্চিম (অর্থঃ হস্তী), উত্তর (কাম / জ্ঞানঃ অশ্ব), দক্ষিণ (মোক্ষ / বৈরাগ্যঃ ব্যাঘ্র)। দেবায়তন গঠনেও দক্ষিণ ভারতীয় 'গোপুরম্,' উত্তর ভারতীয় নাগরী রীতি এবং মন্দিরগাত্রচিত্রে লোকায়ত রীতির সম্মিলন হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রে এই মহাসম্মিলন সম্ভব হইয়াছে প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে। মধ্যযুগে মুসলমান-শাসনকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়, স্ব-স্ব ধর্মবিশ্বাসের সংরক্ষণ ও অনুশীলনের আকাঙ্ক্ষায় পুরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। ১৫।১৬ শতকে উড়িষ্যার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুদৃঢ় ছিল বলিয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এই ভূখণ্ডে উপনীত হইয়াছিলেন। রাজশক্তির সমর্থন ও সহাবস্থানের ফলে বিভিন্ন ধর্মপ্রতীতির সমন্বয়সাধন কিংবা সাঙ্গীকরণ কালে-কালে ঘটিয়া থাকিবে। কেবল ধর্মসমন্বয় নয়, শ্রীক্ষেত্রে মানবিকতার সমন্বয়ও হইয়াছে। বিগ্রহপূজায় এখানে বর্ণানুশাসন নাই, মহাপ্রসাদ গ্রহণেও জাতিভেদ তিরোহিত। জগন্নাথের দৈনন্দিন পূজানুষ্ঠানে, বিশেষতঃ, রথযাত্রায় মানবজীবনযাত্রার অনুকৃতি ও সর্বাতিশায়িতা লক্ষণীয়। রথরজ্জু-ধারণে কাহারও বাধা নাই। জনৈক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মনে করেন, ব্রজগোপীরা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে তৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছিলেন, জগন্নাথের রথযাত্রা সেই ব্রজগমনের বার্ষিক স্মৃতিচারণা[১১]। রথযাত্রার সামাজিক

তাৎপর্য হইল, গণসমাবেশ ও গণসহযোগিতা। অবশ্য, এই উদার মর্যাদার মূলে চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবৃন্দের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

॥ ৩ ॥ চৈতন্য-পূর্ব উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে 'অলেখ পুরুষ' শ্রীকৃষ্ণ

চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণের স্থান ছিল সঙ্কীর্ণ। দোষ-গুণান্বিত পৌরাণিক দেবতা হিসাবেই কৃষ্ণের পরিচিতি ছিল। সারলা দাস (১৫ শতক। মৃত্যুঞ্জয় রথ—সারলাচরিত। পৃঃ ৮৪) তাঁহার মহাভারতে (মুষলীপর্ব), চৈতন্য দাস তাঁহার 'নির্গুণ সংহিতা'-য় (১৬) কৃষ্ণের নিন্দাই করিয়াছেন। অবশ্য, চৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই উড়িষ্যাতে-যে কৃষ্ণধারণা ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। মার্কণ্ড দাসের (=মার্কণ্ডেয় দাস) 'কেশব কোইলি' (১৫ শতক), জগন্নাথ দাসের ভাগবতের অনুবাদ (চৈতন্য-সাক্ষাৎকারের পূর্বে রচিত), অচ্যুতানন্দের 'হরিবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থ কৃষ্ণকথার সহিত উড়িষ্যার পরিচিতির প্রমাণ দেয়। 'পঞ্চসখারা'-ও 'রাসলীলা' বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যথা—জগন্নাথ দাসের 'রাসক্রীড়া', অচ্যুতানন্দের 'নিত্যরাস', অনন্ত দাসের 'তুলশূন্যরাস', যশোবন্ত দাসের 'প্রেমভক্তি-ব্রহ্মগীতা' রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকেরও কথাবস্তু হইল রাধাকৃষ্ণলীলা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে জগন্নাথ অন্যতম বৈষ্ণবদেবতা, 'দারুব্রহ্ম'। চৈতন্যদেব জগন্নাথকে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি, বৃন্দাবনের কৃষ্ণের জন্য তাঁহার মনে ব্যাকুলতা ছিল। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-ধৃত (৩৮৭) এই শ্লোকটিতেও শ্রীরাধাকে কুরুক্ষেত্রে দয়িত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনসুখের মধ্যেও বংশীনিনাদিত যমুনাতীরস্থ কুঞ্জের জন্য আকাঙ্ক্ষিতা দেখা যায়,—'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্। তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥'

গৌড়ীয় বিশ্বাসে বৃন্দাবনই কৃষ্ণের লীলাভূমি, নীলাচল নহে। চৈতন্যদেবই জগন্নাথের সহিত কৃষ্ণের অভিন্নতা অর্থাৎ 'জগন্নাথ-কৃষ্ণ' ধারণাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'হেরাপঞ্চমী' উৎসবে এই জগন্নাথ-কৃষ্ণ বৃন্দাবনের জন্য উৎকণ্ঠিত হন (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৪ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথদেবের নিত্য পূজা-পদ্ধতির মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রভাব সুস্পষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন।

> 'If the rites of Jagannath are analysed, it will be seen that he has become to a great extent Gaudiya Vaishnava.'—S. Samantaraya—*Odiya Vaishnava Sahitya.* P. 3.

রাধা/সুভদ্রা ঃ সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতক হইতেই উড়িষ্যার ত্রিদেবতা হইলেন —বাসুদেব (=জগন্নাথ), সঙ্কর্ষণ (=বলরাম) ও একনংশা (=সুভদ্রা)। জগন্নাথ দ্বারকালীলার বাসুদেব-কৃষ্ণ, বলরাম—সঙ্কর্ষণ এবং একনংশা সুভদ্রা হইলেন কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণের ভগিনী। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ভীমধীবর তাঁহার 'কপটপাশা' কাব্যে কৃষ্ণপত্নীরূপে রুক্মিণী ও সুভদ্রার (?) উল্লেখ করিয়াছেন। রাধা বৃন্দাবনলীলার নায়িকা, সেইহেতুই পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে রাধা অনুপস্থিত। চৈতন্য-পরবর্তীকালে জয়দেব-বিদ্যাপতি এবং স্বয়ং চৈতন্যদেবের সূত্র ধরিয়া রাধিকা উড়িষ্যাতে পদার্পণ করিয়াছেন। অবশ্য, অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'-য় ও জগন্নাথ দাসের রাসক্রীড়া-বিষয়ক কবিতায় নিত্যরাধা ও নিত্যকৃষ্ণের কথা এবং যশোবন্ত দাসের 'প্রেমভক্তিব্রহ্ম-গীতা'-(৩)-তে রাধার উল্লেখ না থাকিলেও 'গোপীভাব'-এর ইঙ্গিত বর্তমান।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা গোস্বামীগণের বিশ্বাসে রাধা কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি, গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। গোপীভাব-সাধনা বৈষ্ণবধর্মে আকাঙ্ক্ষিত এবং চৈতন্যদেব 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' বলিয়া বিঘোষিত। উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে রাধা প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও গোপীভাবের স্বীকৃতি জগন্নাথদেবের জপমন্ত্রেও লক্ষিত হয়—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় নমঃ'।[১২] প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 'প্রেমভক্তি' বা 'রাগভক্তি' চৈতন্যের প্রভাব-সঞ্জাত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অষ্টাদশাক্ষরাত্মক জপমন্ত্রটি হইল—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। ওড়িয়া জপমন্ত্রে 'স্বাহা'-র পরিবর্তে 'নমঃ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে বলরামের প্রাধান্য, অর্থাৎ, দ্বারকালীলার প্রাধান্য কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কৃষ্ণ এবং মুখ্যলীলা হইল বৃন্দাবনলীলা। বত্রিশ অক্ষরাত্মক ষোড়শ নাম ('হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥') গৌড়ীয় ও উড়িষ্যার উভয় বৈষ্ণব-ধর্মেই বর্তমান।

জগন্নাথ—অলেখ-পুরুষ/নিরাকার কৃষ্ণ ঃ ওড়িয়া বৈষ্ণবধর্মে পরতত্ত্ব হইলেন অলেখ-পুরুষ। এই অলেখ-পুরুষ শূন্যরূপী নিত্য নিরাকার অনাদি ব্রহ্ম। আপন ইচ্ছানুসারে ইনি বস্তুজগতে প্রকাশিত হন। কৃষ্ণধারণা (cult) প্রবর্তিত হইবার পর এই অলেখ পুরুষই হইলেন নিরাকার কৃষ্ণ। 'তোহর রূপ রেখা নাহি। শূন্য-পুরুষ শূন্য দেহী॥' (বলরাম দাস—'বিরাট গীতা', ১)—এই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার বাসুদেব-কৃষ্ণ হইতেও মহীয়ান্। ইনি শূন্য পুরুষ, বিরাটরূপে স্থিত—'এক মুঁ মহাশূন্যে থাই। বিরাটরূপে থিলি মুহিঁ॥' (বলরাম দাস—'বিরাট গীতা', ১)।

অচ্যুতানন্দ দাস 'শূন্যসংহিতা'-(৯`-য় এই নিরাকার কৃষ্ণ-ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিরাকার পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আদিশক্তি রাধাসহ গোলোকে নিত্য বিরাজিত। এতদ্‌সম্পর্কে এই কাহিনীটি পাওয়া যায়—একদা দ্বারকায় কৃষ্ণের অষ্টমহিষী নিত্যধাম গোলোকে রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা-দর্শনে অভিলাষিণী হইলে দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'মহানিত্য শ্রীকৃষ্ণঙ্কু ডরই পুনি। গলে যে অকট হব, বারণ পড়িব ॥'—অর্থাৎ, আমি সেই মহানিত্য কৃষ্ণকে ভয় করি, সেইস্থানে গমন করিলে অঘটন ঘটিবে, সেইহেতু নিষেধ করিতেছি। তথাপি, মহিষীদিগের আগ্রহাতিশয্যে তিনি গরুড়কে ডাকিয়া মহিষীগণ সহ তাঁহাকে গোলোকে লইয়া যাইতে বলিলেন। কৃষ্ণ-সখা সুদামও সঙ্গে চলিলেন। গোলোক হইতে দুই যোজন দূরে যখন তাঁহারা পৌঁছিলেন, তখন সেই সহস্র সূর্যালোকিত প্রদেশে সুদাম ব্যতীত কেহ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। সকলেই দ্বারকা ফিরিলেন, কেবল সুদাম অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সুদামের সহিত সাক্ষাৎ হইল আদিশক্তি রাধার সখী গোলোকরক্ষাকারিণী 'বুদ্ধমাতা'-র। বুদ্ধমাতা সুদামকে বলিলেন—'অক্ষর বোলি সিনা বোলন্তি কৃষ্ণঙ্কু। বড়ি কহি দেলি তু ধ্যায় নিরাকারঙ্কু ॥'

ইনি হইলেন শূন্যরূপী, বত্রিশ অক্ষরাত্মক মন্ত্রের দ্বারা ইঁহার অর্চনা করিতে হয়। বুদ্ধমাতা এই মন্ত্রের তাৎপর্য সুদামকে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর সুদাম দ্বারকায় ফিরিলে কৃষ্ণ সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, নিরাকার কৃষ্ণের উপাসনা হইতেই শুদ্ধা ভক্তি জন্মে—'বুদ্ধমাতা আদিশক্তি সখীচ্ছন্তি কহি। নিরাকার ভজনে নির্মল আনন্দ পাই ॥' কৃষ্ণ সুদামকে কলিযুগে নিরাকার কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করিতে বলিলেন। অচ্যুতানন্দই হইলেন কৃষ্ণমিত্র সুদাম।

বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মবাদ ওড়িয়া বৈষ্ণব-ধর্মদর্শনে শূন্যবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব কিয়দংশে 'অলেখ-পুরুষ'-এ প্রতিবিম্বিত। সুদামের কাহিনী, রাধাকৃষ্ণ ও নিত্য গোলোকধামের ধারণাকে অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূন্যসংহিতায় প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই বিষয়ের পরিকল্পনাও তাঁহার নিজস্ব। তবে নাগার্জুন-ব্যাখ্যাত বৌদ্ধ শূন্যবাদ, ওড়িয়া শূন্যবাদ নহে। 'বুদ্ধমাতা'-র উল্লেখ করিয়া অচ্যুতানন্দ আদিবুদ্ধ জগন্নাথের ধারণাকে তদীয় শূন্যবাদের অন্তর্গত করিয়াছেন। নিরাকার কৃষ্ণোপাসনা হইতেই শুদ্ধাভক্তি জন্মে—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং রামানন্দ রায় (সাধ্যসাধন ক্রম। চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮ স্মরণীয়) সমর্থন করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-দর্শনে কৃষ্ণ পরতত্ত্ব, অপ্রাকৃত দেহী, নিত্য, সনাতন, সর্বশক্তিক ও সবিগ্রহ এবং রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক ভিন্নাভিন্ন (অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব)।

১৭।১৮শতকে চৈতন্যপূর্ব উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম-ধারণার অবলুপ্তি ঘটিলেও নিরাকার কৃষ্ণধারণা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই (দেবদুর্লভ দাসের 'রহস্যমঞ্জরী' ও দীনকৃষ্ণ দাসের 'নামরত্নাবলী' দ্রষ্টব্য)।

শূন্যসাধনা/পরমহংস-সাধনা : ওড়িয়া বৈষ্ণবগণের মন্ত্র হইতেছে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের মন্ত্র। চৈতন্য-আগমনের পূর্বেই উড়িষ্যাতে বত্রিশ অক্ষরাত্মক ষোড়শ নাম প্রচলিত ছিল।[১৩] উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে বলরামের প্রাধান্য; মন্ত্রোক্ত ('ওঁ রামকৃষ্ণ হরি') 'রাম' হইলেন বলরাম। অচ্যুতানন্দের মতে ('শূন্য-সংহিতা', ১) হরেকৃষ্ণাদি বত্রিশ অক্ষরযুক্ত ষোলটি নামের মধ্যে নিহিত প্রধান তিনটি বীজমন্ত্র হইল—হ্লীং (= হ্রীং), ক্লীং, শ্লীং (= শ্রীং)। এই তিনটি বীজমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হইলেন যথাক্রমে,—বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রা।—'এ নাম গুপত করি তিনি নাম কলে। হরে রাম কৃষ্ণ বোলি প্রভু আজ্ঞা দেলে॥' 'শূন্যসংহিতা'-য় অচ্যুতানন্দ পাঁচটি বীজ (হ্লীং, ক্লীং, শ্লীং ইত্যাদি), পাঁচটি বর্গ (Diagram or Symbol ; অনামবর্গ, নামবর্গ ইত্যাদি) এবং পাঁচটি আত্মিকের (জ্ঞান, ধ্যান, জীব, তত্ত্ব ও পরম) উল্লেখ করিয়াছেন।

শূন্যসাধন-পদ্ধতি বহুলাংশে তন্ত্রানুগ। একটি বিশেষ বর্গ, প্রতীক বা Symbol-এর উপর মনঃসংযোগ করিয়া শূন্যসাধনা বা পরমহংস-সাধনা করিতে হয়। প্রথমে 'অনাম' (অক্ষরশূন্য) বর্গ, পরে যথাক্রমে 'নাম' (একাক্ষরী) বর্গ, 'কামবীজ' (শ্রীকৃষ্ণদ্যোতক) বর্গ ইত্যাদি পঞ্চবর্গের পর আসে মন্ত্রের দ্বারা শূন্যোপাসনা। এই উপাসনার জন্য আসন ও দেহশুদ্ধির প্রয়োজন। হৃদয়ে বত্রিশ অক্ষরাত্মক মন্ত্র রক্ষা করিয়া সাধক ধ্যানমগ্ন হইবেন। ধ্যানের ফলে জীবশক্তি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হইয়া শূন্যে অবস্থান করিবে এবং সাধক 'পরমহংস'-এ লীন হইবেন। অচ্যুতানন্দ যন্ত্র (Symbol) ও মন্ত্রের ('মন্ত্র নিরাকার শূন্যভজন') সাহায্যে পরমহংস-সাধনার কথা বলিয়াছেন। মন্ত্রোক্ত ('ওঁ রামকৃষ্ণহরি' ;—'ওঁ' শব্দটির যথানুক্রমিক তাৎপর্য হইল—অনাম (অনাকার), নাম (একাক্ষর), এবং প্রণব।

ওড়িয়া বৈষ্ণবধর্মের 'শূন্যসাধনা' তান্ত্রিক ষট্চক্রভেদ, 'অজপা' মন্ত্রজপ এবং সমাধিপ্রাপ্তির অনুরূপ। 'পরমহংস' অবস্থাটিও তন্ত্রের আনুকূল্য সূচীত করে। ইহা বহুলাংশে ব্রহ্মসাযুজ্যের তুল্য। ওড়িয়া বৈষ্ণব-সাধনায় তন্ত্রসম্মত কায়া-সাধনার কথা নাই। ওড়িয়া শূন্যবাদ ও শূন্যসাধনা চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের বিরোধী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-বিষয়ে 'শ্রী' সম্প্রদায়-ভুক্ত, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

॥ ৪ ॥ উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম, জগন্নাথ ও চৈতন্যদেব

ষোড়শ শতকের পূর্বার্ধে উড়িষ্যায় এক ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের মর্মকথা হইল—অব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক ব্রাহ্মণ সমাজের বেদধর্ম-শাস্ত্রাদিতে অধ্যয়ন-অধিকারবিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।[১৪] চৈতন্যদেব যখন উড়িষ্যাতে গিয়াছিলেন (১৫০৯ খ্রীঃ), তখন, এই ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা প্রবলরূপে চলিতেছিল। তিনি অবশ্য ধর্মাচরণে জাতিবিচার ও স্থানীয় সংস্কারাদি পালন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তাঁহার অনুরাগী পঞ্চসখা (জগন্নাথ দাস ব্যতীত সকলেই শূদ্র), রামানন্দ রায়, প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ১৭ শতকে চৈতন্য-ধর্মবিশ্বাসের প্রচারক শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারি এবং ১৮ শতকে বলদেব বিদ্যাভূষণ—ইঁহারাও শূদ্র ছিলেন। জাতিভেদ বিষয়ে ঔদাসীন্যের নিমিত্ত 'শূদ্রপ্রধান ধর্মবিশ্বাসের নেতা' চৈতন্যদেবকে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ সমাজ অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বে উড়িষ্যাতে যে-বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ছিল, তাহার কেন্দ্রমূলে ছিলেন জগন্নাথদেব। এই জগন্নাথদেবের মধ্যে নানা ধর্মবিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রাজ্যের অধিদেবতা জগন্নাথদেবের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সময়সীমা ১৪৬৭-১৫৬৭ পর্যন্ত। ষোড়শ শতকে পুরীতে জগন্নাথ-বিষ্ণুর ছত্রছায়ায় শ্রী, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-ধর্মবিশ্বাসও অবস্থান করিতেছিল।[১৫] অথচ আশ্চর্যের বিষয়, চৈতন্যজীবনীকারগণ (গৌড়ীয় কিংবা ওড়িয়া) চৈতন্যদেবের সহিত এই সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের সংযোগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। পঞ্চসখাগণ তাঁহাদের রচনায় জগন্নাথদেবের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। বলরাম দাস 'জগমোহন রামায়ণ'-এর প্রথমাংশে জগন্নাথ-কৃষ্ণ ও তন্মহিষী রুক্মিণীর কথা বলিয়াছেন। পুনশ্চ, 'বট অবকাশ'-এ বলরাম দাস জগন্নাথের সঙ্গে লক্ষ্মী যাত্রা করিয়াছেন এবং 'লক্ষ্মী পুরাণ'-এ জগন্নাথ-মন্দির সংলগ্ন দেবায়তনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন।

জগন্নাথ-মন্দির/দ্বারকা ; গুণ্ডিচাবাড়ী / বৃন্দাবন : জগন্নাথদেবের মন্দির এবং গুণ্ডিচাবাড়ী যথাক্রমে দ্বারকা ও বৃন্দাবনের প্রতিরূপ। চৈতন্যদেব জগন্নাথকে কৃষ্ণ বলিয়াই মনে করতেন এবং এই কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ অর্থাৎ যাদব কৃষ্ণ। তাঁহার বিরহোন্মাদ-দশা হইল মথুরাগত কৃষ্ণের স্মরণে রাধার মনোবেদনা। 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ—' (রূপ গোস্বামী। পদ্যাবলী, ৩৮৩) শ্লোকে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার উক্তি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১)।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণই ছিল তাঁহার আরাধ্য। তথাপি তিনি বৃন্দাবনে থাকেন নাই, সন্ন্যাসী-জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পুরীর অরণ্য ও পর্বত তাঁহার নিকট ছিল—বৃন্দারণ্য ও গিরিগোবর্ধন।

দারুব্রহ্ম/নরব্রহ্ম: চৈতন্যদেব ছিলেন 'সচল জগন্নাথ' (বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত, ৩।৫), 'নরব্রহ্ম' (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮) এবং জগন্নাথ দেব হইলেন 'দারুব্রহ্ম' (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮), 'চৈতন্যবল্লভ' (সনাতন গোস্বামী—'শ্রীরঙ্গলীলা')। ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ (৪৬ সর্গ) তাঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলা হইয়াছে। 'গরুড় পুরাণ'-এর একটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, কলিযুগে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবিষ্ণু দারুব্রহ্মের সম্মুখে সন্ন্যাসী বেশে অবতীর্ণ হইবেন।

চৈতন্যদেবের নামে প্রচলিত (তাঁহার রচিত কি-না বলা যায় না) একটি স্তোত্রে[১৬] জগন্নাথের প্রতি চৈতন্যের আকূতি প্রকটিত—'কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন সঙ্গীতকবরো। মুদাভীরী নারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ॥ রমা-শম্ভু-ব্রহ্মা-সুরপতি-গনেশার্চিতপদো। জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥'—(জগন্নাথাষ্টক।১)। জগন্নাথদেবের সকল উৎসবই চৈতন্যদেবের প্রিয় ছিল, বিশেষতঃ রথযাত্রা উৎসব। রূপ ও রঘুনাথ দাসের 'চৈতন্যাষ্টক'-এ (যথাক্রমে ১।৭ এবং ৬) তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—'রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতেরদভ্রমপ্রেমোর্মিস্ফুরিতন টনোল্লাসবিবশঃ। সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥' অপিচ, 'পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেমনিবহৈঃ, ক্ষরন্নেত্রাম্বুভিঃ স্নাপিত নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ। সদাতিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ী গরুড়স্তম্ভচরণে, শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ॥' গরুড়স্তম্ভ হইতে জগন্নাথ-দর্শন, রথাগ্রে নর্তন (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৬) ইত্যাদি সকল ঘটনাই চৈতন্যের সহিত জগন্নাথের গভীর সম্পর্ক সূচীত করে।

বৌধরূপ/বোধাবতার: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জগন্নাথদেবের মধ্যে নানা ধর্মধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। একটি ধর্মধারণা অনুসারে পুরীর জগন্নাথ হইলেন 'বুদ্ধজগন্নাথ'। ত্রেতাযুগে দেহান্তের পর কৃষ্ণ কলিতে 'আদিবুদ্ধ' জগন্নাথরূপে প্রকট হইয়াছিলেন—'বুধ রূপরে বিজে অছি জগন্নাথ' (সারলা দাস। মহাভারত, সভা পর্ব)। জগন্নাথ দাসের 'দারুব্রহ্মগীতা'-র কাহিনী-অনুসারে ত্রেতাযুগের কৃষ্ণের অদগ্ধ দেহাবশেষ নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত। কাহিনীটি হইল এই—গতজীব কৃষ্ণের মরদেহ যখন পাণ্ডবেরা দাহ করিয়াছিলেন, তখন কেবল হস্ত ও পদ ভস্মীভূত হইয়াছিল। দৈববাণী অনুসারে পাণ্ডবেরা সেই অদগ্ধ দেহাবশেষ সমুদ্রে ভাসাইয়া

দেন এবং অতঃপর নীলাচলে তাহা করপদহীন দারুব্রহ্ম জগন্নাথরূপে প্রকটিত হয়। অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'-(৩০)-য় জগন্নাথদেব 'বৌধরূপ'—'বৌধরূপরে নীলাচলে অছি রহি' অর্থাৎ কলিযুগে কৃষ্ণ, বুদ্ধ-(জগন্নাথ)-রূপে নীলাচলে অধিষ্ঠিত। উক্ত সংহিতায় (১০) পুনশ্চ বলা হইয়াছে, চৈতন্য বুদ্ধ-জগন্নাথের অংশাবতার। ঈশ্বরদাসের অভিমতে (চৈতন্যভাগবত, ৪৬ এবং ৪৮) চৈতন্যই 'বোধাবতার'—'বোলন্তি প্রভু ভগবান, বুদ্ধ-রূপ মুঁ চৈতন্য।' অপিচ, 'বুদ্ধরূপে কম্বুধর, চৈতন্যরূপে বিহার।' অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, জগন্নাথদেব হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ, দারুব্রহ্ম, বৌধরূপ, চৈতন্যবল্লভ। তাঁহার মন্দির ও গুণ্ডিচাবাড়ী যথাক্রমে দ্বারকা ও বৃন্দাবন। চৈতন্যদেব হইলেন—সচল জগন্নাথ, নরব্রহ্ম, বোধাবতার, অংশাবতার।

॥ ৫ ॥ চৈতন্যদেব ও পঞ্চসখা

চৈতন্যদেব যখন প্রথম উড়িষ্যায় গমন করেন (১৫০৯ খ্রীঃ), তখন সেখানে পাঁচজন প্রধান ওড়িয়া বৈষ্ণব (জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস মোহান্তি, যশোবন্ত দাস এবং অনন্ত দাস মহাপাত্র) তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই পঞ্চ বৈষ্ণব 'পঞ্চসখা' নামে উড়িষ্যায় পরিচিত ছিলেন। 'সখা' অর্থে 'গণ'। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-য় যেমন কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিজনবর্গ নবদ্বীপলীলায় গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকররূপে জন্মিয়াছিলেন, তেমনি, অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'-য় (১, ১০, ২৭) বলা হইয়াছে, দ্বাপরে কৃষ্ণের দেহত্যাগকালে পুরীর নীলকণ্ঠেশ্বর শিব তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের পঞ্চসখা (শ্রীবৎস, সুবল, সুদাম, সুবাহু, দাম) কলিযুগে জন্মিয়া তাঁহার সেবা করিবেন। জগন্নাথ-বলরাম-অচ্যুত-যশোবন্ত-অনন্ত দাস হইলেন যথাক্রমে দ্বাপরযুগের শ্রীবৎস-সুবল-সুদাম-সুবাহু-দাম। গৌড়বঙ্গে যেমন দ্বাদশ গোপাল (নির্বাচিত ১২ জন অনুচর)[১৭] নিত্যানন্দের সহচর ছিলেন, তেমনি ওড়িয়া 'পঞ্চসখা' ছিলেন কৃষ্ণের (অর্থাৎ চৈতন্য-কৃষ্ণের) পঞ্চ পরিকর। চৈতন্যদেবের বিরহোন্মাদদশা-দর্শনে তৎসম্পর্কে গৌড়ীয় ধারণা (রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-কৃষ্ণস্বরূপত্ব) ওড়িয়া বৈষ্ণবদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহা বলিতে হয় যে, এই পঞ্চসখা-পরিকল্পনা কিংবা গৌড়ীয় পঞ্চতত্ত্ব-পরিকল্পনা বৈষ্ণব-অবতারবাদের চূড়ান্ত বিস্তৃতি মাত্র।[১৮]

গৌড়ীয় পঞ্চতত্ত্ব ও ওড়িয়া পঞ্চসখা: গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে 'পঞ্চতত্ত্ব' (ভক্তরূপ-ভক্তস্বরূপ-ভক্তাবতার-ভক্তাখ্য-ভক্তশক্তিক)[১৯] বলিতে যেমন পাঁচজন প্রধান বৈষ্ণবকে (চৈতন্য-নিতানন্দ-অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধর) বোঝায়, তেমনি, উড়িষ্যায়

পঞ্চসখা' বলিতে চৈতন্যসমকালীন পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রধান বৈষ্ণবকেই বোঝায়। অবশ্য গৌড়ীয় 'পঞ্চতত্ত্ব'-এ এবং উড়িষ্যার 'পঞ্চসখা'-তে প্রভেদও আছে। গৌড়ীয় ধারণায় যেরূপে 'পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু নাহি কোন ভেদ। রস আস্বাদিতে ধরে বিবিধ বিভেদ॥' এবং তত্ত্ববস্তু মাত্র একটি (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব), ওড়িয়া পঞ্চসখা সেইরূপ কোন তত্ত্ব প্রকাশ করে না। একমাত্র অচ্যুতানন্দের রচনায় ('শূন্যসংহিতা') কিঞ্চিৎ বৈষ্ণবতত্ত্বের কথা আছে। গৌড়ীয় পঞ্চতত্ত্বে সকলেই ব্রাহ্মণ, ওড়িয়া পঞ্চসখার মধ্যে জগন্নাথ দাস ব্যতীত সকলেই অব্রাহ্মণ। ওড়িয়া এই পঞ্চ বৈষ্ণব পরস্পর বন্ধু ছিলেন কি-না, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অচ্যুতানন্দ ও অনন্ত ব্যতীত অপর তিনজন বৈষ্ণবের রচনায় পারস্পরিক সখ্যের কোন উল্লেখ নাই। পঞ্চসখার উল্লেখ আছে ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ এবং সুদর্শন দাসের 'চৌরাশী আজ্ঞা'-য়। দিবাকর দাস তদীয় 'জগন্নাথ চরিতামৃত'-এ কেবল বলরামের জীবনী লিখিয়াছেন, অবশিষ্ট চারি সখা সম্পর্কে তিনি নীরব। অনন্ত দাসের একটি পুঁথিতে পঞ্চসখার বিশেষ-বিশেষ শক্তির পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে—জগন্নাথ (গুহ্য বা পরা জ্ঞান); বলরাম (যোগক্রিয়া-নৈপুণ্য); অচ্যুতানন্দ (অতীত ও বর্তমান সম্পর্কিত জ্ঞান); যশোবন্ত (লোকাতীত তথ্যজ্ঞান); অনন্ত (বর্গ বা symbol বিষয়ে পারদর্শিতা)। অবশ্য বলা বাহুল্য, এই বিশেষ শক্তিগুলিকে বৈষ্ণবতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

ঈশ্বরদাস তাঁহার 'চৈতন্যভাগবত'-এ (৪৫, ৪৬) প্রতি সখার সম্পর্কেই পৌরাণিক বাতাবরণযুক্ত এক-একটি চমকপ্রদ mystic গল্প সংযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী এই পঞ্চসখা তাঁহার নগরকীর্তনের সঙ্গী ছিলেন। শোনা যায়, কটকে চৈতন্যদেবের সহিত পঞ্চসখার মিলন ঘটিয়াছিল এবং তিনি প্রত্যেককে 'সারী' (কারুকার্যখচিত বস্ত্র) দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ ওড়িয়া বৈষ্ণব-যে চৈতন্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে বোঝা যায়—(ক) 'আপনে চৈতন্যপ্রভু সখাবৃন্দ ঘেণি। পঞ্চসখা মূলে বার স'স্র (=সহস্র) ভক্ত পুণি॥ খোল-করতালরে ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছুলই।'—অচ্যুতানন্দ (শূন্যসংহিতা, ১); (খ) 'জন জনঙ্কু সারী দেই। কহন্তি চৈতন্য গোঁসাই॥ কটকে প্রবেশ চৈতন্য। পঞ্চসখাঙ্কু দরশন॥'—ঈশ্বরদাস (চৈতন্যভাগবত, ৫৪ ও ৫৯); (গ) 'কহন্তি চৈতন্য গোঁসাই। পঞ্চসখাঙ্কু পার্শে রাই॥ বোইলে জগন্নাথ দাস। মোর নিকটে বেগে আস॥ জনম হেলে ভগবান। চৈতন্য প্রভু বোলি জাণ॥ তাঙ্ক আজ্ঞরু পঞ্চসখা। জনম হোই সঙ্গে লেখা॥'—সুদর্শন দাস (চৌরাশী আজ্ঞা)। অতঃপর, এই পঞ্চসখার যথানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

(ক) জগন্নাথ দাস : ইঁহার পিতা পুরীর মন্দিরের একজন 'পুরাণ পণ্ড' (=পুরাণ পাঠক) ছিলেন। জগন্নাথ দাসও তাঁহার পৈতৃক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী—'দারুব্রহ্মগীতা', 'বট অবকাশ', 'তুলভিন', 'অর্থ কোইলি,' রাসক্রীড়া-বিষয়ক কাব্য এবং ভাগবত পুরাণের ভাষানুবাদ। এই শেষোক্ত রচনাটির জন্যই তাঁহার খ্যাতি এবং এই রচনার জন্যই পুরীর ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ, ভাগবত গ্রন্থ জনসাধারণের গোচরীভূত হউক, ইহা ব্রাহ্মণেরা কোনক্রমেই অনুমোদন করিতেন না। এই অনুবাদকর্ম চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পূর্বে রচিত। কারণ, ইহার একটি শ্লোকে (১০।৩০।২৮) —'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥'—জগন্নাথ দাস গোপীপ্রধানার নাম দিয়াছিলেন 'বৃন্দাবতী'। শ্রীরাধার পরিবর্তে 'বৃন্দাবতী' নামকরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। জগন্নাথদেবের মন্দিরের নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে অপেক্ষমান জগন্নাথ দাস চৈতন্যদেবকে চন্দনচর্চিত ও মাল্যভূষিত করিলে পর শ্রীচৈতন্য পঞ্চসখা এবং অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সহ মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম শ্রীচৈতন্য-দর্শন। চৈতন্যদেব জগন্নাথ দাসের প্রজ্ঞা ও ভক্তির জন্য তাঁহাকে 'অতিবড়' বলিয়া সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন (দিবাকর দাস—জগন্নাথ-চরিতামৃত) এবং জগন্নাথ দাস এই সম্বর্ধনাকে শিরোধার্য করিয়া 'অতিবড়' সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্তমানে জগন্নাথ দাসের পাটের নাম 'বড় ওড়িয়া মঠ'।

ঈশ্বরদাস (চৈতন্যভাগবত, ৪৫) বলেন,—জগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে, নদীয়ায় তিনি চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের আদেশে জগন্নাথ দাস প্রতাপরুদ্রের মহিষী ভানুমতীকে (মতান্তরে গৌরী—দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ-চরিতামৃত', ৪৬) দীক্ষা দিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, জগন্নাথ দাস তাঁহার কোন রচনায় চৈতন্যদেব এবং অপর সখাচতুষ্টয়ের উল্লেখ করেন নাই।

(খ) বলরাম দাস : ইনি পঞ্চসখার মধ্যে বয়সে প্রবীণতম এবং জাতিতে 'করণ (=কায়স্থ)। বলরাম দাসের রচনাবলী—'সপ্তযোগসার টীকা', 'বেদান্তসার গুপ্তগীতা' 'ব্রহ্মাণ্ডভূগোল', 'অমরকোষগীতা', 'বিরাটগীতা', 'লক্ষ্মীপুরাণ সৌঙ্গ', 'মৃগুণীস্তুতি' 'ভাবসমুদ্র' এবং 'জগমোহন রামায়াণ' (সংস্কৃত রামায়ণের ভাষানুবাদ)। বলরাম তাঁহা ভক্তিমত্ততার জন্য 'মত্ত বলরাম' নামে পরিচিত ছিলেন। জগন্নাথ-মন্দিরে বেদান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ হেতু ব্রাহ্মণগণ ইঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। শূদ্র শ্রেণী ধর্মোপদেষ্টা 'বলরাম দাসের পাট' পুরীর নিকটবর্তী মরানদী বাঁকির মোহনাস্থিত 'গন্ধর্ব মঠ'

ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত' (৪৬) অনুসারে বলরাম দাস স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ভগবান যতিবেশে নীলাচলে আসিবেন। পুরী যাইবার সময় চৈতন্যদেব বলরামের জন্মভূমি চন্দ্রপুরে আসিলে বলরাম দাস তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং তচ্চরণে প্রণত হন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'সুবল' বলিয়া সম্ভাষণ করেন এবং 'রামতারক পরম ব্রহ্ম' মন্ত্রে দীক্ষা দেন—'দেখি আনন্দ শ্রীচৈতন্য। সুবলে কলে সম্ভাষণ॥ প্রেমরে জরজর হোই। অচ্ছন্তি চৈতন্য গোসাঁই॥ রামতারক পরম ব্রহ্ম। কহিলে কর্ণে শ্রীচৈতন্য॥'

(গ) **অচ্যুতানন্দ দাস মোহান্তি:** ইনি বাল্যাবধি কৃষ্ণভক্ত এবং বলরাম দাসের ন্যায় ওড়িয়া ব্রাহ্মণসমাজ কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত। অচ্যুতানন্দ গোপসম্প্রদায়ের ধর্মগুরু, ইঁহার পাট কটকের নেম্বাল গ্রামে এবং পুরীতে ইনি গোপ-পুরোহিতের দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। অচ্যুতানন্দের রচনাবলী—'শূন্য-সংহিতা', 'অনাকার সংহিতা', 'ব্রহ্মসাঙ্কুলি', 'কৈবর্তগীতা', 'গুরুভক্তিগীতা', 'গোপালঙ্ক ওগল', হরিবংশের ভাষানুবাদ। প্রথম তিনটি গ্রন্থে অচ্যুতানন্দের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—'অলেখ পুরুষ' বা অনাদি ব্রহ্মতত্ত্ব। চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা অচ্যুতানন্দ তদীয় শূন্যসংহিতা'-য় (১) বলিয়াছেন। পিতার সহিত পুরীতে তাঁহার প্রথম চৈতন্য-দর্শন ঘটে এবং এই দর্শনের ফলে তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মে। চৈতন্যাদেশে সনাতন তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। দৈবাদেশে পুরীতে ইনি চৈতন্যদেবের সেবা এবং সঙ্কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর, তাঁহার তীর্থযাত্রা এবং পরিক্রমান্তে চৈতন্যদেবের সহিত পুনর্মিলন—'শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র, করুণাসাগর, বিজয়ে বড দাণ্ডরে। বৈষ্ণবমণ্ডলি, বেডি শোভা তহিঁ, কি উপমা দেবি তারে॥ শ্রীছামুরে যাই, শত দণ্ডবত, করিণ উভা হোইলি। দেখিন আনন্দ, নবদ্বীপচন্দ্র, প্রসাদ-ফুল পাইলি॥'

ঈশ্বরদাস 'চৈতন্যভাগবত'-(৪৬)-এ বলেন—'ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর', 'অনন্তমূর্তি ভগবান' অচ্যুতানন্দকে 'সুদাম' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং 'মোর নিজ দেহী' শ্রীচৈতন্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট 'পরমহংস' মন্ত্রে দীক্ষা লইতে আদেশ দেন। চৈতন্য-সেবা, হরিনাম-প্রচার এবং ভক্তিধর্মানুসরণ—ইহাই ছিল অচ্যুতানন্দের প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ।

(ঘ) যশোবন্ত দাস: ইনি জাতিতে 'মহানায়ক' (=ক্ষত্রিয়)। ইহার রচনাবলী হইল—রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক কবিতা, 'প্রেমভক্তিব্রহ্মগীতা', 'শিবস্বরোদয়', এবং 'গোবিন্দচন্দ্র টীকা'। 'প্রেমভক্তিব্রহ্মগীতা' গোপীভাবের আধারে রচিত এবং 'গোবিন্দচন্দ্র টীকা' নাথপন্থীদের নিত্যপাঠ্য। যশোবন্ত দাস কটকের

অডঙ্গতে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। যশোবন্ত চৈতন্যাবতারের কথা শুনিয়াছিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-এর (৪৬) বর্ণনায় উভয়ের মিলন দৃশ্যটি এইরূপ—'দর্শন কলে শচীসুত। গৌরাঙ্গ আপে জগন্নাথ॥ চৈতন্যপাদপদ্মে পড়ি। উঠিল শিরে কর যোড়ি॥' চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'সুবাহু' বলিয়া সম্বোধন করতঃ হরিনামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

(ঙ) অনন্তদাস মহাপাত্র ঃ ইনি 'শিসু' (Sisu) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইঁহার পাট কটক জেলার তেন্তুলিয়া পাড়া। পুরী আগমন কালে চৈতন্যদেব যখন কোণার্কে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্তদাস সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হন। অনন্তদাসের একটি মাত্র রচনা 'তুলশূন্যরাস'।

ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-(৪৬)-এর বর্ণনা অনুসারে অনন্তদাস দৈববাণী শোনেন যে, তিনি দ্বাপরের কৃষ্ণসখা দাম, নিত্যানন্দ স্বয়ং সঙ্কর্ষণ এবং নিত্যানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্য পুরীতে আসিতেছেন। দৈববাণী শুনিয়া অনন্ত কোণার্কে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা অনুসারে নিত্যানন্দ তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন—'চৈতন্য প্রভু আজ্ঞা হোই। শুন হো নিত্যানন্দ ভাই॥ অনন্ত উপদেশ কর। হরির নামে দীক্ষা সার॥ এ বাণী শুনি নিত্যানন্দ। হরষে হৈলে আনন্দ॥ অনন্তে উপদেশ কলে। কর্ণে মহামন্ত্র দেলে॥'

'পঞ্চসখা' সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্যাবলী কতদূর ইতিহাস-সম্মত এবং কতদূর জনশ্রুতি-নির্ভর, তাহা বলা কঠিন। তাঁহাদের সম্পর্কে ঈশ্বরদাসের বর্ণনাগুলিরও সত্যতা বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। চৈতন্যদেব উড়িষ্যাতে তাঁহার জীবৎকালে কোন ধর্মমত প্রচার, অথবা, কোন সম্প্রদায় কিংবা প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন নাই। দীক্ষাদান ব্যাপারও চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শের পরিপন্থী ছিল। উড়িষ্যা-গমনকালে নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন বটে, তবে নিত্যানন্দ কর্তৃক মন্ত্র-দীক্ষাদান উড়িষ্যায় নহে, বঙ্গদেশে হইয়াছিল এবং তাহাও চৈতন্য তিরোধানের পর। অথচ, ঈশ্বরদাসের বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব বলরাম, অচ্যুতানন্দ এবং যশোবন্ত দাসকে দীক্ষিত করিতেছেন এবং নিত্যানন্দও অনন্ত দাসকে দীক্ষা দিতেছেন। পুনশ্চ, চৈতন্যদেব জগন্নাথ দাসকে প্রতাপরুদ্রের মহিষীকে দীক্ষাদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। পঞ্চসখারা সকলেই স্বপ্নাদেশ কিংবা দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, ইহাও বিস্ময়ের কথা।

ইহা সত্য যে, শ্রীচৈতন্য যখন পুরীতে গিয়াছিলেন এই পঞ্চ বৈষ্ণব তখন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় জগন্নাথ-

ভক্তি, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে লইয়া সঙ্কীর্তন, উড়িষ্যায় প্রচলিত তৎকালীন বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অ-বৈরূপ্য—সম্ভবতঃ পঞ্চসখাকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। উড়িষ্যাবাসীরা কেহ-কেহ তাঁহাকে জগন্নাথের অবতার, কেহ-বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন। সমকালীন উড়িষ্যা তাঁহার ভক্তিধর্মের উত্তুঙ্গ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছিল।

> 'In Chaitanya, religious devotion saw its extreme limits of rapturous expression, both physically aud psychologically, which is perhaps unparalleled in the history of the world.'
>
> —A. K. Majumdar—*Chaitanya, His life and Doctrine* P. 268 .

॥ ৬ ॥ চৈতন্যদেব ও তাঁহার অপরাপর ওড়িয়া অনুরাগীবৃন্দ

উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের পরিচিতি ও খ্যাতি হইয়াছিল মুখ্যতঃ দুই ব্যক্তির জন্য —সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রামানন্দ রায় পট্টনায়ক। সার্বভৌমের বৈষ্ণবধর্মগ্রহণ (কবি কর্ণপূরের কাব্য, ১২ এবং নাটক, ৬; চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৬) উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিজয় ('First major achievement'—S. K. De)। চৈতন্যদেব যখন প্রথম উড়িষ্যাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ওড়িয়াদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নবীন সন্ন্যাসী মাত্র। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহাকে 'পরিচিত জনতার সরণী'-তে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্বে ওড়িয়া বৈষ্ণবদের উপর মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্তিধর্মের কোন প্রভাব সম্ভবতঃ ছিল না।[২০] অনেকে মনে করেন যে, রামানন্দ মাধবেন্দ্র-শিষ্য রাঘবপুরীর সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। এই রাঘবপুরী সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় না। কালক্রমে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী উড়িষ্যাকে প্রভাবিত করে। ইহার ফলশ্রুতি—প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমদেবের 'অভিনব বেণীসংহরণম্' এবং রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা। বস্তুতঃ, রামানন্দই উড়িষ্যায় প্রেমভক্তিধর্মের প্রথম পথিকৃৎ।[২১] রামানন্দ রায় ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব-দর্শনে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপরুদ্র, রামানন্দ রায় প্রমুখ চৈতন্যদেবের কয়েকজন প্রধান ওড়িয়া অনুরাগীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রতাপরুদ্রদেব : গজপতি কপিলেন্দ্রদেব মৃত্যুর পূর্বে জগন্নাথের স্বপ্নাদেশে জ্যেষ্ঠপুত্র হাম্বীরের পরিবর্তে কনিষ্ঠ 'জগন্নাথ বরপ্রসাদ' 'অভিনবগীতগোবিন্দ'-প্রণেতা পুরুষোত্তমদেবকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান।[২২] পুরুষোত্তমের পুত্র প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ-ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন প্রথম পুরীতে আসেন (১৫০৯ খ্রীঃ), তখন জগন্নাথদেব স্বীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। একটি শিলা-লিপিতে[২৩] দেখা যায়, প্রতাপরুদ্র সৌভাগ্যলাভের জন্য 'হেরম্ব', অর্থাৎ, গণেশের পূজা করিতেছেন, দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান করিতেছেন, পুনশ্চ, 'সরস্বতীবিলাসম্' গ্রন্থে আপনাকে 'শ্রীদুর্গাবরপুত্র' বলিয়াছেন। পঞ্চসখার প্রতি প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতার কার্পণ্য ছিল না, তাঁহাদের প্রোক্ত বৈষ্ণব-তত্ত্বদর্শনের প্রতিও তাঁহার ঔৎসুক্য ছিল। বলরাম দাস বৈষ্ণবদের প্রতি প্রতাপরুদ্রের শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন ('বেদান্তসার-গুপ্তগীতা' ২৪, ২৯ এবং 'অমরকোষ গীতা' ৭)। যশোবন্ত দাসের প্রতিও তিনি সম্প্রীত ছিলেন ('চৌরাশী আজ্ঞা' ৩৯) এবং মঠ-নির্মিতির জন্য অচ্যুতানন্দ ও জগন্নাথ দাসকে তিনি ভূমিদান করিয়াছিলেন। জগন্নাথ দাস প্রতাপরুদ্রের এক মহিষীকেও দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। সভাকবি জীবদেবকে তিনি 'ভক্তিবৈভব' কাব্য রচনার জন্য পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। রাজকীয় ঐশ্বর্য এবং হার্দিক ঔদার্যে অলঙ্কৃত প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেবের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই আকর্ষণ চৈতন্যদেব এবং তাঁহার অনুচরবর্গের পুরীতে নিরাপদ সংস্থিতির সহায়ক হইয়াছিল। ভাগবতের শ্লোকোচ্চারণ করিয়া তাঁহার চৈতন্যদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল ১৫১২ সালে ('চৈতন্যচরিতামৃত', ২।১৪)। প্রতাপরুদ্র পুরীতে অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত থাকিতেন, নানা যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহাকে সদাব্যস্ত থাকিতে হইত। তথাপি. রথযাত্রা কালে যখন তিনি পুরীতে আসিতেন তখন, অবশ্যই চৈতন্যের সান্নিধ্য লাভ করিতেন। তদ্ব্যতীত, চৈতন্যদেবের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি এই ধর্মপ্রাণ নৃপতির অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল।

চৈতন্যসান্নিধ্যে আসিলেও প্রতাপরুদ্রদেব-যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও রামানন্দ রায়ের ন্যায় চৈতন্য-ধর্মমতে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ভক্তিরত্নাকরের (৬।পৃঃ ১১১), চৈতন্য ভাগবতের (৩।৫) এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৮) নাটকের বিবৃতি প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যের সান্নিধ্যের কথা ব্যক্ত করে মাত্র; কিন্তু প্রতাপরুদ্র-কর্তৃক চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মগ্রহণ ও পুত্রকে রাজ্যদান ('ভক্তিরত্নাকর' ইত্যাদি তথ্যগুলি ইতিহাস-সমর্থিত নহে। চৈতন্যের শেষজীবনে প্রতাপরুদ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার বিরল ছিল। সুতরাং এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,

প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রতাপরুদ্রের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

'He (Pratap Rudra) was probably impressed by the religious personality of Chaitanya and paid a willing homage, but beyond this there is no evidence of Pratap Rudra's actual conversion.'[২৪]

রামানন্দ রায় পট্টনায়ক : 'রাজবংশোৎপন্নজন' রামানন্দ জাতিতে কায়স্থ, পদবীতে পট্টনায়ক। ইঁহার পিতা ভবানন্দ (চিল্কার নিকটবর্তী বেণ্টপুরের সামন্ত), ভ্রাতা গোপীনাথ (উড়িষ্যার একটি জেলার শাসক), বাণীনাথ (শ্রীচৈতন্যের সেবক), কলানিধি ও সুধানিধি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে ('চৈতন্যচরিতামৃত', ২।১০) রামানন্দের চারি ভ্রাতা, কিন্তু কানাই খুঁটিআর মতে ('মহাভাবপ্রকাশ') তাঁহারা দুই ভাই। প্রতাপরুদ্র রামানন্দকে উড়িষ্যার অন্যতম দক্ষিণরাজ্য 'রাজমহেন্দ্রী'-র শাসক করিয়াছিলেন। রামানন্দের বিখ্যাত রচনা—'জগন্নাথবল্লভ' নাটক। নাটকটি সম্ভবতঃ চৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পূর্বে রচিত কারণ, নাটকটিতে চৈতন্যদেবের কোন নামোল্লেখ নাই। তবে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব নাটকটিতে যথেষ্ট বর্তমান। রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের সহিত এই নাটকের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা বিষয়গত বিধায় অনুস্মৃতির পর্যায়ে পড়ে না। রামানন্দ বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাগীতি সম্বন্ধেও-যে অবহিত ছিলেন, 'পহেলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল—' শীর্ষক প্রেমবিলাসবিবর্তাশ্রয়ী কলহান্তরিতা-পর্যায়ের বিখ্যাত এই সঙ্গীতটিতে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার তাহার প্রমাণ দেয়। এই গানটি চৈতন্যচরিতামৃতে (২।৮), কবিকর্ণপূরের কাব্যে (১৩ সর্গ) এবং রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত পদামৃতসমুদ্রে গৃহীত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের কাব্যে এবং রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে (রামানন্দকৃত 'নানোপচারকৃতপূজনম্—' শ্লোকটি সঙ্কলিত) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (রামানন্দ-রচিত শ্লোক এবং সঙ্গীত, উভয়ই উদ্ধৃত, ২।৮) রামানন্দের প্রসঙ্গ বিদ্যমান। চৈতন্য-প্রবর্তিত রাগময়ী ভক্তিবাদে রামানন্দের বিশেষ অবদান হইল—'গোপীভাব' তথা রাধাভাব। রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইবার পরই চৈতন্যদেব যেন আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'The identification of *Hladini Sakti* (the counterpart) with Radha seems to be Ramananda's contribution to Gaudiya Vaishnavism.' (A. K. Majumdar—*Chaitanya His life and*

Doctrine, P. 195); 'That it was the spiritual insight of Ramananda which revealed to Chaitanya that he had, for the purpose of realising his own divine nature usurped the complexion and the spirit of Radha in the present Avatara'. (S. K. De—*Early History of Vaishnava Faith and Movement in Bengal*, Calcutta,).

এই ধারণা (গোপীভাব) রামানন্দ দক্ষিণ ভারত হইতে পাইয়া থাকিতে পারেন কারণ, 'রাজমহেন্দ্রী' সেই সময় তেলেগু সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর (২।৮) রামানন্দ-শ্রীচৈতন্যসংবাদ এই ধারণাকে দৃঢ়তর করে। এখানে রামানন্দ রাধাকে 'মহাভাবরূপা' বলিয়াছেন। অবশ্য, তিনি এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন কি-না, তাহা বলা যায় না। কারণ, 'মহাভাবরূপা' শব্দটি বা ধারণাটি চৈতন্যচরিতামৃত-রচনার বহু পরে জীবগোস্বামীর 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' ও 'প্রীতিসন্দর্ভ' হইতে গৃহীত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রূপগোস্বামী তাঁহার 'চতুষ্পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'নামবূ্যহাষ্টক'-এ 'গোপীভাবনা'-কে আরও বিশদ করিয়াছিলেন।

কাশী (কাশীশ্বর) মিশ্র : ইনি জগন্নাথ-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ও রাজ-পুরোহিত ছিলেন। মন্দির-নিকটস্থ ইঁহার গৃহে ('গম্ভীরা'। বর্তমান রাধাকান্ত মঠ চৈতন্যদেবের বাসস্থান ছিল। রঘুনাথ দাসের 'স্তবকল্পবৃক্ষ'-এ, জীবগোস্বামীর সংস্কৃতে রচিত 'বৈষ্ণববন্দনা'-য়, কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে (৮।৩) বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ (৩।৫) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত (২।১১, ১৪ ; ৩।৯, ১১) গ্রন্থে কাশী মিশ্রের চৈতন্যানুরাগ সম্পর্কে জানা যায় ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

কানাই (=কহ্নেই) খুঁটিঞা : 'মহাভাবপ্রকাশ' রচয়িতা কানাই খুঁটিঞা জগন্নাথ-মন্দিরে পুষ্পমাল্য সরবরাহ করিতেন। চৈতন্যের দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর (১৫১২ খ্রীঃ) পুরীতে যে-নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ইনি নন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৫)। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'-তে (নং ৪৩৪) তাঁহার নামে একটি বাংলা গান ('কানাই খুঁটিঞা কয় মোর মনে হেন লয়, বংশী হৈল অবলা বধিতে') পাওয়া যায় ; অবশ্য এই গানটির অকৃত্রিমতা বিষয়ে নিঃসংশয়িত হওয়া যায় না। ইঁহার পুত্র বলরাম দাস। দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত'-এ কাহ্নু খুঁটিঞা নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে বটে ইনি কিন্তু পৃথক ব্যক্তি।

শিখি মাহিতি (মহান্তী), মুরারি মাহিতি ও মাধবী দাসী ঃ রামানন্দ রায়ের সহিত এই দুই ভ্রাতা ও ভগিনীর জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিল। শিখি মাহিতি ও মাধবী দাসী 'মাদলাপঞ্জী'-র লিখনাধিকারী ('দেউল করণ') ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' (৩।২) এবং কবিকর্ণপূরের কাব্যে (১৩।৯০) ইঁহাদের ভক্তিমত্তা ও চৈতন্যানুগত্যের উল্লেখ আছে। কবিকর্ণপূরের কাব্যে মাধবী দাসীর বিদ্যাবত্তার জন্য তাঁহাকে 'শিখি মাহিতির ভ্রাতা' বলা হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'-তে মাধবী ভণিতায় দুইটি এবং মাধবী দাস ভণিতায় পাঁচটি পদ পাওয়া যায়, তাহা অনেকে মাধবী দাসীর রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। রামানন্দ ও মাধবী উভয়েই মাধবেন্দ্র-শিষ্য রাঘবপুরীর শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র ঃ সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন ('প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহ বৈষ্ণব প্রধান')। 'চৈতন্যভাগবত' (১।৩,১৪ ; ৩।৫) ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' (২।১০,৩।৫) হইতে উড়িষ্যাবাসী বৈষ্ণব-প্রধান প্রদ্যুম্ন মিশ্রের পরিচয় ও মহাপ্রভুর পরামর্শে রামানন্দের নিকট ইঁহার ভাগবত-শ্রবণের কাহিনী জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জগন্নাথদেবের মহাসূপকার (পাকশালাধ্যক্ষ) প্রদ্যুম্ন মিশ্র কিন্তু পৃথক ব্যক্তি ছিলেন ('চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, ৮।৬)।

গোপালগুরু (কর) ঃ ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ও 'গোপালগুরু' পরিবারের আদিপুরুষ। ইঁহার পিতা মুরারি কর। বাল্যাবধি ইনি চৈতন্যসেবক ছিলেন। চৈতন্যদেব ইঁহার 'গোপাল' নামকরণ করিয়া কাশী মিশ্রের গৃহদেবতার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ গোপালগুরুর উল্লেখ নাই। গোপালগুরু 'স্মরণক্রম পদ্ধতি' গ্রন্থের প্রণেতা।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ (২।১২, ১৬) আরও বহু ওড়িয়া চৈতন্যধর্মাবলম্বী / চৈতন্যভক্ত / চৈতন্যসেবক অনুরাগীজনের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকজন হইলেন—মাধব পট্টনায়ক (দেবকীনন্দন ও জীব গোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনায় ইঁহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ, ইনি রামানন্দের আত্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন); মামুঠাকুর (টোটা গোপীনাথের সেবাইত); স্বপ্নেশ্বর (কটকে চৈতন্যদেবের আতিথ্য করিয়াছিলেন); তুলসী মিশ্র (জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত বা 'পড়িছা'। ইনি ১৫১২ খ্রীঃ নন্দোৎসবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন); পরমানন্দ মহাপাত্র (বৃন্দাবন দাস —চৈতন্যভাগবত ৩।৪); জনার্দন (জগন্নাথের বেশকারী); সিংহেশ্বর ও মুরারি

(জগন্নাথের দুইজন পূজারী) ; মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন (চৈতন্যের উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমনের সময়ে ইঁহারা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত, আরও বহু ওড়িয়া ব্রাহ্মণ (রামচন্দ্র, রঘুনাথ, শিবানন্দ পণ্ডিত ইত্যাদি) ও অ-ব্রাহ্মণ (বিপ্রদাস, বলদেব মহান্তি, বিষ্ণুদাস, কাশীনাথ মহান্তি প্রভৃতি) চৈতন্য-ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁহাদের পরিচয় বর্তমানে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

॥ ৭ ॥ ওড়িয়া সাহিত্য ও চৈতন্যদেব

ওড়িয়া সাহিত্যের কালক্রম : ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(ক) প্রাচীন ওড়িয়া (১৩০০ খ্রীঃ পর্যন্ত) ; (খ) আদি-মধ্য ওড়িয়া (১৩০০-১৫০০ খ্রীঃ) ; (গ) মধ্য ওড়িয়া (১৫০০-১৭০০ খ্রীঃ) ; (ঘ) অন্ত্য-মধ্য ওড়িয়া (১৭০০-১৮৫০ খ্রীঃ) ; (ঙ) আধুনিক ওড়িয়া (১৮৫০ খ্রীঃ পরে)। দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কয়েকটি শিলালিপিতে (৯৯০, ১০৩৬, ১২৪৯ খ্রীঃ) কিছু স্থানীয় নাম ও কয়েক ছত্র প্রাচীন ওড়িয়া ভাষার নিদর্শন ব্যতীত প্রাচীন ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২৫]

ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবকাল ১৩।১৪ শতক। এই সময়ে কয়েকটি ব্রতকথার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—'সোমনাথ ব্রতকথা', 'নাগলচৌঠী' (নাগ চতুর্থী) ; এই দুইটি গদ্যে রচিত ও শিববিষয়ক। 'খুদুরুণি উপবাস' মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা জাতীয় রচনা, উপজীব্য দেবতা দেবী মঙ্গলা, অর্থাৎ, শক্তিদেবতা। 'মাদলা-পঞ্জী'-র রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে 'মাদলাপঞ্জী' রচনার সূত্রপাত হয় ১১।১২ শতকে অর্থাৎ গঙ্গবংশীয় চোলগঙ্গদেবের আমলে, কিন্তু ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব মনে করেন যে, 'মাদলপঞ্জী'-র রচনাকাল ১৬ শতকের পূর্বে নহে।

প্রাচীন ওড়িয়া সংস্কৃতির (৬-১৪ শতকের মধ্যে) ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন—উত্তর উড়িষ্যার ভৌমকর ও সোমবংশীয় রাজগণ, মধ্য উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশীয় রাজগণ এবং দক্ষিণ উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ। ইঁহাদের সময়ে উচ্চকোটির ভাষা ছিল সংস্কৃত। গঙ্গবংশের শাসনকালের অবসান হয় ১৪১৫ খ্রীঃ। ইহার পর আসেন সূর্যবংশীয় নৃপতি কপিলেন্দ্রদেব।

১৫ শতক : কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-৭০ খ্রীঃ) সময়ের কবি সারলা দাস। ইনি অশিক্ষিত শূদ্র চাষী কবি—দেবী সারলাচণ্ডীর (হিঙ্গুলাদেবী) আদেশে ইনি লোকভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া ছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই মার্কণ্ডেয় দাসের

'কেশব কোইলি' ওরফে 'যশোদা কোইলি'[২৬] ও 'বছা' (<বৎস) দাসের 'কলশ চৌতিশা' (বিষয়—বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ) কাব্যে লোকভাষার ব্যবহার দেখা গিয়াছিল। সারলা দাসের 'ওড়িয়া মহাভারত লোকভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম নিদর্শন ও ইহা উড়িষ্যার জাতীয় কাব্য হিসাবে পরিগণিত। কবি মূল মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই, মুখ্য কাহিনীটিকে লইয়া আপন ইচ্ছানুসারে নানা নূতন কাহিনীর সংযোজন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য জীবনানুগত্য। কাব্যটিতে গীতার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। সারলা দাসের রচনায় একলব্য হইয়াছে 'শবরজরা' এবং কৃষ্ণের মৃত্যুও জরা ব্যাধের দ্বারা ঘটিয়াছে। এই কাব্যটির প্রধান দুইটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব হইল—আর্যানার্য সংস্কৃতির মিলন এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মোক্ত শান্তির আদর্শ স্থাপন (সভাপর্বের 'অহিংসানগরী')[২৭], যাহা উত্তরকালে জগন্নাথ-ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। সারলাদাসের অপর দুইটি রচনা হইল—'বিলঙ্ক রামায়ণ' (সীতা কর্তৃক শতস্কন্ধ রাবণবধ) এবং 'চণ্ডীপুরাণ'।

সারলা দাসের পরবর্তী যুগাবলীর সাহিত্য-সৃষ্টিতে মূলতঃ তিনটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—(ক) সারলা দাসের প্রভাব (যথা: অর্জুন দাসের 'রামবিবাহ', শিশুশঙ্করের 'উষাভিলাষ'); (খ) বৌদ্ধ প্রভাব (যথা: চৈতন্যদাসের 'নির্গুণ-মাহাত্ম্য' ও 'বিষ্ণুগর্ভপুরাণ', বিপ্র নীলাম্বরের 'দেউলতোলা সৌঙ্গ'); (গ) গীতগোবিন্দের প্রভাব (যথা: 'কোইলি', 'চৌতিশা' এবং গীতগোবিন্দের ভাষানুবাদ)।

কপিলেন্দ্রদেবের পরবর্তী রাজা পুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-৯৭ খ্রীঃ)। সম্ভবতঃ ইহার সময়ে 'ছইনিপঞ্জী' (Family Chronicle) নামে গদ্যে একজাতীয় পারিবারিক ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমদেবের পর আসেন তৎপুত্র প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীঃ) ইহার শাসনকালে শ্রীচৈতন্যের উড়িষ্যা গমন, পঞ্চসখাদির সহিত মিলন ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্মে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন (সারলা দাসের 'মহাভারত'), হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ ('দেউলতোলা সৌঙ্গ'); এবং পঞ্চসখা ও চৈতন্যদেবের প্রভাব বর্তমান। মধ্য যুগে ওড়িয়া সাহিত্যের চারিটি স্মরণীয় গ্রন্থ হইল—সারলা দাসের 'মহাভারত', বলরাম দাসের 'জগমোহন রামায়ণ', জগন্নাথ দাসের 'ভাগবত' ও অচ্যুতানন্দের 'হরিবংশ'। স্থূলতঃ এই চারিটি অনুবাদ গ্রন্থ সারলা দাস এবং পঞ্চসখার শ্রেষ্ঠ অবদান—তাঁহারাই সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ও হরিবংশকে ভাষানূদিত করিয়া জনসাধারণের নিকট পৌছিয়া দিয়াছিলেন।

১৬ শতক: ষোড়শ শতকে রচিত ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

রচনা হইল—(ক) অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'; (খ) কানাই (=কহ্নেই) খুঁটিঞার 'মহাভাবপ্রকাশ'; (গ) মাধব দাসের 'চৈতন্যবিলাস'; (ঘ) হরি দাসের 'ময়ূর-চন্দ্রিকা'। প্রসঙ্গতঃ এই রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) **অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'**—পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা' ওড়িয়া-বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল আনুমানিক ১৬ শতকের শেষার্ধ। রাজা মুকুন্দদেবের[২৮] (১৫৬০-৬৮ খ্রীঃ) জামাতা কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অচ্যুতানন্দ চৈতন্য-তিরোধানের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং চৈতন্যদেবকে বুদ্ধ-জগন্নাথরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 'শূন্য-সংহিতা'-য় নিত্যানন্দ, রামানন্দ, স্বরূপাদি মুখ্য চৈতন্যানুচরদের উল্লেখ নাই, তবে পঞ্চসখার চৈতন্যানুগত্যের কথা আছে—'অনন্ত অচ্যুত যেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ, এ পঞ্চসখাহি নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত।' 'অনন্ত যে যশোবন্ত বলরাম শ্রীবৎস মিলিলে আসি, জগন্নাথ দাস যেনি পঞ্চসখা উদয় হৈলে তহিঁ, ঘরে ঘরে হরিধ্বনি উচ্ছুলিলা, চৈতন্য-আজ্ঞা পাই।' 'নাম শ্রীচৈতন্য প্রভু অধম-উদ্ধার।' 'শ্রীচৈতন্যপ্রভু আপে জগতঠাকুর।'—শূন্যসংহিতা (১, ৩, ১০)।

(খ) **কানাই (=কহ্নেই) খুঁটিঞার 'মহাভাবপ্রকাশ'**—ইনি জগন্নাথ-মন্দিরের সেবক ছিলেন। গ্রন্থে মুসলমান আক্রমণের (১৫১১ খ্রীঃ) বর্ণনা থাকায় বলা যায় যে, গ্রন্থটি ১৬ শতকের পূর্বার্ধে রচিত হইতে পারে। গ্রন্থের বিষয় বস্তু—মহাভাবস্বরূপিণী রাধাতত্ত্ব। কবি এই তত্ত্বের কথা চৈতন্যের নিকট শুনিয়াছিলেন ('যাহা মুঞি গুরু গৌরাঙ্গ মুখরু শুনিলি, সেহি মহাভাব মুঞি মাত্র যে লেখিলি।' —২ সর্গ)। পুঁথিটি খণ্ডিত, শেষাংশ পাওয়া যায় না; কেবল প্রথম দুই সর্গ ও তৃতীয় সর্গের কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কানাই খুঁটিঞার নাম আছে; কানাই খুঁটিঞার গ্রন্থেও কেশবভারতী, মাধবেন্দ্রপুরী, স্বরূপ গোস্বামী, প্রতাপরুদ্রদেব, রামানন্দ রায় ও চৈতন্য-ভৃত্য গোবিন্দের নাম আছে। রামানন্দের রাজমহেন্দ্রীর কর্মভার ত্যাগের কারণ বর্ণনায় (২ সর্গ) চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত গ্রন্থটির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কানাই খুঁটিঞার মতে চৈতন্যদেবের উড়িষ্যা-প্রবেশ উন্মিলি সংবৎ (Islamic year) ৯১৮ ('নঅস অঠর সালে প্রবেশ হৈলা')। তাঁহার গ্রন্থে কাশীমিশ্র, তুলসী পড়িছা প্রভৃতি অপরাপর জগন্নাথ-সেবকের নাম নাই।

(গ) **মাধবদাসের 'চৈতন্যবিলাস'**—এই গ্রন্থের পুঁথি প্রথম আবিষ্কার করেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ('চৈতন্যচরিতের উপাদান', ১৯৫১। পৃঃ ২৮৩)। ডঃ মজুমদারের অভিমতে কবির নাম হইল মাধবদাস পট্টনায়ক এবং লোচনদাস তদীয়

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-বর্ণনে মাধবদাসের চৈতন্যবিলাসের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান গ্রহণীয় নহে; বরং, ইহার বিপরীত অনুমানই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ নবদ্বীপের ঘটনা (উড়িষ্যার নহে) এবং সমসাময়িক বাঙ্গালী কিংবা ওড়িয়া কোন কবি চৈতন্যবিলাসের নাম করেন নাই। উপরন্তু, স্বয়ং মাধবদাস বলিয়াছেন যে, তিনি 'ঠাকুর' চৈতন্যের কথাগুলি ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন (চৈতন্যবিলাস, ১০।১৭)। অসম্ভব নহে, নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের উপর নির্ভর করিয়া মাধবদাস চৈতন্যবিলাসের কিয়দংশ রচনা করিয়া থাকিবেন।

(ঘ) **হরিদাসের 'ময়ূরচন্দ্রিকা'**—কবি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বন্দনা আছে। হরিদাস রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। 'ময়ূরচন্দ্রিকা'-র দ্বিতীয় সর্গে রামানন্দ ও কৃষ্ণচৈতন্যের ভগবদ্বিষয়ক আলোচনা বর্ণিত হইয়াছে ('কহন্তি গুরুদেব রায় রামানন্দ। শুনন্তি আনন্দে শচীসুত গোরাচান্দ॥')। গ্রন্থটির উল্লেখ্য বিষয়গুলি হইল—ক চৈতন্যদেব, কৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিহিত; (খ) জগন্নাথদেব রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ; (গ) কৃষ্ণ, নদীয়ায় গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ; এবং (ঘ) গৌরাঙ্গদেবের কৃষ্ণভাবনা।

ওড়িয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে গৌড়ীয় প্রভাবঃ ষোড়শ শতক হইতেই ওড়িয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে গৌড়ীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৭ শতক হইতে ওড়িয়া সাহিত্যে এই পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয় হইয়া উঠে। দ্বারকার পরিবর্তে বৃন্দাবন, জগন্নাথের স্থলে কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর স্থানে রাধা,—ওড়িয়া বৈষ্ণবকাব্যে ধীরে ধীরে প্রকটিত হয়। চৈতন্যের সমকালে ওড়িয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের নায়ক ছিলেন জগন্নাথ। এই জগন্নাথ ধীরে ধীরে জগন্নাথ-কৃষ্ণ হইলেন এবং পরে কৃষ্ণের সহিত একাত্ম হইয়া গেলেন। জগন্নাথ-কৃষ্ণ দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ হইলেন বৃন্দাবনের কেলিগোপাল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাও আসিলেন এবং কাব্যের বিষয়বস্তু হইল—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

সাহিত্যের এই দিক্‌পরিবর্তনের মূলে অবশ্যই রামানন্দ রায়ের 'গোপীভাবনা' এবং চৈতন্যদেবের 'বিপ্রলম্ভ বিরহভাব' প্রেরণা যোগাইয়াছিল। চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবকাব্য যেমন রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র আদর্শানুসারে রচিত হইয়াছিল, ওড়িয়া বৈষ্ণব কবিরা সেইরূপ কোন আদর্শ মানিয়া চলেন নাই এবং তাঁহাদের সম্মুখে 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র তুল্য কোন আদর্শও ছিল না। সেই হেতু কেহ-কেহ দ্বারকাকে পটভূমি করিয়া রুক্মিণীকান্ত কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিলেন, কেহ-বা (ইহারাই

সংখ্যাধিক) জগন্নাথ এবং কৃষ্ণকে একীভূত করিয়া কৃষ্ণকেন্দ্রিক লীলাকাহিনী রচনা করিলেন।

১৭ শতক: এই শতকের বৈষ্ণবকাব্য সম্ভোগ-প্রধান এবং এই শতাব্দির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল জীবনী-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা। এই পর্যায়ে তিনখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে—(ক) দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত'; (খ) ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'; (গ) সুদর্শন দাসের 'যশোবন্ত দাসঙ্ক চৌরাশী আজ্ঞা'।

(ক) দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত'—ওড়িয়া ভাষায় ও সাহিত্যে প্রথম জীবনী গ্রন্থ হইল পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাসের জীবনচরিত। রচয়িতা দিবাকর দাস। ইনি জগন্নাথ দাস প্রতিষ্ঠিত 'অতি বড়ী' সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জগন্নাথোত্তর পঞ্চম পুরুষ। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭ শতকের মধ্যভাগ। ১৮ বৎসর বয়সে জগন্নাথ চৈতন্যের কৃপালাভ করেন এবং ৮ বৎসরকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন—'প্রতি দিবসে চৈতন্য, আসন্তি করি দরশন, দণ্ডে রহন্তি প্রেমে পুনি।... অষ্টবরষ নিরন্তর, সেবিলে চৈতন্য পয়র' (—২ সর্গ)। গ্রন্থটির প্রথম ৭টি সর্গে উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনা তথ্যনিষ্ঠ হয় নাই। জগন্নাথকে দীক্ষা দিবার জন্য চৈতন্যদেব বলরাম দাসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (২ সর্গ), ৪সর্গে জগন্নাথ-সহ চৈতন্যের সার্বভৌম-গৃহে গমন ও তাঁহার নিকট জগন্নাথ-তত্ত্ব শিক্ষা। ৬ সর্গে নিত্যানন্দ, জগন্নাথ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের নিকট 'হরে রাম কৃষ্ণ' মন্ত্র ও পঞ্চাত্মক প্রেম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা। ৭ সর্গে প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যদেবের মিলন, প্রতাপরুদ্র কর্তৃক 'বকুলমঠ'-এ চৈতন্যদেবকে বাসস্থান দান এবং চৈতন্যদেবের তিরোধান।

দিবাকর দাসের এই গ্রন্থটি, বলাবাহুল্য, নির্ভরযোগ্য নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তথ্যনিষ্ঠা দিবাকর দাসের নাই। বরং গ্রন্থটি তিনি ওড়িয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুণ-কীর্তনে পূর্ণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও তিনি মুরারি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপূর হইতে উপাদান সংগ্রহের পরিবর্তে জনশ্রুতি, কিংবদন্তি ও স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া এক বিচিত্র চৈতন্যজীবন রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ, এতদ্‌বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—(ক) শ্রীগৌরাঙ্গের চৈতন্য নাম রাখিয়াছিলেন গৌরাঙ্গের পিতামহ বিষ্ণু পাণ্ডা; (খ) জীব গোস্বামী চৈতন্যের অন্যতম অনুচর ছিলেন; (গ) সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব বৃন্দাবনাদি নানা স্থান পরিক্রমা করিয়া সর্বত্র 'প্রেমভক্তি'-র অভাব দেখিয়া নীলাচলে বসবাস করিয়াছিলেন; (ঘ) শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার হাস্য হইতে যথাক্রমে চৈতন্যদেব ও জগন্নাথ দাসের জন্ম হইয়া-

ছিল ; অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এবং জগন্নাথ দাস শ্রীরাধার অংশ। এই অতি গুহ্যতত্ত্ব জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চৈতন্য কর্তৃক 'অতি বড়' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, ('অতি বড় কথা কহিলে, তেনু অতি বড় হেলে।'—৩ সর্গ)। এইখানেই শেষ নহে। জগন্নাথ দাসাদি ওড়িয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত অন্তরঙ্গতা দেখিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের প্রতি অসন্তুষ্টও হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে অসম্মত চৈতন্যদেবকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনের পথ ধরিলে চৈতন্যদেব যাজপুর হইতে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রথযাত্রার সময় ব্যতীত উড়িষ্যায় আসিতেন না এবং আসিলেও অধিকদিন থাকিতেন না। বলা বাহুল্য, তথ্যগুলি সত্য নহে—কল্পনা-প্রসূত।

দিবাকর দাসের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব শ্রদ্ধেয় নহে। কোথা হইতে তিনি এই বিচিত্র তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। দিবাকর দাসের মতে জগন্নাথ দাস 'রাধার অংশ', অথচ, জগন্নাথ দাস তাঁহার অনূদিত ভাগবতে কোথাও রাধার উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য-পরিকরদিগের মধ্যে একমাত্র গদাধর পণ্ডিতই 'রাধা' বলিয়া কথিত হইতেন এবং ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-(৬২ সর্গ)-এ তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। দিবাকর দাসের গ্রন্থে যে গুরুবংশ-তালিকাটি (৭ সর্গ) পাওয়া যায়, তাহাও নির্ভুল নহে। এই তালিকা অনুসারে গুরুবংশ-পরম্পরাটি এইরূপ—চৈতন্যদেবের শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিত (ইনি চৈতন্য-নিত্যানন্দের মিলিত সত্তা বলিয়া অভিহিত।); গৌরীদাসের শিষ্য হৃদয়ানন্দ, তাঁহার শিষ্য বলরাম দাস; তৎশিষ্য জগন্নাথ দাস; জগন্নাথ দাসের শিষ্য দিবাকর দাস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিতের আত্মীয় ছিলেন, পুরীতে কিছুদিন থাকিয়া ইনি শান্তিপুরে আসেন এবং গৌরীদাসের ছাত্র হন। হৃদয়ানন্দের শিষ্য শ্যামানন্দ। দিবাকর দাসের নামে প্রচলিত ও সংস্কৃতে রচিত 'নিত্যগুপ্ত চিন্তামণি'-তেও (১৯ সর্গ) এই ভ্রমাত্মক গুরুপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) **ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত'**—গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। তিরোহিত চৈতন্যদেব তখন উড়িষ্যায় বুদ্ধ-জগন্নাথ রূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য, চৈতন্যদেবের জগন্নাথে বিলীন হওয়া সম্পর্কে উড়িষ্যাবাসী সকলেই সমবিশ্বাসী ছিলেন না। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ সুবৃহৎ হইলেও অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ। চৈতন্যদেব সম্পর্কে নানা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য কিংবদন্তি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। নামানুযায়ী গ্রন্থটি শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে লিখিত—বক্তা, ঋষি অগস্ত্য (চরিত্রটি

সম্ভবতঃ সারলা দাসের মহাভারত হইতে গৃহীত); শ্রোতা, সম্পূর্ণনগরাধিপ (সারলা দাসের মহাভারতে শ্রোতা বৈবস্বত মনু)। দ্বাপরে কৃষ্ণকে গর্ভে ধরিয়াও দেবকী পালন করিতে পারেন নাই, সেই অপূর্ণ বাসনাই চরিতার্থ করিবার জন্য জগন্নাথ কৃষ্ণরূপে শচীগর্ভে জন্মিয়াছিলেন (১ সর্গ)। বিষ্ণু নারদকে বলিয়াছিলেন যে, মানবের মুক্তির জন্যই তিনি নদীয়ায় চৈতন্যরূপে জন্মিবেন এবং বলভদ্র হইবেন নিত্যানন্দ (২ সর্গ)।

গ্রন্থটি নানা ঘটনায় (ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উভয়ই) পূর্ণ ও জনতাকীর্ণ (নানক, কবীর, বুদ্ধ, বীরসিংহ, অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর শিষ্য জাঙ্গলি ও নন্দিনী, জগাই-মাধাই, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র ইত্যাদি) হইলেও ইহার একটি বিশেষ মূল্যও আছে। সমকালীন ওড়িয়া বৈষ্ণবসমাজ এবং বৈষ্ণবসাহিত্য সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে—(ক) ঈশ্বর দাসের মতে চৈতন্যদেব স্বয়ং জগন্নাথ ('চৈতন্যরূপ জগন্নাথ') এবং এই জগন্নাথ ঈশ্বরের নবমাবতার অর্থাৎ বোধাবতার বা বুদ্ধ-জগন্নাথ; (খ) পঞ্চসখার সহিত চৈতন্যদেবের সম্পর্ক। ঈশ্বর দাসের মনোভাবে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং পঞ্চসখা এক সঙ্গেই যোগ দিতেন; (গ) গ্রন্থ-রচনার সময় নিত্যানন্দ বলরামের অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন (৪৭ সর্গ)। অবশ্য, ঈশ্বরদাস-প্রদত্ত সকল তথ্যই ইতিহাস-সমর্থিত নহে। যথা—নবদ্বীপে চৈতন্যের সহিত রামানন্দের সাক্ষাৎকার (৪৬ সর্গ); অদ্বৈত-রামানন্দ-সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রথম জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ (৪৭ সর্গ); প্রতাপরুদ্রের সহিত 'চৈতন্য আপে ভগবান'-এর সাক্ষাৎকার; বলরাম দাস কর্তৃক মত্তহস্তী বশীকরণ এবং প্রতাপরুদ্র কর্তৃক উক্ত হস্তীটিকে চৈতন্যদেবকে উপহার প্রদান (৪৯ সর্গ) প্রভৃতি।

দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত' এবং ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত', এই দুইখানি গ্রন্থ উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের অবস্থিতি, তাঁহার সহিত পঞ্চসখার সম্পর্ক এবং চৈতন্যদেবের তিরোধান—অন্ততঃ এই তিনটি বিষয়ে আমাদের অবহিত করিতে পারে। গ্রন্থ দুইটি বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহাগ্রন্থ দুইটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

(গ) **সুদর্শন দাসের 'যশোবন্ত দাসঙ্ক চৌরাশী আজ্ঞা'**—অমুদ্রিত এই পুঁথিটি ১৭ শতকের শেষার্ধে রচিত বলিয়া অনুমিত। এই পুঁথিতে যশোবন্তের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং পঞ্চসখার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠতার কথা আছে। পুঁথিটিতে মুসলমান বৈষ্ণবকবি সালবেগকে (ইনি ১৭

শতকের মধ্যভাগে পুরীতে বর্তমান ছিলেন) যশোবন্তের (বর্তমানকাল ১৬ শতক) শিষ্য বলা হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা সত্য নহে।

১৭ শতকের অপর তিনজন উল্লেখযোগ্য কবি হইলেন—চণ্ডীদাস (চণ্ডীকবি), কপিলেশ্বর দাস এবং দেবদুর্লভ দাস। চণ্ডীদাস-রচিত 'গোপীচন্দন' কাব্যের বিষয়বস্তু হইল, গোপীগণসহ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং রুক্মিণী প্রভৃতি কর্তৃক সেই লীলা দর্শন। রাধার উল্লেখ এই কাব্যে একবার মাত্র পাওয়া যায়। কাব্যটিতে অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'-র (১০) ছায়াপাতও লক্ষণীয়। কপিলেশ্বর দাসের 'কপটকেলি' কাব্য সম্ভোগাত্মক; বিষয়বস্তু হইল, নারীবেশে কৃষ্ণের গোপনে রাধার গৃহে গমন ও লীলাবিলাস। চৈতন্য-পরবর্তীকালের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি দেবদুর্লভ দাস। ইঁহার কাব্য 'রহস্যমঞ্জরী'-তে রাধা প্রথম পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। যদিও কাব্যটির নায়িকা রুক্মিণী, তথাপি, কবি দেবদুর্লভ দ্বারকালীলা অপেক্ষা বৃন্দাবন-লীলাতেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, ওড়িয়া বৈষ্ণব-কাব্যে রাধার প্রবেশ সপ্তদশ শতকেই হইয়াছিল।

১৮ শতক: এই শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পর ধর্মীয় সাহিত্য-রচনার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই শতকে চৈতন্য-জীবনকে অবলম্বন করিয়া রচিত কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের অনুভাবিত বৈষ্ণবধর্ম ওড়িয়া কবি-মানসিকতাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই শতাব্দীর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি হইলেন—সদানন্দ কবিসূর্য ব্রহ্মা, কেওঞ্ঝররাজ গোবিন্দভঞ্জ, গোবিন্দদেব এবং ভগবান দাস।

সদানন্দ কবিসূর্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যশাখাভুক্ত ছিলেন। ইঁহার রচনাবলী —'প্রেমতরঙ্গিণী', 'চৌরচিন্তামণি', 'নিষ্ঠানীলমণি', 'বিশ্বম্ভর বিহার', 'ভাবলীলামৃত-সমুদ্র' এবং 'যুগলরসামৃতলহরী'। 'প্রেমতরঙ্গিণী'-তে 'গোরা অবতার'-কে রাধাকৃষ্ণের মিলিত সত্তা বলা হইয়াছে—'কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতারী যে, রাধা-কৃষ্ণ একদেহরে ভজিলে'। 'চৌর চিন্তামণি' ও 'নিষ্ঠানীলমণি' উভয় গ্রন্থেই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে; 'নিষ্ঠানীলমণি'-তে কবিসূর্যের অভিমতে গদাধর পণ্ডিতের অনুগ্রহ ব্যতীত চৈতন্যভক্তি নিষ্ফলা। 'বিশ্বম্ভর বিহার'-এ চৈতন্যের প্রাক্সন্ন্যাস-জীবন বর্ণিত। 'ভাবলীলাসমুদ্র', 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের অনুসরণে রচিত। 'যুগলরসামৃতলহরী'-র বিষয়বস্তু হইল রাধা ও চন্দ্রাবলীর সহিত কৃষ্ণের লীলা-বিলাস।

গোবিন্দভঞ্জ তদীয় 'চরণসুধানিধি'-তে চৈতন্যদেবকে প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণরূপে

বর্ণনা করিয়াছেন—'চৈতন্যাবতারে প্রেমভক্তি হোই। গৌরহরিরূপ জগতে দেখাই'। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের আধারে গোবিন্দদেব ও তৎশিষ্য ভগবান দাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদেবের গ্রন্থের নাম 'গৌরকৃষ্ণোদয়' কাব্য। গ্রন্থটির ভাষা সংস্কৃত, রচনাকাল ১৬৮০ শক=১৭৫৮ খ্রীঃ। ভগবান দাস (ইনি সম্ভবতঃ গঙ্গামাতা মঠের মহান্ত ছিলেন) চৈতন্যের শেষজীবন ও বিরহদশা অবলম্বনে তাঁহার 'গৌরাঙ্গভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। এই শতকের চরিত-বিষয়ক অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল 'শ্রীচৈতন্য-সার্বভৌম-সংবাদ' (বিমানবিহারী মজুমদার—চৈতন্যচরিতের উপাদান। কলিকাতা ১৯৫৯, পৃঃ ৪৯৫ দ্রষ্টব্য।)। এই গ্রন্থে শূন্যব্রহ্ম এবং চৈতন্যভাবনায় কৃষ্ণ—এই দুইয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস লক্ষিত হয়। ১৮ শতকের অপর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি ও তাঁহাদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) **দীনকৃষ্ণ দাস**—'রসকল্লোল'। কাব্যটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পরিদৃশ্যমান। বিষয়বস্তু হইল—রাধা ও অপর গোপীদের সহিত কৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণের মথুরাগমন ও গোপীগণ কর্তৃক বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার স্মৃতিচারণা। কাব্যটির প্রতিটি ছত্র 'ক' দিয়া আরম্ভ। মধ্যযুগের ওড়িয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে কবি-মানসিকতায় এবং গীতিকাব্যধর্মিতায় 'রসকল্লোল' অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত। দীনকৃষ্ণ দাসের অপর দুইটি রচনা হইল, 'নামরত্নগীতা' ও 'আর্তত্রাণচৌতিশা'।

(খ) **ভূপতি পণ্ডিত**—'প্রেমপঞ্চামৃত'। কাব্যের বিষয়বস্তু—রাধাকৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তথা বৈষ্ণব-পদসাহিত্যের মৌল বক্তব্য এই কাব্যে প্রথম দেখা যায়।

(গ) **ভক্তচন্দ্র**—'মথুরামঙ্গল'। কাব্যটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের আধারে রচিত। বিষয়বস্তু হইল—মথুরাগত কৃষ্ণের জন্য গোপীদের তীব্র বিরহবেদনা। উদ্ধব তাহাদের তত্ত্বকথা দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানে ব্যর্থ হইয়া পরিশেষে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, প্রেম জ্ঞান অপেক্ষাও বড়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মাদর্শে জ্ঞান ও প্রেমের তারতম্যের আভাষ কাব্যটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। কবির অপর রচনা হইল 'মনবোধচৌতিশা'। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে অবলম্বন করিয়া আরও অনেক কবি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। যথা,—বৃন্দাবতী দাসী ('পূর্ণতমচন্দ্রোদয়'। পূর্ণতমচন্দ্র=শ্রীকৃষ্ণ); দনাই দাস ('গোপীভাষা'); লক্ষ্মণ মিশ্র ('কৃষ্ণলীলামৃত'); দাশরথি ও কৃপাসিন্ধু ('ব্রজবিহার কবিতাবলী'); রাজা জগন্নাথ নারায়ণ দেও ('বৃন্দাবন বিহার') প্রভৃতি।

ওড়িয়া বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে রাধা : বৈষ্ণব-পদাবলী 'বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য'—এই মন্তব্য চৈতন্যোত্তর বাঙ্গালী পদকর্তাদের পদাবলীর পক্ষে সুপ্রযুক্ত। ওড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও কবিরা সম্ভোগের সরণী ধরিয়া বিরহে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্ভোগ বৈষ্ণবকাব্যের বহিরঙ্গ, বিরহ অন্তরঙ্গ প্রেমের প্রাণসত্তা। রাধাকৃষ্ণ সেই অনন্ত প্রেমের চিরন্তন নায়ক-নায়িকা।

'The Oriya Vaishnava poets at first gave prominence to the Gopis. But Radha eclipsed the Gopis as the chief object of Krishna's adoration. The sex passion has been glorified in some pages of the *Rasakullola* and the *Gopibhasha.* Gradually sex lost its importance. In the eighteenth century *Mathura* poems enriched Oriya literature'.

'To them (that is the Oriya poets) Radha and Krishna embody transcendental love. They did not consider erotic descriptions to be obscene. Even the morally irreproachable Raghunath Das Goswami, who practised extreme asceticism, gives a luscious description of the beauty and love sports of Radha in his *Vilapa Kusumanjali*, without restraint. The concept of morality changes from time to time. The transition from Victorian gown to Bikini has taken less than a century.' P. Mukherjee—*History of the Chaitanya Faith in Orissa.*

১৯ শতক : এই শতকে বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চম্পূকাব্য রচনার প্রবণতা দেখা যায়। এই 'চম্পূ'-তেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাব সর্বাধিক।[২৯] এই শতকে চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি পুঁথি রচিত হইয়াছিল—ভ্রমরবর দাসের 'চৈতন্যগীতা', গোবিন্দ ভট্টের 'চৈতন্যাবলী', ভক্তচরণ দাসের 'মনশিক্ষা', আটগড়ের রাজা বিশ্বনাথ দেও-র 'চৈতন্যপঞ্চক' প্রভৃতি। এইগুলির অবশ্য ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই। এই শতাব্দির অপর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি হইলেন—(ক) অভিমন্যু সামন্ত সিংহার (১৭৫৭-১৮০৭ খ্রীঃ)—'বিদগ্ধ-চিন্তামণি'। গ্রন্থটি 'বিদগ্ধ-মাধব'-এর অনুসরণে রচিত। বিষয়বস্তু হইল রাধাবিরহ। কবি সদানন্দ কবিসূর্য ব্রহ্মার উত্তরসূরী। (খ) বলদেব রথ (১৭৮৯-১৮৪৫ খ্রীঃ)—'কিশোরচন্দ্রানন চম্পূ'।

ইহার বিষয়বস্তু হইল, রাধাকৃষ্ণ-মিলনের জন্য দূতীর প্রয়াস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বাংলা বৈষ্ণবকাব্যে 'দূতী সংবাদ' প্রসঙ্গতঃ তুলনীয়)। কাব্যটিতে 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুস্মৃতি স্পষ্ট। (গ) গোপালকৃষ্ণ পটনায়ক (মৃত্যু ১৮৬২ খ্রীঃ)—রচয়িতা হিসাবে ইঁহার পরিণত শিল্পবোধ, জীবনকেন্দ্রিক অধ্যাত্মভাবনা ও উন্নত কবি-মানসিকতা লক্ষণীয়। কবি উড়িষ্যাকেই রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি করিয়াছেন। ওড়িয়া পদসাহিত্যে ইনিই প্রথম প্রশ্নোত্তরমূলক এবং বাৎসল্য রসের পদ রচনা করেন। ইঁহার রচনা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসকে স্মরণ করায়। ইহা ব্যতীত বনমালী দাস, ধনঞ্জয় ভঞ্জ এবং নীলকণ্ঠ ভঞ্জও রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যায় ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যযুগ বলিতে ১৫-১৯ শতককে বোঝায়। কপিলেন্দ্রদেবের সময় সারলা দাসের মহাভারত, প্রতাপরুদ্রদেবের শাসনকালে তাঁহার নামে প্রচলিত রচনাবলী ('শ্রীসরস্বতী-বিলাস', 'প্রৌঢ়প্রতাপমার্তণ্ড', 'নির্ণয়-সংগ্রহ', 'কৌতুক-চিন্তামণি' এবং একটি বাংলা পদ[৩০]), পঞ্চসখার রচনাগুলি এবং রামানন্দ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচিত হয়। চৈতন্য-তিরোধানের পর ১৯ শতক পর্যন্ত ওড়িয়া সাহিত্যে প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি-পুরাণের অনুসরণ লক্ষিত হয়। কিছু তত্ত্ববিষয়ক ও গুরুসবর্ণীর মাধ্যমে রচিত গ্রন্থও এই কালসীমার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।[৩১]

কালগত পরিমাণে ওড়িয়া সাহিত্যের বয়ঃক্রম ভারতীয় অপরাপর সাহিত্যের তুলনায় কনীয়ান্। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলিতে ১৫-১৮ শতক বুঝায়, কিন্তু, ওড়িয়া সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান ১৯ শতকে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে যেমন চৈতন্যদেব ও তাঁহার ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব মধ্যযুগের সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ওড়িয়া সাহিত্যও ঠিক তেমনিভাবেই চৈতন্য-প্রভাবান্বিত। ওড়িয়া সাহিত্যের যথার্থ সূত্রপাত হইয়াছিল উড়িষ্যায় চৈতন্যাগমনের পর। যে-ক্ষীণস্রোতোধারা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের খাত বাহিয়া বহিতেছিল, চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাহা নানাদিকে, নানাভাবে আপনাকে প্রসারিত করিয়া তুলিল। জীবনী-বিষয়ক সাহিত্য বঙ্গদেশে যেমন মধ্য-যুগের উল্লেখযোগ্য ফসল, উড়িষ্যাতেও তদনুরূপ। উভয়দেশের সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে দণ্ডায়মান এক অমিতবীর্য সুবর্ণসন্নিভকান্তি ব্যক্তিত্ব—ইনি হইলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

॥ ৮ ॥ চৈতন্যদেব ও সমকালীন উড়িষ্যা

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নবদ্বীপে (১৪০৭ শক = ১৪৮৫ খ্রীঃ) এবং তিরোভাব উড়িষ্যায় (১৪৫৫ শক = ১৫৩৩ খ্রীঃ)। ৪৮ বৎসর জীবৎকালের মধ্যে শেষ ২৪

বৎসর তিনি উড়িষ্যাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন (অবশ্য, প্রথম ৬ বৎসর তাঁহার দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণে কাটিয়াছিল)।

চৈতন্যজন্মের সময় গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন জলালউদ্দীন্ ফতে শাহ (১৪৮৩-৯১ খ্রীঃ), ইনি হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। পরবর্তী স্বাধীন সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ (১৪৯৬-১৫২২ খ্রীঃ)। ইনি হিন্দুপ্রেমী ছিলেন কি-না তাহা বলা কঠিন, তবে তিনি দূরদর্শী শাসক ছিলেন। চৈতন্যের জন্মের পূর্বেই মুসলমান শাসন ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অত্যাচারের (বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের প্রতি) বিরুদ্ধে নবদ্বীপে বৈষ্ণবান্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছিল। রঘুনন্দন তাঁহার 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'-এ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে-বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের কোন অবকাশই ছিল না। অদ্বৈতাচার্য এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেই ঈশ্বরাবতার-প্রার্থনা করিয়াছিলেন ('অদ্বৈতের আহ্বানে চৈতন্য অবতার।'— চৈতন্যভাগবত)। যাঁহারা এই দেশ, কাল ও সমাজ সম্পর্কিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। কেশবভারতী গৌরাঙ্গদেবকে তাঁহার প্রার্থনামত দশাক্ষরী গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দেন (মুরারি গুপ্ত, ৩।২।৭)। চৈতন্য-জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে ১৫১০ খ্রীঃ, যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।[৩২] সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে-ঐতিহাসিক মানবটির জন্ম হইল তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল উড়িষ্যা (নবদ্বীপ নহে)।

উড়িষ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঃ চৈতন্যদেব যখন উড়িষ্যায় গমন করেন, তখন, উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব। আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের সহিত প্রতাপরুদ্রের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ১৫০০ খ্রীঃ বঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রতাপরুদ্রের ইডু-পুলু-পডু দানলিপিতে (১৫০০ খ্রীঃ। Archeological Report No. 802 of 1922) দেখা যায় যে, বীররুদ্র হুসেনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের ১৫০৪-০৫ খ্রীঃ মুদ্রায় আবার তাঁহাকে 'যাজনগরজেতা' বলা হইয়াছে। ১৫১১ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে 'অমরু সুরথান পতিশা' (= আমীর সুলতান বাদশাহ) হুসেন শাহ পুরী অবরোধ করেন। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণদেশ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত ছিলেন।[৩৩] পুরী অবরোধের সংবাদ পাইয়া প্রতাপরুদ্র ফিরিয়া আসেন এবং ১৫১১ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে হুসেনকে হুগলী জেলার মান্দারণ পর্যন্ত বিতাড়িত করেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায়

প্রতাপরুদ্র মান্দারণ দুর্গাশ্রিত হুসেন শাহকে বন্দী করতে পারেন নাই (মাদলাপঞ্জী। প্রাচী সং। পৃ ৫২১)। কানাই খুঁটিআর বিবৃতিতে ('মহাভাব প্রকাশ') হুসেন শাহের পরিবর্তে তাঁহার সেনাপতি 'সুরস্থান ঘাজী ইসিমিলি'-র (গাজী ইসমাইল) নামোল্লেখ আছে কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধরের কোন উল্লেখ নাই। ১৫১৪ খ্রীঃ উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্থগিত হইলেও দুই অধিপতির মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই।[৩৪] উড়িষ্যা হইতে চৈতন্যদেব প্রথমে দক্ষিণদেশ ও পরে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে ১৫১৫ খ্রীঃ চৈতন্যদেব উড়িষ্যাতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর, তাঁহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর পুরীতেই অতিবাহিত হয়।

চৈতন্য-তিরোধান ঃ 'নীলাচল বিভূষণ' চৈতন্যদেবের জীবনকথা লইয়া বাঙ্গালী ও ওড়িয়া উভয় দেশেরই একাধিক ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কেহই কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোন্ দিন ও কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মরদেহের কি পরিণতি হইল, এই সম্পর্কে চারিটি মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে—(ক) জয়ানন্দ ও সদানন্দ কবিসূর্য ব্রহ্মার মতে তিনি টোটা গোপীনাথের মন্দির সংলগ্ন উদ্যানবাটিকায় অন্তর্হিত হন ; (খ) নরহরি সরকারের অভিমতে গোপীনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে চৈতন্যের তিরোধান ঘটে ; (গ) লোচন দাসের মতানুসারে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান গুণ্ডিচাবাড়ীতে হয় ; (ঘ) ঈশান নাগর, অচ্যুতানন্দ, দিবাকর দাস ও ঈশ্বর দাস মনে করেন যে, জগন্নাথ-মন্দিরে চৈতন্য অন্তর্হিত হন। অতঃপর ক্রমানুসারে এই মতগুলি আলোচিত হইতেছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (পৃঃ ১৫০) অনুসারে চৈতন্যদেব টোটা গোপীনাথে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তিরোহিত হন। তিরোধানের কারণ—বামপদদেশে ইষ্টক-খণ্ডাঘাতজনিত ক্ষত (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীকৃষ্ণও আষাঢ় মাসে পদদেশে ব্যাধের শরাঘাতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন)। গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের অন্তিমকালে সেবা করেন। চৈতন্যদেব বালুপ্রোথিত গোপীনাথের বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া গদাধরকে উক্ত বিগ্রহের সেবার্থে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং গদাধরও শেষজীবন টোটা গোপীনাথেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ এবং ওড়িয়া কবি সদানন্দ কবিসূর্য ব্রহ্মা উভয়েই গদাধরের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্য-তিরোধান বিষয়ে সদানন্দ জয়ানন্দের সহিত একমত—'অষ্টচালিশ বরষে অন্তর্ধান টোটা গোপীনাথ স্থানে' (—'প্রেমতরঙ্গিণী', ৩৬ সর্গ)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবল অন্তর্ধানের বর্ষটি ব্যতীত ('চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।'—চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৩) অপর কোন তথ্যের উল্লেখ করেন নাই।

নরহরি সরকারের অভিমতে (ভক্তিরত্নাকর, ৮ সর্গ) চৈতন্যদেব গদাধর পণ্ডিতের সহিত কথা বলিয়া টোটা গোপীনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হন। মন্দিরের প্রস্তর ফলকে ভক্তিরত্নাকরের শ্লোকগুলি উৎকীর্ণ আছে।

লোচন দাসের মতে ('চৈতন্যমঙ্গল'। পৃঃ ২১০) চৈতন্যের অন্তর্ধানকাল— আষাঢ় মাস, ৭মী তিথি, রবিবার। ইনি ওড়িয়া-বিশ্বাসে (চৈতন্যের জগন্নাথ মূর্তিতে বিলীন হওয়া) আস্থাশীল। জগন্নাথদেব ঐ সময়ে গুণ্ডিচাবাড়ীতে ছিলেন ('জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে' ; 'গুণ্ডিচাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অন্তর্ধান')। লোচনদাস নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন, সেইহেতু তিনি গদাধর পণ্ডিতের মতকে প্রাধান্য দেন নাই।

ঈশান নাগর, অচ্যুতানন্দ, দিবাকর দাস ও ঈশ্বর দাসের মতানুসারে চৈতন্যদেব জগন্নাথের মন্দিরে / জগন্নাথে বিলীন হন। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ'-এ দেখা যায় যে, চৈতন্য জগন্নাথের মন্দিরে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস ও কানাই খুঁটিআ চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে নীরব। অচ্যুতানন্দের মতে (শূন্যসংহিতা, ১) বৈশাখ মাসে 'চন্দন যাত্রা'-র (অক্ষয় তৃতীয়া) দিনে শূন্য নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীচৈতন্য জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া সত্য প্রকাশি করতঃ জগন্নাথে বিলীন হইয়াছিলেন ('চৈতন্য ঠাকুর, মহা নৃত্যকার, রাধা রাধা ধ্বনি কলে। জগন্নাথ-মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে বিদ্যুপ্রায় মিশি গলে ॥') পুনশ্চ, দিবাকর দাসের মতে ('জগন্নাথ-চরিতামৃত'। ৭ সর্গ) শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-বিগ্রহে বিলীন হইয়াছিলেন ('এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য। শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন ॥ গোপন হেলে স্বদেহে। দেহি কাহার দৃষ্টি নহে ॥ রাজা হৈলে মনে ছন্ন। হে প্রভু হেলা অন্তর্ধান ॥') ঈশ্বর দাস ('চৈতন্য-ভাগবত'। ৬৪ সর্গ) বলেন যে, অক্ষয় তৃতীয়া চন্দন-যাত্রার দিনে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ-বক্রেশ্বর-হৃদয়ানন্দ-পঞ্চসখাদির সহিত হরিকীর্তন করিতে করিতে জগন্নাথের মন্দিরে গমন করতঃ শ্রীবিগ্রহকে চন্দন চর্চিত করিতে গেলে জগন্নাথদেব চৈতন্যের হস্ত হইতে চন্দন পাত্রটি গ্রহণ করেন এবং মুখব্যাদান পূর্বক তাঁহাকে গলাধঃকরণ করেন ('এমন্তে কিচ্ছি দিন যাই। অক্ষয় তৃতীয়া দিন হোই ॥ সে দিন যে যাত্রা চন্দন। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গমন ॥ ···চন্দন খোরা হস্তে পড়ি। শ্রীজগন্নাথ ভুজ ভিডি ॥ শ্রীমুখ বিস্তারি গোঁসাই। গর্ভে চৈতন্য লীন হোই ॥')। চৈতন্য-তিরোধানের সময় সপারিষদ্ প্রতাপরুদ্রদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইল,—চৈতন্যদেবের মরদেহটির কি পরিণতি হইল? জয়ানন্দ বলিয়াছেন—'মায়া শরীর তথা রহিল পড়িয়া'। ঈশ্বর দাস (চৈতন্যভাগবত। ৬৫ সর্গ)

ব্যতীত অপর কেহই মরদেহটির পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলেন নাই—'সেহি স্বরূপ শ্রীচৈতন্য। লীন যে নীলাদ্রিলোচন॥ শ্রীজগন্নাথ কলেবর। একাত্মা একাঙ্গ শরীর॥ সমস্তে এমন্ত দেখন্তি। মায়া শরীর ন জানন্তি॥ চৈতন্য পিণ্ড সিংহাসন। দেখন্তি ত্রৈলোক্যমোহন॥ ক্ষেত্রপালঙ্ক আজ্ঞা দেই। এ পিণ্ড নিয়া বেগ করাই॥ অন্তরক্ষে নেই গঙ্গাজল। মেলিণ দিয়া ক্ষেত্রপাল॥ শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। অন্তরক্ষে নেলে শব বহি॥ গঙ্গারে মেলি দেলে শব।'

কানাই খুঁটিআর 'মহাভাবপ্রকাশ'-(৩ সর্গ)-এ দেখা যায় যে, জগন্নাথের মন্দিরাভ্যন্তরে একটি গুপ্ত পথ আছে। চৈতন্য-তিরোধানকে জনসাধারণের নিকট রহস্যাবৃত রাখিবার জন্যই সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছানুসারে শবদেহ মন্দিরের গুপ্ত পথ দিয়া মধ্যরাত্রে বাহির করিয়া প্রাচী নদীতে বিসর্জিত হইয়া থাকিবে। উক্ত শবদেহ প্রকাশ্যে সমাধিস্থ কিংবা দাহ করা হয় নাই এবং স্থানীয় বিশ্বাস অনুসারে (উদ্ধব দাস—'প্রাচীমাহাত্ম্য'। ১২ সর্গ। কটক, ১৯২১) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গঙ্গা পুরী হইতে ২৬মাইল দূরবর্তী গোমতী-তীর্থস্থ প্রাচী নদীতে অবতীর্ণা হন। জয়ানন্দ ও লোচন দাস অক্ষয় তৃতীয়ার চন্দন যাত্রার দিনে চৈতন্য-তিরোধানের উল্লেখ করেন নাই। ঈশ্বর দাস সম্ভবতঃ ঐ দিনটি নির্বাচন করিয়াছিলেন কারণ, উক্ত অক্ষয় তৃতীয়ায় দিনেই পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ-বিগ্রহকে চন্দন-চর্চিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন (স্কন্দপুরাণ। উৎকল খণ্ড। ২৯)। সুতরাং, এই সকল বিবৃতি দেখিয়া বলিতে হয় যে, চৈতন্য-তিরোধান কাল হইল বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া (২৭ এপ্রিল ১৫৩৩), অথবা, আষাঢ়ী সপ্তমী (২৯ জুন ১৫৩৩)।

কবিকর্ণপূরের কাব্যে (১৫৭৬ খ্রীঃ) প্রথম জগন্নাথ-দর্শনে চৈতন্যদেবেব মূর্ছা এবং জগন্নাথে তাঁহার বিলীন হওয়ার কথা নাই; মনে হয়, কবিকর্ণপূর চৈতন্যবিলীন-বিষয়ক উড়িষ্যা-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। অতএব, সমগ্র আলোচনা হইতে কোন নির্দিষ্ট ও প্রমাণিত সত্যে উপনীত হওয়া গেল না। উক্ত তিরোভাব-রহস্য রহস্যই রহিয়া গেল। গৌড়ীয় মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায় যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, কিন্তু মৃত্যু নাই—'আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ' (বৃন্দাবন দাস—'চৈতন্যভাগবত')।

উড়িষ্যার পতন ও চৈতন্যদেব: উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের দীর্ঘ দিন অবস্থিতি এবং প্রতাপরুদ্রের চৈতন্যানুরাগ বিষয়ের কেহ-কেহ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। উড়িষ্যার পতন সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (*History of Orissa*, 1930/31. Vol. I. P. 330-32) এবং উত্তরকালে মায়াধর মানসিংহ (*History of Oriya*

Literature, **Sahitya Akademi, New Delhi, P. 89-91**)। চৈতন্য-দেবকে মুখ্যতঃ দায়ী করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলি হইল—(ক) প্রতাপরুদ্রের চৈতন্যানুরাগ ও চৈতন্যের নব বৈষ্ণববাদ উড়িষ্যার সমরশক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল। (খ) চৈতন্যের পরামর্শে (জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', বিজয় খণ্ড) প্রতাপরুদ্র বঙ্গদেশের পরিবর্তে কাঞ্চী অভিযান করিয়াছিলেন। (গ) রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ককে দোষী জানিয়াও প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (ঘ) চৈতন্যানুরাগ বশতঃ রামানন্দ রায়ের রাজকার্যে অবহেলাও উড়িষ্যার পতন আসন্ন করিয়াছিল।

এই অভিযোগগুলি-যে ইতিহাসসম্মত নহে, নিম্নোদ্ধৃত যথানুক্রমিক তথ্যাবলী হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

(ক) প্রতাপরুদ্র চৈতন্যানুরাগী ছিলেন বটে, তবে এই অনুরাগ তাঁহাকে রাজকার্যে অমনোযোগী করে নাই। চৈতন্যের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পূর্বে ও পরে তাঁহার জীবনের ঘটনাপঞ্জী হইল এইরূপ:—১৫০৯ খ্রীঃ—বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণদেশ গমন। ১৫১১ খ্রীঃ—হুসেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণ প্রতিহত করিতে দক্ষিণদেশ হইতে প্রতাপরুদ্রের প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় দক্ষিণে গমন। ১৫১২ খ্রীঃ—প্রতাপরুদ্রের উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন। কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট তাঁহার পরাজয়। ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ—কৃষ্ণদেব রায়ের উদয়গিরি অবরোধ এবং প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধযাত্রা। ১৫১৬ খ্রীঃ—কোণ্ডপল্লী রক্ষার্থ প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয় বরণ। দেখা যাইতেছে, প্রতাপরুদ্রকে ১৫০৯-১৬ খ্রীঃ এই সময়সীমার মধ্যে রাজ্যের দুই সীমান্তে ক্রমাগত ছুটিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। সুতরাং, পুরীতে নিশ্চিত হইয়া চৈতন্যের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চৈতন্যের 'নব বৈষ্ণববাদ'-ও তাঁহার জীবৎকালে উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় নাই। এই দিক দিয়াও প্রতাপরুদ্র চৈতন্য-প্রভাবিত হইতে পারেন না। উড়িষ্যার সমরশক্তি দুর্বলতার কারণ হইল, যুগপৎ দুই সীমান্তে যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা।

(খ) 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর সাক্ষ্য ঐতিহাসিক তথ্যবিরোধী। জয়ানন্দের কাঞ্চী-অভিযান বিষয়ক বক্তব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন (বিমান-বিহারী মজুমদার—'চৈতন্যচরিতের উপাদান',

উপরন্তু, শিলালিপির সাক্ষ্যে[৩৫] দেখা যায় যে, ১৫১৩।১৪ খ্রীঃ প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধযাত্রা

চন্দ্রগিরি প্রদেশান্তর্গত কাঞ্চীর বিরুদ্ধে নহে, বিজয়নগররাজ কৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে। চৈতন্যদেব রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনদিনই বিজড়িত ছিলেন না।

(গ) রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক উত্তর-উড়িষ্যার একটি জেলার রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে রাজার 'মূলধন ব্যয়' করিবার যে-অভিযোগ তাহা সত্য বটে, তবে, সেই অভিযোগ ও প্রতাপরুদ্র কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি (চাঙ্গে মৃত্যুবরণ)—এই দুইয়ের মধ্যে-যে নানা মিথ্যা অভিযোগও ছিল, তাহা 'চৈতন্য-চরিতামৃত'এ-(৩।৯)-এ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতাপরুদ্র যখন তদন্ত করিয়া বিষয়টির সত্যাসত্য জানিয়াছিলেন, তখন গোপীনাথকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি কখনও চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রভাবিত হন নাই।

(ঘ) প্রতাপরুদ্রের সময়ে দক্ষিণদেশস্থ তিনটি প্রদেশ উড়িষ্যার শাসনাধীন ছিল। উত্তর-সীমান্তবর্তী (যাহা দক্ষিণ-সীমান্ত বলিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়াছিলেন) রাজ্য 'রাজমহেন্দ্রী'-র অধিকর্তা ছিলেন রামানন্দ রায়। রাজ্য-শাসনোচিত মনোভাব-যে তাঁহার ছিল না, ইহা রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্র উভয়েই জানিতেন (চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।৯)। সেই হেতু রাজ্যভার হইতে মুক্তি পাইবার রামানন্দকৃত আবেদন অচিরেই প্রতাপরুদ্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতাপরুদ্রের পক্ষে উত্তর-সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলটিকে সুদৃঢ় করিবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য এই দুর্বল অংশটির মধ্য দিয়াই বারংবার মুসলমান আক্রমণের ফলে উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছিল। রামানন্দের পদত্যাগ উড়িষ্যার স্বাধীনতা-অবলুপ্তির কারণ নহে। প্রতাপরুদ্রের প্রধান দুর্বলতা হইল, তিনি গোদাবরী-কৃষ্ণা অঞ্চলকে সুরক্ষিত করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। এই নিমিত্তই গোলকুণ্ডার কুলি কুতুব খাঁর কোণ্ডপল্লী অবরোধ অনায়াসেই সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর (১৫৪০ খ্রীঃ) পর গোদাবরী-কৃষ্ণা অঞ্চল উড়িষ্যার হস্তচ্যুত হয়। উড়িষ্যার স্বাধীনতাহানির মূল কারণ হইল—রাজকর্মচারী-দিগের বিশ্বাসঘাতকতা। গোবিন্দ বিদ্যাধর ও মুকুন্দ হরিচন্দন (ইহারা সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রতাপরুদ্রের পুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়াছিল), নরসিংহ জেনা, রঘুভঞ্জ চট্টরাই, রামচন্দ্র ভঞ্জ, মানাই মহাপাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারীগণ এই বিশ্বাসঘাতকদলের অন্তর্ভুক্ত। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর ২৮ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন বংশের ব্যক্তিরা উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন এবং ইহাদের কাহারও উপর চৈতন্যপ্রভাব ছিল না। চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় না থাকিলেও উড়িষ্যার পতন ঘটিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

'Had there been no Chaitayna movement, even then the succession of the weaklings, the moral degeneration of the high officials of the state and the decline in the military strength of the nation after the crushing defeat at the hands of Krishnadeva Raya would have brought about the downfall of Orissa, sooner or later.' P. Mukherjee—*History of the Chaitanya Faith in Orissa.*

॥ ৯ ॥ উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে চৈতন্যদেব ও তদীয় মতাদর্শের সম্প্রসারণ

চৈতন্য-সমকালীন উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম ঃ চৈতন্যদেব যখন পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন, সমগ্র উড়িষ্যা রাজ্যের অধিদেবতা জগন্নাথ এবং নিরাকার কৃষ্ণ/বুদ্ধ-জগন্নাথ কেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম (Esoteric Vaishnavism) ওড়িয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে যেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের[৩৬] জন্মলাভ ও প্রচার হয় নাই, তেমনি উড়িষ্যাতেও তাঁহার মতবাদ তদীয় অবস্থানকালে বিস্তৃতি লাভ করে নাই। স্যার যদুনাথ সরকার যথার্থই বলিয়াছেন—'Chaitanya did not found a Church'. (*History of Bengal.* Vol 2. P. 220)। নিজস্ব মতবাদ-সম্বলিত গ্রন্থরচনার সময় ও ইচ্ছা চৈতন্যদেবের ছিল না। সেই কারণেই, চৈতন্যদেব রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে যথাক্রমে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও স্মৃতি-সংহিতা রচনা করিবার দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পাইতেছি 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'হরিভক্তিবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থ।[৩৭] ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা চৈতন্যদেবের ছিল না। যদিও তিনি গোপালকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, তথাপি, তিনি শিব (অম্বুলিঙ্গ, জলেশ্বর, লিঙ্গরাজ, রামেশ্বর প্রভৃতি, রাম, নৃসিংহাদি দেবমূর্তিকে কখনও অমান্য করেন নাই এবং নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে (শূদ্র, মুসলমান প্রভৃতি) গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের কাব্যে, কবিকর্ণপূরের নাটকে, চৈতন্যভাগবতে (৩।৪) এবং চৈতন্যচরিতামৃতে (২।৮, ১৮) ইহার প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান। উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তিনি ওড়িয়া সমাজ, সামাজিক রীতিনীতি ও আচারবিচার ঔদাসীন্যবশতঃ অবহেলা করেন নাই। লোক-উদ্ধারের জন্য তাঁহার জন্মপরিগ্রহ যদি ইহা মানিতে হয়, তবে, লৌকিক ব্যবহারকে পরিপূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা চলে না; করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়—চৈতন্যদেব ইহা ভালভাবেই জানিতেন।

চৈতন্যদেবের শিক্ষাও সহজ ছিল। তাঁহার শিক্ষাষ্টকের উপদেশগুলি শাস্ত্রশাসনের ধার ধারে না। যদি প্রশ্ন হয়—চৈতন্যদেবের শাস্ত্রাতিরেকী ধর্মোপদেশ এবং বিধিনিষেধাত্মক বৈষ্ণবচর্যা সমূহের মধ্যে সঙ্গতি কোথায় এবং স্মৃতিশাস্ত্র রচনায় তিনি সনাতনগোস্বামীকে কেন উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, প্রাকৃতজনের পক্ষে নিয়মানুগত্য না থাকিলে ভ্রষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা; এইজন্যই সম্ভবতঃ চৈতন্যদেব বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র রচনার প্রয়োজন অনুভব করিয়া সন্ন্যাসী সনাতনকে তাহা লিখিবার ভার দিয়া থাকিবেন।

উড়িষ্যায় এমন অনেক চৈতন্যানুরাগী ছিলেন, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ 'নিরাকার কৃষ্ণ' ধারণায় বিশ্বাসী হইয়াও আপনাকে চৈতন্য-শিষ্য বলিয়া দাবী করেন; অথচ, চৈতন্যদেব কৃষ্ণের নিরাকারত্বে বিশ্বাস করিতেন না। 'শূন্যসংহিতা'-য় (১) অচ্যুতানন্দ চৈতন্যদেবকে 'মহাপণ্ডিত যে চৈতন্য গোঁসাই বেদবেদান্তরে সার' বলিয়াছেন। ইহা সম্ভব হইয়াছিল, কারণ, পুরীতে সর্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের নিকট সমবেত হইতেন। তাঁহার অকৃত্রিম জগন্নাথানুগত্য দেখিয়া ওড়িয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিতেন। তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অসামান্য রূপলাবণ্য এবং অলৌকিক ব্যক্তিত্ব কি-উড়িষ্যায়, কি-অন্যত্র সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনের শেষাংশে তাঁহার মধ্যে যে-রাধাভাবসাধনা লক্ষিত হইয়াছিল, যাহা উত্তরকালে তাঁহাকে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ'-এ আখ্যায়িত করিয়াছিল, সেই সাধনার ভূমিপীঠ হইল—সুনীল জলধি-তীরবর্তী দারুব্রহ্মতীর্থ উড়িষ্যা।

চৈতন্যোত্তর উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম: উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব তাঁহার ধর্মধারণা প্রচার করেন নাই। রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার মতৈক্য ছিল। পঞ্চসখাগণ শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইলেও কোনক্রমেই চৈতন্য-প্রভাবিত ছিলেন না, বরং বলা যায়, চৈতন্য-আগমনের পূর্বেই উড়িষ্যায় রাধাকৃষ্ণ-ধারণা (cult প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের সময়ে এই রাধাকৃষ্ণ-ধারণা আরও গতিসম্পন্ন হয় তদ্ব্যতীত, উড়িষ্যাবাসীদিগের উপর চৈতন্যপ্রভাব অসামান্য হইলেও সমগ্র উড়িষ্যাতে চৈতন্যপ্রভাব পড়ে নাই। বালেশ্বর, কটক, পুরী, গঞ্জাম, কেওঞ্ঝড়, ময়ূরভঞ্জ, ঢেণ্‌কানল এবং কোরাপুটের মধ্যেই চৈতন্যের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল। মারাঠাশাসনের (১৮ শতক) পূর্বে পশ্চিম-উড়িষ্যা হইতে উত্তরপূর্ব-উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন থাকায় পশ্চিম-উড়িষ্যায় চৈতন্যপ্রভাব লক্ষিত হয় নাই। তথায় স্থানীয় দেবদেবীগণই পূজিত হইতেন। ১৭।১৮ শতকে উড়িষ্যায় যখন চৈতন্যধর্মভাবনা

বিস্তৃত হইয়াছিল, তখনও উড়িষ্যার প্রধান ধর্ম ছিল বৈষ্ণবধর্ম। ওড়িয়া বৈষ্ণবগণের ঐতিহ্যবাহিত দেবধারণা (নিরাকার কৃষ্ণ, বুদ্ধ-জগন্নাথ) ধীরে ধীরে চৈতন্যধারণার দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর দাস বলিয়াছিলেন যে, জগন্নাথদেব চৈতন্যকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন কিন্তু বাস্তবে ইহার বিপরীতই লক্ষিত হয়।

'It was probably the blending of the typical Oriya school of Visnuism and the Jagannath cult with the Chaitanya Faith which led the way for the spectacular success of Visnuism in Orissa'. P. Mukherjee—*The Cult of Jagannatha and the Regional Tradition of Orissa.* (Ch. XVI. P. 319).

'The Chaitanya faith in Orissa assimilated the cult of Jagannath. According to Isvara Dasa, Jagannath swallowed Chaitanya. Chaitayaism in Orissa swallowed Jagannathism.' P. Mukerjee—*History of the Chaitanya Faith in Orissa.* (Ch. IX. P. 87).

'Orissa became such a stronghold of the Chaitanya Faith that to-day the name of Gauranga is more commonly reverenced in Orissa than in Bengal itself.' R. Kennedy—*The Chaitanya Movement* (Calcutta 1925, P. 75).

'To the masses of Orissa, he (=Chaitanya) proved to be a veritable fountain-head of unprecedented spiritual enthusiasm. Even today to millions in Orissa Chaitnya is the only God.' Mayadhar Mansinha—*History of Oriya literature*

চৈতন্যদেবের উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তাঁহার প্রধান বঙ্গীয় অনুরাগীবৃন্দের মধ্যে নিত্যানন্দ ওঝা, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিত (মিশ্র) তাঁহার সহিত অল্পাধিক কাল থাকিতেন। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে উড়িষ্যায় নিত্যানন্দ বিশেষ আদৃত হন নাই ; উড়িষ্যায় তাঁহার স্থিতিকাল ও পরিচিতি খুব বেশী না থাকাই ইহার কারণ। কেবল ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ব্যতীত ওড়িয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ উল্লেখও নাই। তিনি চৈতন্যাদেশে পঞ্চসখার অন্যতম অনন্ত দাসকে নামোপদেশ দিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় তাঁহার খ্যাতি হইতে সময় লাগিয়াছিল.

বর্তমানে অবশ্য নিত্যানন্দ-পরিবারের শিষ্য হওয়া ওড়িয়াদিগের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।[৩৮] অদ্বৈত আচার্য একাধিকবার পুরীতে আসিয়াছিলেন এবং পুরীতেই তিনি সাধারণ্যে প্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন—'সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঁঞি' (চৈতন্য ভাগবত, ৩।১০)। শ্রীবাসও বহুবার পুরীতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ অনুচর গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের সেবাধিকারিক ছিলেন। উড়িষ্যায় গদাধরের শিষ্যসংখ্যা স্বল্প। এতদ্ব্যতীত বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্ত, যাঁহারা উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ করা গেল—সার্বভৌম ভট্টাচার্য, তদীয় ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য এবং সার্বভৌম-পুত্র চন্দনেশ্বর, শিবানন্দ সেন (ইনি প্রতিবৎসর গৌড়ীয়াদের পুরী-যাত্রার ব্যবস্থা করিতেন), ষড়্‌গোস্বামী (ইঁহাদের মধ্যে রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস কিছুদিন পুরীতে থাকিয়া বৃন্দাবনে যান), ভগবান আচার্য (বঙ্গদেশ হইতে পুরীতে গিয়া বসতি করেন), রাঘব পণ্ডিত [ইনি চৈতন্যদেবের খাদ্যবস্তুর ভাণ্ডার-('রাঘবের ঝালি')-এর অধিকর্তা ছিলেন], বলভদ্র ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণদাস (যথাক্রমে, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ও দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সঙ্গী), দামোদর পণ্ডিত-জগদানন্দ-মুকুন্দ দত্ত (ইঁহারা কিছুদিন পুরীতে ছিলেন), যবন হরিদাস (ইনি শেষ জীবন পুরীতে অতিবাহিত করেন), ব্রহ্মানন্দ ভারতী (তৈর্থিক সন্ন্যাসী), পরমানন্দ পুরী (উত্তর-বিহারে জন্ম, পুরীতে ইঁহার নামাঙ্কিত একটি কূপ আছে), প্রবোধানন্দ সরস্বতী (দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। ইনি গোপাল ভট্টের গুরু, ইঁহার রচনা 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত'। ইনি কিছুদিন পুরীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন), গোবিন্দ (চৈতন্যের ব্যক্তিগত পরিচারক) প্রভৃতি।

চৈতন্যোত্তর উড়িষ্যার বৈষ্ণব-পরিবারবৃন্দ ঃ চৈতন্যদেবের আকস্মিক তিরোধান ও প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমন, উড়িষ্যায় চৈতন্য-ধর্মবিশ্বাসের প্রসার মন্দীভূত করিলেও, তাহা রুদ্ধ হয় নাই। চৈতন্যতিরোধানের পর যেমন বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্মে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি উড়িষ্যাতেও চৈতন্য-ধর্মবিশ্বাস গুরুবাদের সরণী ধরিয়া প্রসার লাভ করিতে থাকে। বর্তমানে ওড়িয়া বৈষ্ণবগণ কোন-একটি নির্দিষ্ট পরিবারভুক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। এই গুরু-পরিবারগুলির সংখ্যা চারিটি—নিত্যানন্দ পরিবার, গদাধর পণ্ডিত পরিবার, বক্রেশ্বর পণ্ডিত/গোপাল গুরু পরিবার, শ্যামানন্দ পরিবার।

নিত্যানন্দ পরিবার—অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীগণ উড়িষ্যায় চৈতন্য-নিত্যানন্দের পূজার প্রসার করেন। উড়িষ্যাতে চৈতন্য-

বিগ্রহের পার্শ্বে প্রধান চৈতন্য-পরিকর নিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ (৪৬) দেখা যায় যে, নিত্যানন্দ অনন্তদাস মহাপাত্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন; তবে এই সাক্ষ্য কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা বলা কঠিন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্য-কর্তৃক নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে (উড়িষ্যায় নহে) বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের ভার পাইয়াছিলেন। যদিও প্রবল ব্যক্তিত্বশালী নিত্যানন্দ তাঁহার জীবৎকালেই সঙ্কর্ষণের অবতার রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন (কবিকর্ণপূরের কাব্য, ৭।২৪; চৈতন্যভাগবত, ৩।৩), তথাপি, অবধূত নিত্যানন্দের সংসারধর্মাবলম্বন ও সাড়ম্বর জীবনযাত্রা গৌড়ীয় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সুনজরে দেখেন নাই। রূপ গোস্বামীর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল (চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।১), কিন্তু তাঁহার 'চৈতন্যাষ্টক'-এ নিত্যানন্দ অনুল্লিখিত; রঘুনাথ দাস পুরী-যাত্রাকালে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেও (চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।৬) 'চৈতন্যাষ্টক' ও 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ'-এ নিত্যানন্দকে স্মরণ করেন নাই। সনাতন অবশ্য তদীয় 'বৈষ্ণবতোষণী'-তে চৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধরের সঙ্গে নিত্যানন্দকে প্রণাম জানাইয়াছেন (পঞ্চতত্ত্ব-প্রণয়নের পূর্বাভাষ?)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বস্তুতঃ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ গৌড়ীয় ও বৃন্দাবনীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সেতুবন্ধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবী ও পুত্র বীরভদ্র অনেককেই দীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু উড়িষ্যায় জাহ্নবা ও বীরভদ্রের নাম সাধারণ্যে পরিচিত নহে। ১৯ শতকে ভাগবতের ভাষানুবাদক খড়ঙ্গা দীনবন্ধু দাস, 'সাক্ষীগোপাল মাহাত্ম্য' প্রণেতা দীনচৈতন্য, পুরী, জেপুর-কোরাপুট (Jeypore-Koraput) এবং বোড়োখেমদির রাজপরিবার নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান শতকে পুরীর রাধারমণ দাস, রামদাস বাবাজী, পণ্ডিত রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং ভক্তিগীতিকার মোহন গোস্বামী, ইঁহারা সকলেই নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত।

গদাধর পণ্ডিত পরিবার—পুরীর যমেশ্বর টোটা বা টোটা গোপীনাথ মন্দিরের পূজাধিকারিক 'রাধাবতার', 'গৌরপ্রেমলক্ষ্মী' (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৪৭) গদাধর পণ্ডিত উড়িষ্যায় একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। উড়িষ্যার কয়েকটি পরিবার গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যপরিবারের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া দাবী করেন। বঙ্গদেশের ন্যায় উড়িষ্যার কয়েকটি স্থানে (কটক, বালেশ্বর) পঞ্চতত্ত্ব-বিগ্রহের অন্যতম গদাধর-বিগ্রহ নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত/গোপাল গুরু পরিবার—চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। উড়িষ্যায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এবং গোপাল

গুরু (গোপালগুরু পরিবারের আদিপুরুষ ও রাধাকান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা) তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বরূপ গোস্বামী-প্রবর্তিত পঞ্চতত্ত্বের (চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধর) মধ্যে তিনি গণ্য হন নাই। অথচ, তাঁহারই আদেশে কানাই খুঁটিআ 'মহাভাবপ্রকাশ' রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে চৈতন্য-ধর্মবিশ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন (গোপাল গুরু প্রণীত 'বক্রেশ্বরাষ্টক' দ্রষ্টব্য)। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই গুরু-পরিবারের নাম 'গোপাল গুরু'-পরিবারের পরিবর্তে 'বক্রেশ্বর পণ্ডিত পরিবার' হওয়াই বিধেয় ছিল। রাধাকান্ত মঠে চৈতন্য-ব্যবহৃত কাঁথা, পাদুকা ও কমণ্ডলু রক্ষিত আছে। গোপাল গুরুর তিরোধানের পর এই মঠের তিনজন মহান্ত হইলেন, ধ্যানচন্দ্র (ইনি চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।৩-এ বর্ণিত চৈতন্যপ্রিয় পিতৃহীন ওড়িয়া বালক), বলভদ্র এবং গোবিন্দ শরণ। গোবিন্দ শরণের সময়ে দক্ষিণ উড়িষ্যায় চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করে। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরলকিমেদির রাজা (ইনি সম্ভবতঃ 'বৃন্দাবনচন্দ্র বিহার' প্রণেতা জগন্নাথ নারায়ণ দেও) গোবিন্দ শরণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং চৈতন্যমন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন। বর্তমানে পুরীতে ও গঞ্জামে এই গুরু-পরিবারের শিষ্যবর্গ-প্রতিষ্ঠিত আটটি মঠ রহিয়াছে।

শ্যামানন্দ পরিবার—শ্যামানন্দ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামানন্দ মণ্ডল (জীবৎকাল আনুমানিক ১৫৭০-১৬৩০ খ্রীঃ)। ইহার পিতৃদত্ত নাম দুঃখী, দীক্ষাগুরু হৃদয়ানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত নাম কৃষ্ণদাস এবং শিক্ষাগুরু জীবগোস্বামীকৃত নাম শ্যামানন্দ। জাতিতে কৃষক। হৃদয়ানন্দের আদেশে ইনি উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান শিষ্য 'শ্যামানন্দ শতকম্' রচয়িতা রয়নীর জমিদার রসিক-মুরারি পট্টনায়ক। গোপীবল্লভপুর (পূর্বনাম কাশীপুর) হইল শ্যামানন্দ পরিবারের মূলকেন্দ্র। ময়ূরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, নৃসিংহপুরের প্রধান উদ্দণ্ড রায়, ধলভূমের প্রধান নবীন কিশোর, পটাশপুর ও ময়নার জমিদারবর্গ শ্যামানন্দের শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গোপীবল্লভপুরের মহান্তেরা ময়ূরভঞ্জের রাজাদের কুলগুরু। শ্যামানন্দের ব্রাহ্মণ শিষ্যও (দামোদর পতি এবং 'বিন্দুপ্রকাশ' প্রণেতা মুরারি আচার্য) ছিলেন। শ্যামানন্দ পুরীর একটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহে (মেদিনীপুর, বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ) ত্রিবিগ্রহ (কৃষ্ণ/মদনমোহন/রসিক রায়, রাধা ও চৈতন্যদেব) পূজিত হন। শ্যামানন্দের রচনা—'উপাসনা-সার সংগ্রহ'। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'-তে শ্যামানন্দের নামে ব্রজবুলিতে রচিত একটি অভিসার-বিষয়ক পদ পাওয়া যায়। ইহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের

পুত্র রাধানন্দ এবং পৌত্র নয়নানন্দ। রসিকানন্দেরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। রসিক-শিষ্য গোকুলানন্দ কেওঞ্ঝড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। রাধানন্দ গোপীবল্লভপুর মঠের আধিকারিক হইয়াছিলেন, ইনি গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে 'রাধাগোবিন্দ কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ ও চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্য : নয়নানন্দের প্রশিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, জন্ম বালেশ্বরে ১৭ শতকের শেষার্ধে। গঞ্জামে ব্যাকরণ ও দর্শন পাঠান্তে ইনি মাধ্বতত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন (১৩ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নরহরি তীর্থ গঞ্জামে মাধ্ব-ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন) এবং মহীশূরের উডীপিতে গিয়া উত্তম রূপে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। অতঃপর, পুরীতে থাকাকালীন তিনি নয়ননান্দের শিষ্য কনৌজী ব্রাহ্মণ 'বেদান্ত স্যমন্তক' প্রণেতা রসিক দামোদরের সংস্পর্শে আসিয়া চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে ভাগবতের ('সারার্থ-দর্শিনী') টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিব পাঠ গ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৮ শতকের তৃতীয় দশকে জয়পুরের নিকটস্থ গলতায় চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্য বিষয়ে (অর্থাৎ, শ্রী-সন-নিম্বার্ক-মাধ্ব—এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্যদেব কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন) যে-বিতর্ক সভা হয়, তাহাতে বলদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অনুমতি লইয়া প্রমাণ করেন যে, চৈতন্যধর্মদর্শন মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শন হইতে উদ্ভূত। বলদেব-বিরচিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য 'গোবিন্দভাষ্য' ও 'প্রমেয়রত্নাবলী'-তে যে-গুরুপরম্পরার তালিকা আছে, তাহাতে মাধ্ব হইতে ক্রমান্বয়ে চৈতন্যদেবের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র 'উডীপি' ও 'ব্যাস-রায়' মঠের তালিকায় এই গুরুপরম্পরা পাওয়া যায় না। শোনা যায়, স্বয়ং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলদেবের অভিমত অর্থাৎ মাধ্ব-সম্প্রদায়ে চৈতন্যের অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করিয়া তাঁহাকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-য় (২১।৫) ও 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' (৪।৪০-৪৩) নাটকে বলদেবের অভিমতের সমর্থন থাকিলেও পণ্ডিতগণ তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। এই সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর (২।৬,৮,৯; ৩।৭) বিবৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিবৃতিতে দেখা যায়, চৈতন্যদেব স্বয়ং উড়ীপিতে গিয়া মাধ্ব-সম্প্রদায়ীদের তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মাধ্ব-ধর্মমতে রাধার স্থান সঙ্কীর্ণ এবং বৃন্দাবনের মহিমা অনাদৃত, অথচ, চৈতন্যধর্মমতে রাধার স্থান সর্বোচ্চে এবং বৃন্দাবনলীলা সর্বোত্তম। বরং, এই বিষয়ে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের

ধর্মমত চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মমতের অনেক নিকটে। কারণ, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ীরা রাধাকে কৃষ্ণের শক্তিরূপে স্বীকার করেন। পুনশ্চ, গলতার বিতর্ক সভায় গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পরিবর্তে বলদেব কি-কারণে স্বীয় 'গোবিন্দভাষ্য'-এর প্রাধান্য দিলেন এবং পরে স্বয়ং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কি-করিয়া চৈতন্য-বিরোধী এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহাও ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বলা যাইতে পারে, চৈতন্যদেব কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত ছিলেন না। যদি একান্তই তাঁহাকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে হয়, তবে তাঁহাকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ী না বলিয়া মাধবেন্দ্র-পুরীর প্রশিষ্য হিসাবে 'মাধব'-সম্প্রদায়ী বলাই বিধেয়। বলদেব বিদ্যাভূষণের রচনাবলী—'গোবিন্দভাষ্য', 'প্রমেয়রত্নাবলী', 'সাহিত্য কৌমুদী' এবং কয়েকটি টীকা (রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালা', জীবগোস্বামীর 'তত্ত্বসন্দর্ভ' এবং রসিকানন্দের 'শ্যামানন্দ শতকম্')।

চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে কতিপয় ব্যক্তি : আলোচিত চারিটি গুরু-পরিবার ব্যতীত চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে প্রসঙ্গতঃ আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে :—(ক) সালবেগ—ইনি কটকের এক মুসলমান ফৌজদারের পুত্র। জীবৎকাল আনুমানিক ১৭ শতকের মধ্যভাগ। 'পদকল্পতরু' ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'-তে ইহার রচিত কয়েকটি বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়।[৩৯] (খ) চৈতন্যদাস—ইনি 'প্রেমপঞ্চামৃত' প্রণেতা ভূপতি পণ্ডিতের গুরু, জীবৎকাল ১৮ শতক। পুরীর লোকনাথমন্দিরের নিকট ইহার মঠ আছে। (গ) সিদ্ধ কৃষ্ণদাস—ইহার পূর্বনাম বটকৃষ্ণ, পিতা সনাতন কানুনগো, নিবাস দামোদরপুর গ্রাম। বৃন্দাবনে গিয়া ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১৯ শতকের মধ্যভাগে বিদেহী হন। ইহার শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)। কৃষ্ণদাসের রচনা—'প্রার্থনামৃততরঙ্গিণী' 'ভাবনাসার-সংগ্রহ'।[৪০] (ঘ) বৈষ্ণবানন্দ সরস্বতী—ইহার জীবৎকাল ২০ শতকের পূর্বার্ধে। ইহার পিতা কেওঞ্জড় হইতে সম্বলপুরে বসতি করিয়াছিলেন। ইনি সম্বলপুরে 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর মঠ' স্থাপন করেন এবং ষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গ এবং লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গদেবের পূজা উড়িষ্যায় প্রচলিত করেন। বৈষ্ণবানন্দের রচনা—'গৌরগোবিন্দরসামৃত' (সংস্কৃতে) এবং 'গৌরলীলামৃত' (ওড়িয়াতে)। ইনি বঙ্গদেশের জাহ্নবা-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

চৈতন্য-সম্পর্কিত মঠ, মন্দির ও বিগ্রহ : কেবল গুরুপরণীর মাধ্যমেই নহে, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র উড়িষ্যায় মঠ ও মন্দির স্থাপনার মাধ্যমেও সম্প্রসারিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব যে-সকল স্থান দিয়া

উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন, দক্ষিণদেশ ও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যায় যে-যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, উক্ত সকল স্থানই কালক্রমে চৈতন্যস্মৃতি-পূত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মহানদী তীরে আজিও কার্তিকী পূর্ণিমায় তাঁহার স্মরণে 'বালিযাত্রা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ 'অমরদা' (উড়িষ্যায় চৈতন্যের প্রথম আগমনকালীন বিশ্রামস্থল); কটকস্থ মহম্মদিয়া বাজারে বকুলতলায় 'চৈতন্যমঠ' (এখানে রামানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের তত্ত্বালোচনা হইয়াছিল), 'জনকদেইপুর' (নিত্যানন্দ কর্তৃক 'চৈতন্যের দণ্ডভঙ্গ' স্থল) 'গোরাপুর' (চিল্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী এই স্থানে চৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ যাত্রাকালে বিশ্রাম করিয়াছিলেন), ঢেণ্‌কানলের নিকটবর্তী 'শম্ভুগোপাল মন্দির' (বৃন্দাবন গমনকালে শ্রীচৈতন্যের বিশ্রামস্থল), পুরীর মন্দিরের নিকটবর্তী 'গম্ভীরা' (শ্রীচৈতন্যের শেষ আবাসস্থল) প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন (পুরী ও যাজপুরের চৈতন্যমন্দির), কিংবা, দেহচিহ্নিত প্রস্তরখণ্ড (আলালনাথের চৈতন্যমন্দির) তাঁহার স্মারক হিসাবে উড়িষ্যায় নিত্য-পূজিত হয়। উড়িষ্যায় মঠে ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যবিগ্রহ প্রধানতঃ নিম্বকাষ্ঠ-নির্মিত (জগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ও নিম্বকাষ্ঠ-নির্মিত)। একমাত্র জগন্নাথ-মন্দিরের নিকটস্থ চৈতন্যমন্দিরের মূর্তি ব্যতীত (এই মূর্তি উপবিষ্ট সন্ন্যাসী-মূর্তি) অপর সকল মূর্তিই 'গৌরনাগর' অর্থাৎ, নবদ্বীপের বিশ্বম্ভরের প্রতিরূপ। উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যমন্দিরের বিগ্রহগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :— (ক) একক চৈতন্যবিগ্রহ—এই বিগ্রহ কোথাও দ্বিভুজ (পুরী, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ), কোথাও ঊর্ধ্বভুজ (কোরাপুটের জেপুর) কোথাও-বা ষড়্‌ভুজ (পুরাতন ভুবনেশ্বর)। (খ) চৈতন্য-নিত্যানন্দ বিগ্রহ—এই যুগলমূর্তি উড়িষ্যার নানা স্থানে (পুরী, কটক, বালেশ্বর, কোরাপুট, ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম) দেখা যায়। (গ) চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত বিগ্রহ—এই ত্রিমূর্তি পুরীতে ও বালেশ্বরে দেখা যায়। (ঘ) পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ—কটক ও বালেশ্বরে পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বঙ্গদেশের 'মালসা'-ভোগের ন্যায় পাঁচটি কলস বা পাত্রে ভোগ নিবেদিত হয়। ইহা নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত 'চিড়াদধি মহোৎসব'-এর স্মারক। (ঙ) স-কলত্র চৈতন্য-বিগ্রহ—নবদ্বীপে কিংবা বঙ্গদেশে কোথাও স-কলত্র চৈতন্যদেব পূজিত হন না। কিন্তু সম্বলপুরে (বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর মঠ) ও কেওঞ্ঝড়ে (গৌরগোবিন্দ মঠ) চৈতন্যদেব লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পূজিত হন।

উড়িষ্যায় ১৮ শতক পর্যন্ত চৈতন্যবিগ্রহই পূজিত হইত। ১৯ শতকের শেষার্ধে

বঙ্গভূমে মহাপ্রভুর পূজার সূত্রপাত হয় এবং ২০ শতকের প্রথম ভাগে গৌরাঙ্গ ও তৎপত্নীদ্বয়ের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৪১]

উড়িষ্যায় চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মাদর্শ তাঁহার তিরোধানের পর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনৈতিক কারণও বর্তমান। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৫৪০ খ্রীঃ) উড়িষ্যায় জগন্নাথ-মন্দিরের মহিমা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৫১১খ্রীঃ মুসলমান-আক্রমণ জগন্নাথ-মন্দিরের ক্ষতি করিলেও দেববিগ্রহ স্থানান্তরিত হওয়ায় রক্ষা পাইয়াছিল। আবুল ফজলের বিবৃতি অনুসারে (আইন-ই-আকবরী। ২ খণ্ড, পৃঃ ১২৮) কালাপাহাড়ের আক্রমণে ১৫৫৬ খ্রীঃ উক্ত স্থানান্তরিত দেবমূর্তিও ভস্মীকৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। বেসর মহান্তি নামেজনৈক সাধু ঐ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া খুরদায় নব-দেবমূর্তি-যুক্ত জগন্নাথ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিসাবে পুরীর ভগ্নপ্রায় জগন্নাথ-মন্দির ১৫৬৮-৮৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ২১ বৎসরকাল বিগ্রহশূন্য অবস্থায় ছিল। মোগল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বংসসাধন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে আফগান ও মোগলদের অত্যাচারে এই মন্দিরের গৌরব বারংবার ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। এইরূপে মন্দির লুণ্ঠন, দেববিগ্রহের ধ্বংসসাধন ও মন্দিরে সুদীর্ঘকাল দেববিগ্রহ-শূন্যতা—জগন্নাথ এবং তাঁহার মন্দিরের গৌরবকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। জগন্নাথও আর উড়িষ্যা রাজ্যের অধিরাজ রূপে স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। খর্বীভূত জগন্নাথ-মহিমা গৌণভাবে চৈতন্যমহিমাবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল। উড়িষ্যার জনমানস 'দারুব্রহ্ম'-এর স্থলে 'নরব্রহ্ম', 'অচল জগন্নাথ'-এর পরিবর্তে 'সচল জগন্নাথ' শ্রীচৈতন্যের, তথা, রাধাকৃষ্ণ-ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং কালক্রমে চৈতন্য-পন্থবিশ্বাসী ওড়িয়া অধ্যাত্মগুরুগণ উড়িষ্যায় চৈতন্য-মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার মঠ-মন্দির, 'ভাগবত ঘর' (আসামের 'নামঘর'-এর অনুরূপ) সকলই চৈতন্য-ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।'—(পঞ্চভূত। 'মনুষ্য')। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে উড়িষ্যাবাসী তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল। সেই পার্থিব ভালবাসাই যুগান্তরকাল ব্যাপিয়া উড়িষ্যা-বাসীর মনে ঈশ্বরচেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাই স্বর্গের জগন্নাথদেব মর্ত্যের জগন্নাথ-নন্দনের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন।

উত্তরভাষণ

আসাম, গৌড়বঙ্গ ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পৃথক-পৃথকভাবে আলোচনা করিবার পর, সম্প্রতি, এই তিন ভূখণ্ডের বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে-যে বিষয়ে সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সাদৃশ্য : (ক) ভাগবত-কেন্দ্রিকতা : বৈষ্ণবধর্ম ভাগবত পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপাস্য দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ।[১] ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা, কীর্তন দ্বারা ধর্ম-প্রচার ও ভক্তিমার্গ-সাধনা—এইগুলি হইল বৈষ্ণবধর্মের সাধারণ বিষয়, যাহা এই তিনটি প্রদেশেই পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যাগমনের পূর্বে উড়িষ্যায় ভক্তিধর্মের দুইটি ধারা দেখা যায়,—রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক ভক্তিধর্ম এবং বুদ্ধ-জগন্নাথ কেন্দ্রিক ভক্তি-ধর্ম। উড়িষ্যায় চৈতন্যপূর্ব কৃষ্ণোপাসনা, গোপীপ্রেম ও রাগানুগা ভক্তি সাধনার প্রমাণ —রেমুণায় গোপীনাথের মন্দির, রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে সঙ্কলিত পুরুষোত্তমদেব-রচিত শ্লোকাবলী[২] এবং রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটক।

(খ) রাজানুকূল্য : শঙ্করদেব তদীয় ধর্মান্দোলনে কোচবিহার রাজসভার পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—উড়িষ্যার প্রতাপ-রুদ্রদেব। যে-মহামানবের ধ্যানে-জ্ঞানে বৃন্দাবন নিত্য বিরাজমান, তিনি বৃন্দাবনে গিয়াও তথায় না-থাকিয়া জীবনের প্রায় অর্ধাংশই উড়িষ্যায় অতিবাহিত করিলেন, ইহার পশ্চাৎপট বিবেচনা করিলে রাজপৃষ্ঠপোষকতার কথাই সহজে মনে পড়ে। হুসেন শাহ চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ আনুকূল্য না করিলেও তাঁহার বিরোধিতা করেন নাই। পঞ্চসখাও প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত ছিলেন না।

(গ) ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচারণ : শঙ্করদেবের মতবাদ যেমন তৎশিষ্য মাধবদেব কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তেমনি, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবমত রূপ-সনাতনাদি দ্বারা শাস্ত্রবদ্ধ হইয়াছিল। গৌড়ে ও উড়িষ্যায় ধর্মমত যেমন গুরু-সরণীর মাধ্যমে প্রচারিত, শঙ্করদেবের ধর্মমত তেমনি 'চতুঃ-সংহতি'-র মাধ্যমে প্রসারিত। ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠান —আসামে সত্র ও নামঘর, গৌড়-বঙ্গে হরিসভা এবং উড়িষ্যায় ভাগবত ঘর।

(ঘ) সমাজ ও সংস্কৃতি : কেবল ধর্মে ও দর্শনে নহে, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোল-নের প্রতিফলন তৎকালীন সমাজে ও সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারকগণ প্রকৃতপক্ষে সমাজসংস্কারক ছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

তখন ছিল না, থাকিবার কথাও নহে। সুতরাং, সামাজিক মানবকুলকে যদি উন্নত করিতে হয়, তাহাদের চিন্তাধারাকে যদি কলুষমুক্ত করিতে হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহা করা সম্ভবপর। শঙ্করদেব ও চৈতন্যদেব তাহাই করিয়াছিলেন। 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'—ইহাকেই তো 'ধর্মসংস্থাপন' বলা যায়। কেবল ধর্মপ্রচার, মঠ-মন্দির নির্মাণ নহে—জনচরিত্র গঠন, দুর্গত মানবতার সমুন্নয়নই ছিল এই মহাপুরুষগণের লক্ষ্য—ধর্ম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যতম কারণ-যে জনকল্যাণ, তাহা 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। উড়িষ্যার সমাজজীবনও 'পঞ্চসখা'-র দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি জীবন-বিবর্জিত নহে। দেশ ও কালের স্বাক্ষর, তথা, মহাপুরুষীয় ভাবনার স্বীকৃতি সমাজে ও শিল্প-সংস্কৃতিতে থাকিবেই। আজিও ভারতের এই তিন ভূখণ্ডের সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি তাহাবই প্রমাণ বহন করে।

(ঙ) চরিত ও পদসাহিত্য : আদি ও মধ্যযুগের তাবৎ সাহিত্যকর্মই ধর্মভিত্তিক। বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তিনটি বিভাগ দেখা যায়—রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদির অনুবাদ, চরিতসাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্য অবশ্য এই আন্দোলনের পূর্ব হইতেই ছিল। জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য হইল এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। ইতিপূর্বে জীবনী-বিষয়ক রচনা দেখা যায় নাই। আসাম, গৌড়-বঙ্গ এবং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশে যথাক্রমে শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব ও জগন্নাথ দাসের (পঞ্চসখার অন্যতম) জীবনী অবলম্বনে স্থানীয় ভাষায় (অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া) চরিতগ্রন্থ (কথাগুরুচরিত, চৈতন্যচরিত এবং জগন্নাথ চরিতামৃত) রচিত হইয়াছিল।

চরিতসাহিত্যের ত্রুটি : চরিত-সাহিত্যগুলিতে শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব ও জগন্নাথ দাসের বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাবলী, অর্থাৎ, ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা তাঁহাদের চরিতকথা, অর্থাৎ, অন্তরঙ্গ জীবনের কথাই গ্রন্থরচয়িতাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। জনশ্রুতি, কিংবদন্তি, কড়চা ইত্যাদি যখন জীবনী-রচনার উপাদান হয়, তখন প্রাকৃত বিষয়ের অতিরঞ্জন, অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ, অতিশয়োক্তি, রচয়িতৃবর্গের কল্পনার নিরঙ্কুশ বিলাস প্রভৃতি সহজেই জীবনীগ্রন্থগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই হেতু, কথাগুরুচরিতাদি গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু কতখানি 'প্রাকৃত সত্য' এবং কতখানি 'সাহিত্যের সত্য'—তাহা আজ নিঃসংশয়ে নির্ধারণ করা কঠিন। চৈতন্যজীবনী -বিষয়ক কাব্যগুলিও বহুস্থলে তথ্যনিষ্ঠ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজের

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৌরাঙ্গ-জীবনী হিসাবে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ (কারণ, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অনুল্লেখ), অপিচ, গ্রন্থটিতে যে-সকল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ত্রুটি আছে তাহা বিমানবিহারী মজুমদার